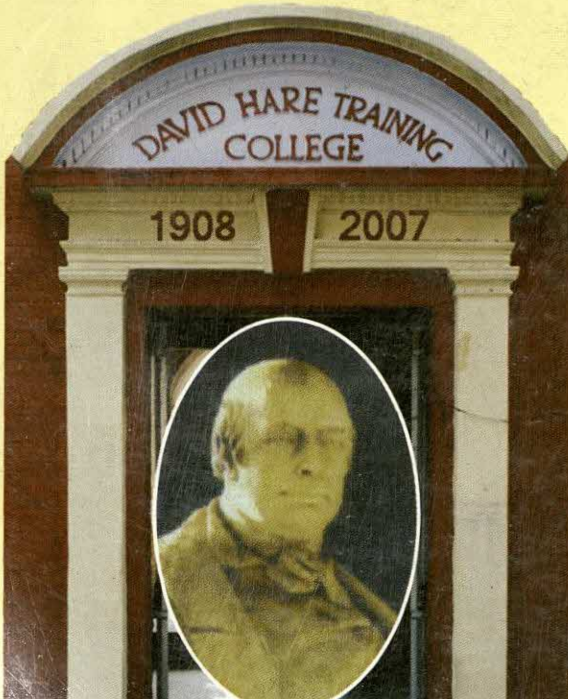
Vol. 2
June 2008

DAVID HARE TRAINING COLLEGE

Centenary Celebration Souvenir



25/3 PRAMATHESH BARUA SARANI
(BALLYGUNGE CIRCULAR ROAD)
KOLKATA–700 019
Phone No. : 2486-4848 ✱ Website : www.dhtc_iase.org



মাননীয় অধ্যক্ষ, অধ্যাপিকা-অধ্যাপকবৃন্দ, গ্রন্থাগারিক এবং অফিসকর্মী

বসে (বাঁদিক থেকে ডানদিকে)—শ্রী সমীর কুমার চক্রবর্তী, অধ্যাপক পূর্ণেন্দু আচার্য, অধ্যাপক নাগার্জুন ভরদ্বাজ, অধ্যক্ষ ডঃ প্রণবকৃষ্ণ চৌধুরী, অধ্যাপক ডঃ বিষ্ণুপদ বেরা, অধ্যাপিকা ডঃ জয়শ্রী ব্যানার্জী, অধ্যাপিকা ডঃ স্মৃতি রায়, অধ্যাপক ডঃ রবীন্দ্রনাথ কর্মকার।

দাঁড়িয়ে (বাঁদিক থেকে ডানদিকে)—অধ্যাপক ডঃ সুভাষচন্দ্র ভাট, অধ্যাপক পীযূষকান্তি ত্রিপাঠী, অধ্যাপক ঋতব্রত চ্যাটার্জী, অধ্যাপক ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী অনুপকান্তি গুহ, অধ্যাপক ডঃ কুমার বিশ্ববন্ধু, অধ্যাপক অম্লান গাঙ্গুলী, অধ্যাপিকা ভারতী ভট্টাচার্য এবং অধ্যাপিকা ব্যাপ্তি।

CENTENARY CELEBRATION SOUVENIR VOLUME-TWO

DAVID HARE TRAINING COLLEGE

1908-2008 A.D.

25/3, PRAMATHESH BARUA SARANI
(Ballygunge Circular Road)
KOLKATA-700 019

YEAR-2008

✻ Date of publication ✻
March, 2008

✻ Publisher ✻
Dr. Bishnupada Bera
General Secreatary,
Centenary Celebration Committee
David Hare Training College, Kol-19

✻ Cover Design ✻
Sri Samir Kumar Chakrabarti

✻ Printing by ✻
Science Vision
Kolkata-700006
Ph. 9830951744 (M) / 23605760

সূচীপত্র

কী আছে এর মধ্যে	কে	কোথায়

রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ

সত্যমেব জয়তে

রাজভবন

কলকাতা-৭০০ ০৬২



১ জুন ২০০৭

ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের বর্ষব্যাপী শতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান আগামী ১লা জুলাই, ২০০৭ থেকে শুরু হবে জেনে আমি আনন্দিত।

আমি আশা করি যে শিক্ষক মহাশয়দের প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে এই কলেজ তার সুদীর্ঘ ঐতিহ্য বজায় রেখে প্রশিক্ষণের মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধির প্রতি সচেষ্ট থাকবে।

আমি শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার অভিনন্দন জানাই।

গোপালকৃষ্ণ গান্ধী

শ্রী প্রণবকৃষ্ণ চৌধুরী,
অধ্যক্ষ,
ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ,
কলকাতা

নং-৭৪০-পি.সি.এম

৪ জুন, ২০০৭

মুখ্যমন্ত্রী

পশ্চিমবঙ্গ



ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের শতবর্ষে পদার্পণের সূচনা-অনুষ্ঠান আগামী ১ ও ২ জুলাই, ২০০৭ আয়োজিত হবে জেনে আনন্দিত হয়েছি। শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ গৌরবে মণ্ডিত। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে মহাবিদ্যালয়টি তার বহুমুখী কর্মসূচি দক্ষতার সঙ্গে পালন করে যাবে, এই বিশ্বাস রাখি।

শতবর্ষ কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

(বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য)

শ্রী প্রণবকৃষ্ণ চৌধুরী,
অধ্যক্ষ,
ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ,
কলকাতা

সত্যমেব জয়তে

মন্ত্রী
অর্থ ও আবগারি দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ডঃ অসীম কুমার দাশগুপ্ত

এপ্রিল ১৯, ২০০৭

শুভেচ্ছাপত্র

আগামী ১লা জুলাই, ২০০৭ ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একটি স্মারক পত্রিকা প্রকাশিত হবে জেনে আনন্দিত হয়েছি।

আমি এই অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি।

ধন্যবাদান্তে,

(অসীম কুমার দাশগুপ্ত)

শ্রী প্রণবকৃষ্ণ চৌধুরী,
অধ্যক্ষ,
ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ,
কলকাতা

SUDARSAN RAYCHAUDHURI
MINISTER-IN-CHARGE
HIGHER EDUCATION
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
BIKASH BHAWAN, BIDHANNAGAR
KOLKATA-700 091
Office - 033 2334 6181
Residence - 033 2674 0744

সুদর্শন রায়চৌধুরী
মন্ত্রী
উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন, বিধাননগর
কলকাতা-৭০০ ০৯১

Dated, Kolkata, the HEMS/752 2007

তারিখ 28/5/ ২০০7.



শুভেচ্ছা

ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের শতবার্ষিকী উৎসব আগামী ১লা জুলাই, ২০০৭ থেকে আগামী এক বছরব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে খুশি হলাম।

শতাব্দীপ্রাচীন এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গৌরবময় ঐতিহ্য আগামীদিনে আরও সমুজ্জ্বল হয়ে উঠুক এই কামনা করি।

এই শতবর্ষ উদ্‌যাপনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

(সুদর্শন রায়চৌধুরী)

শ্রী প্রণবকৃষ্ণ চৌধুরী,
অধ্যক্ষ,
ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ,
কলকাতা

सत्यमेव जयते

ক্ষিতি গোস্বামী
KSHITI GOSWAMI

মন্ত্রী
পূর্ত ও পূর্ত (সড়ক) বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
MINISTER-IN-CHARGE
PUBLIC WORKS & P.W. (ROADS) DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

KOLKATA, THE ২৫-০৪-2007
D.O. NO ৬১৩ – *MPW*

শুভেচ্ছা

ঐতিহ্যমণ্ডিত ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের এক বছরব্যাপী শতবর্ষ উদ্‌যাপন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আগামী ১লা জুলাই, ২০০৭ তারিখে সূচনা করা হবে। এই উপলক্ষ্যে একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হবে।

একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জীবনে, বিশেষত ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশে ১০০ বছরের যাত্রাপথ অনেক সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনায় আবৃত থাকে। আজ ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের আনন্দ উৎসবের শুভ মুহূর্তে সকলে নিশ্চয়ই পুরনো দিনের সুখ দুঃখের স্মৃতির কথা ভাববেন। আমাদের দেশ আজও সার্বিক সাক্ষরতা অর্জন করতে পারেনি। এই উৎসবের মধ্য থেকে তাই দেশের প্রান্তে প্রান্তে যাতে সাক্ষরতা অভিযান জোরদার করা যায় সেই সংকল্পই গ্রহণ করা হোক। শতবর্ষের আড়ম্বরপূর্ণ আনন্দ অনুষ্ঠানের এই লগ্নে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রাক্তন অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানানো প্রয়োজন।

শিক্ষার সার্বিক প্রসারের ক্ষেত্রে এই কেন্দ্রের অগ্রণী ভূমিকা আগামী দিনে আরও সুদৃঢ় ও সম্প্রসারিত হোক এই কামনা করে শতবার্ষিকী উৎসবের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

(ক্ষিতি গোস্বামী)
২৪/৪/০৭

শ্রী প্রণবকৃষ্ণ চৌধুরী,
অধ্যক্ষ,
ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ,
কলকাতা

Writers' Buildings, Kolkata-700001, Tel : 2214-3161, Fax : 2214-4788

सत्यमेव जयते

পার্থ দে
মন্ত্রী
বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
☎ : (০৩৩) ২৩৩৪ ২২৫৬
(০৩৩) ২৩৫৮ ৮৮৫৮ (ফ্যাক্স)

নং- ২৬৩/মঃ (শুভেচ্ছা)/স্কুল শিক্ষা/০৭

তারিখ ২২/০২/০৭

শুভেচ্ছা

আগামী ১-লা জুলাই, ২০০৭, কলকাতার ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের বর্ষব্যাপী শতবর্ষ উৎসব উদ্‌যাপন-এর প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হলাম। এই সময়ের মধ্যে এই শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় দেশবাসীকে বহু কৃতী সন্তান উপহার দিতে পেরেছে...সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তদানীন্তন ব্রিটিশ শাসনে অবিভক্ত বাংলার প্রাণকেন্দ্রে এই শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় যাঁরা স্থাপন করেছিলেন, তাঁরা শিক্ষা বিশেষ করে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রশিক্ষণ শিক্ষা সম্পর্কে কতখানি উৎসাহী ছিলেন, তা বোঝা যায় পরাধীন দেশে এই রকম একটি শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে। নূতন উৎসাহে, নূতন কলেবরে শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়টি তার দায়িত্ব পালনে ব্রতী হোক—সেই আশা একান্তভাবে করি। শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান বর্ণময় হয়ে উঠুক, যাবতীয় কর্মসূচি আরও অর্থবহ হয়ে আত্মপ্রকাশ করুক—এই আশা আমি একান্তভাবে করি।

এই শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের, অধ্যক্ষ, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের ও অন্যান্য সকলকে আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

এই মহাবিদ্যালয়ের সাথে বর্তমানে যাঁরা যুক্ত আছেন তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে,

পার্থ দে ২২/২/০৭
(পার্থ দে)

শ্রী প্রণবকৃষ্ণ চৌধুরী,
অধ্যক্ষ,
ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ,
কলকাতা

Dr. Abdus Sattar
Minister of State
Minorities Development & Welfare and Madrasah,
Government of West Bengal.
Phones:
Office: (033) 23593939, *Res.*: (033) 23445419, *(M)*: 9433005419
e-mail: abdussattar@rediffmail.com
Bikash Bhavan, Bidhannagar, Kolkata
Phone & Fax: (033) 23593939
Writers' Buildings, Kolkata
Phone & Fax: (033) 22143066

सत्यमेव जयते

ড. আবদুস সাত্তার
রাষ্ট্রমন্ত্রী,
সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণ এবং মাদ্রাসা শিক্ষা,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
দূরভাষ : অফিস : (০৩৩) ২৩৫৯৩৯৩৯, *আবাস* : (০৩৩) ২৩৪৪৫৪১৯,
(মোবাইল) : ৯৪৩৩০০৫৪১৯
ই-মেল : abdussattar@rediffmail.com
বিকাশ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা
ফ্যাক্স ও দূরভাষ : (০৩৩) ২৩৫৯৩৯৩৯
মহাকরণ, কলকাতা
ফ্যাক্স ও দূরভাষ : (০৩৩) ২২১৪৩০৬৬

শুভেচ্ছা

ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আগামী ১লা জুলাই, ২০০৭ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সারা বছর ধরে এই অনুষ্ঠান চলবে। অনুষ্ঠানটিকে স্মরণীয় করে রাখতে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হবে জেনে আনন্দিত হলাম। অনুষ্ঠানটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। উদ্যোক্তাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

ধন্যবাদান্তে,

০৫/০৬/০৭
(আবদুস সাত্তার)

শ্রী প্রণবকৃষ্ণ চৌধুরী,
অধ্যক্ষ,
ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ,
কলকাতা

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী
কারিগরি শিক্ষা ও
প্রশিক্ষণ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন
কলকাতা-৭০০ ০৯১
দূরভাষ নং : ২৩৩৪-১৪৪৩
ফ্যাক্স : ২৩৩৪-৮০৭৪

ডি.ও. নং ....
তাং ....

सत्यमेव जयते

Minister-in-Charge
Technical Education and
Training Deptt.
Government of West Bengal
Bikash Bhawan
Kolkata-700 091
Phone No. : 2334-1443
Fax : 2334-8074

D.O.No. 317/MIC/2007
Date 14-6-2007

শুভেচ্ছা

শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে যে কটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিরলস কাজ করে চলেছে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ তাদের অন্যতম। এই প্রতিষ্ঠানটি আগামী ১লা জুলাই, ২০০৭ শতবর্ষ উদ্‌যাপন করতে চলেছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম।

আশা রাখব, আগামী দিনেও এই মহাবিদ্যালয় উপযুক্ত শিক্ষক সৃষ্টির ব্রতে অবিচল থাকবে।

শুভেচ্ছান্তে—

চক্রধর মেইকাপ

(চক্রধর মেইকাপ)

শ্রী প্রণবকৃষ্ণ চৌধুরী,
অধ্যক্ষ,
ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ,
কলকাতা

তপন রায়
ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী
জনশিক্ষা প্রসার বিভাগ
এবং গ্রন্থাগার পরিষেবা
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন, বিধাননগর
কলকাতা-৭০০ ০৯১

TAPAN ROY
Minister of State-in-Charge
MASS EDUCATION EXTENSION
DEPTT. & LIBRARY SERVICES
GOVT. OF WEST BENGAL
Bikash Bhavan, Bidhan Nagar
Kolkata - 700 091

পত্রাঙ্ক ৩২৯ D. O. No.

কলকাতা, তাং ২৫.৫.০৭ Kolkata, Dated

শুভেচ্ছা

ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ শতবর্ষে পদার্পণ করেছে। এই উপলক্ষ্যে আগামী ১লা জুলাই, ২০০৭ কলেজ কর্তৃপক্ষ বর্ষব্যাপী শতবর্ষ উদ্‌যাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন এবং একটি স্মারক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন জেনে আনন্দিত হলাম।

স্মারক পত্রিকা প্রকাশ সহ সমগ্র অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

ধন্যবাদান্তে,

(তপন রায়)
২৫.৫.০৭

শ্রী প্রণবকৃষ্ণ চৌধুরী,
অধ্যক্ষ,
ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ,
কলকাতা

Professor Asis Kumar Banerjee
VICE-CHANCELLOR
University of Calcutta

87/1, College Street
Senate House
Kolkata-700 073
Ph. Nos. 2241-3288/0071/4984
Fax No. 91-33-2241-3288
E-mail : vc@cahiniv.ac.in

June 5, 2007

It is a matter of great pleasure for me to learn that David Hare Training College has completed one hundred years of its glorious existence and is going to hold Centenary Celebration from 1st July, 2007 in a befitting manner and that to commemorate the occasion a souvenir will be published incorporating a description of the academic activities of the College.

I believe that the Celebration is going to be a landmark in the history of the College. All teachers, students and well-wishers who are or were associated with the College have reasons to feel proud of the heritage the College represents.

I am aware that during these long years the College has rendered commendable service towards dissemination of knowledge and has produced a number of brilliant students who have distinguished themselves in their careers.

On this auspicious occasion I convey my greetings to the teachers, students, former students and all others associated with the College and wish the Centenary Celebration of the College all success.

A. K. Banerjee

(Asis Kumar Banerjee)

Dr. Pranab Krishna Choudhury
Principal
David Hare Training College and
President, Centenary Celebration Committee
25/3, Ballygunge Circular Road
Kolkata-700 019

Professor Asis Kumar Banerjee
VICE-CHANCELLOR
University of Calcutta

87/1, College Stre
Senate Hou
Kolkata-700 0
Ph. Nos. 2241-0288/0071/49
Fax No. 91-33-2241-32
E-mail : vc@cubmb.ac

June 5, 20

It is a matter of great pleasure for me to learn that David Hare Training Colle
has completed one hundred years of its glorious existence and is going to hold Cen
nary Celebration from 1st July, 2007 in a befitting manner and that to commemorat
the occasion a souvenir will be published incorporating a description of the academ
activities in the College.

I believe that the Celebration is going to be a landmark in the history of t
College. All teachers, students and well-wishers who are or were associated with t
College have reasons to feel proud of the heritage the College represents.

I am aware that during these long years the College has rendered commen
able service towards dissemination of knowledge and has produced a number of bri
liant students who have distinguished themselves in their careers.

On this auspicious occasion I convey my greetings to the teachers, studen
former students and all others associated with the College and wish the Centen
Celebration of the College all success.

(Asis Kumar Banerjee)

Dr. Pranab Krishna Choudhury
Principal
David Hare Training College and
President, Centenary Celebration Committee
25/3, Ballygunge Circular Road
Kolkata-700 019

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

PROFESSOR SHYAMAL KANTI SANYAL
VICE-CHANCELLOR
অধ্যাপক শ্যামল কান্তি সান্যাল
উপাচার্য

*JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA-700 032, INDIA

OFFICE OF THE VICE-CHANCELLOR : AUROBINDO BHAVAN ANNEXE

Dr. P. K. Choudhury
Principal
David Hare Training College
25/3, Ballygunge Circular Road,
Kolkata-700019
Ph: 2486-4848 (O)

Date: June 6, 2007

MESSAGE

It is a very pleasant occasion to convey my message on the eve of the hundredth year celebration of David Hare Training College.

I thank all the teachers, students, staff members and ex-students of the College hope the students will celebrate befittingly this glorious occasion. The students will bear in mind their responsibility to make the programme grand. I expect that the teachers and students will share their experiences and views and will come out with the suggestions for the betterment of the institution.

I am sure the hundredth year celebration will achieve a total success.

Yours sincerely

(S. K. Sanyal)

*Established on and from 24th December, 1955 vide Notification No. 10986-Edn/IU-42/55 dated 6th September, 1955 under Jadavpur University Act, 1955 (West Bengal Act XXXIII of 1955) followed by Jadavpur University Act, 1981 (West Bengal Act XXIV of 1981)

ফোন ঃ জে. ইউ. ঃ ২৪১৪-৬০০০
আবাসান ঃ ২৪৭৬-২৪৭৪-০২৭৯

Website : www.jadavpur.edu
E-mail : vc@admin.jdvu.ac.in
sksanyal@cal2.vsnl.net.in

Phone : J.U. : 2414-6000
Fax : +91-33-2413-7121
Resi. : 2476-8343/2474-0279

আচার্য
ড. মনমোহন সিংহ
উপাচার্য
অধ্যাপক রজত কান্ত রায়

বিশ্বভারতী

প্রতিষ্ঠাতা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন - ৭৩১২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ
দূরভাষ : (০৩৪৬৩) ২৬২-৭৫১, ২৬২-৭৫৬ (৬টি লাইন)
ফ্যাক্স : ৯১-০৩৪৬৩ / ২৬২-৬৭২ / ২৬১-১৫৬ / ২৬১-৪০৯
ওয়েবসাইট : www.visva-bharati.ac.in
ই. মেল : root@.vbharat.ernet.in

নং ভিসি/এম-৯

তারিখ ৮ জুলাই, ২০০৭

শ্রী প্রণবকৃষ্ণ চৌধুরী
অধ্যক্ষ, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ ও
সভাপতি, শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি,
২৫/৩, বালিগঞ্জ সারকুলার রোড
কোলকাতা-৭০০ ০১৯

মহাশয়

আপনার চিঠিটি পেয়ে খুব ভাল লাগল। আগামী ১লা জুলাই, ২০০৭, আপনাদের কলেজের শতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ জানাই, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে ব্যস্ত থাকায় উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারছি না বলে দুঃখিত। আপনারা ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন। আপনাদের শতবর্ষ অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক আগামী প্রজন্মের কাছে এক দৃষ্টান্ত। এই উৎসবের সার্বিক সাফল্য একান্তভাবে কামনা করি।

নমস্কারান্তে,

রজত কান্ত রায়

(রজত কান্ত রায়)

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Professor Pijushkanti Saha
Vice-Chancellor

P.O. North Bengal University - 734 013
Phone: (0353) 2699 255 (Offi.)
(0353) 2581 324 (Resi.)
Fax: (0353) 2699 001
E-Mail: pijushgeo@yahoo.com
Web site: http://www.nbu.ac.in

Ref. No. ....   *Date:* ....

প্রিয় ড. চৌধুরী,

আগামী ১লা জুলাই, ২০০৭ তারিখে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের শতবর্ষ অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী দিবসে আমি উপস্থিত থাকব।

আমন্ত্রণের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ,

ইতি

পীযূষ সাহা

(পীযূষকান্তি সাহা)
উপাচার্য,
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রী প্রণবকৃষ্ণ চৌধুরী,
অধ্যক্ষ,
ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ,
কলকাতা

অধ্যাপিকা ভারতী মুখার্জী
উপাচার্য

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
জোড়াসাঁকো অঙ্গন
৬/৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৭, দূরভাষ : ২২৬৯-১০২৮
মরকতকুঞ্জ অঙ্গন
৫৬এ, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫০, দূরভাষ : ২৫৫৬-৮০১৯
ফ্যাক্স : ৯১ (০৩৩) ২৫৫৬-৮০৭৯, ই-মেল : rbreg@cal3.vsnl.net.in
বাসস্থান দূরভাষ : ২৪৫৫-১২১০

শুভেচ্ছা

আগামী ১ জুলাই, ২০০৭ ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ তাঁদের শতবর্ষ উদ্‌যাপন করছে জেনে আনন্দিত হলাম। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শতবর্ষপ্রাচীন এই মহাবিদ্যালয় তাঁদের শিক্ষকশিক্ষণমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। আগামী এক বছর ধরে উচ্চশিক্ষার স্বার্থে তাঁদের বিভিন্ন কার্যাবলি সার্থকভাবে রূপায়িত হোক এই আশা রাখি।

শুভেচ্ছান্তে,

ভারতী মুখার্জী

(ভারতী মুখার্জী)

তারিখ ঃ ৪ মে, ২০০৭

শ্রী প্রণবকৃষ্ণ চৌধুরী,
অধ্যক্ষ,
ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ,
কলকাতা

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

★★★★

দূরভাষ :
কার্যালয় : (০৩৪২) ২৬৩৪২০০ (সরাসরি)
২৫৩৩৯১৩—১৪
২৫৩৩৯১৭—১৯ (প্রসারণ ২২৫)
আবাস : (০৩৪২) ২৬৩৪৪৪৪ (সরাসরি)
২৬৫৭৭১৫ (কৃষ্ণপুর)
২৫৩৩৯১৩—১৪
২৫৩৩৯১৭—১৯ (প্রসারণ ২২৩)

Gram : BURDSITY, Fax : (91)-0342-2530452
e-mail : vc@buruniv.ac.in
website : www.buruniv.ac.in

অধ্যাপক অমিত কুমার মল্লিক
উপাচার্য

নং-ভি/এম-৪/৩৬৩
১৫ মে, ২০০৭

প্রতি—

ড. প্রণবকৃষ্ণ চৌধুরী
অধ্যক্ষ,
ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ
ও
সভাপতি, শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি,
২৫/৩, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৯

প্রিয় অধ্যক্ষ মহাশয়,

আপনার ২৫ এপ্রিল তারিখের [C-8341(8)] চিঠি পেয়েছি। ১লা জুলাই ২০০৭, ঐতিহ্যমণ্ডিত ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের শতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হবে জেনে এবং এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে ভালো লাগল।

শিক্ষক শিক্ষণের মতো বিষয়ে নতুন চিন্তা ভাবনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়েও মনে সংশয় জাগে যখন দেখি বে-সরকারি উদ্যোগের অত্যধিক উৎসাহকে এবং দেশের রূঢ় বাস্তবকে অস্বীকার করে অন্ধ অনুকরণের মানসিকতাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে জাতীয় স্তরে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে। সুস্থ চিন্তাসম্পন্ন শিক্ষাবিদেরা একজন মহান শিক্ষাব্রতীর নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠানের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এ বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করবেন এ প্রত্যাশা থাকল। আমি শতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধনকে স্বাগত জানাই।

নমস্কারান্তে, অভিনন্দন সহ,

ভবদীয়

অমিত মল্লিক

(অমিত মল্লিক)

Professor Surabhi Banerjee
M.A. (Cal. et Leeds), Ph. D. (Cal.)
Vice-Chancellor

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY
Office : 1, Woodburn Park, Kolkata - 700 020
Tel. : 033-2283 5157, 2283 5666 (O), 2283 5156 (D), 2464 2047 (R)
Fax : 033-2283 5082, E-Mail : vc@wbnsou.com,
surabhi.banerjee@gmail.com, banerjee_surabhi@hotmail.com

শুভেচ্ছাবার্তা

ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ শতবর্ষ উদ্‌যাপন করতে চলেছে। একজন শিক্ষাব্রতী হিসেবে এটা আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের বিষয়। পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতবর্ষে শিক্ষার প্রসারে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের শতবর্ষব্যাপী ভূমিকা এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। যে সমস্ত শিক্ষাপ্রেমী ও শিক্ষাব্রতী মানুষ ও তাঁদের অনলস শ্রম ও ঐকান্তিক নিষ্ঠায় এই উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রটিকে গড়ে তুলেছেন তাঁরা আমাদের ধন্যবাদার্হ। আমরা যাঁরা এই মহৎ উদ্যোগের অংশীদার তাঁরা আজকের এই ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রক্ষণের সাক্ষী হয়ে রইলাম।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস উচ্চশিক্ষার যে মহৎ আদর্শ ও দৃষ্টান্ত এই শিক্ষাকেন্দ্র আমাদের সামনে স্থাপন করেছে তা পথ দেখাবে উচ্চশিক্ষাভিলাষী অসংখ্য ছাত্রছাত্রীকে আগামী দিনগুলিতে। আমরা জানি, একবিংশ শতাব্দী হল জ্ঞানের শতাব্দী। ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলে সেই লক্ষ্যে নিবেদিতপ্রাণ।

এই কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ প্রণবকৃষ্ণ চৌধুরী ও তাঁর সহযোগী প্রত্যেককে আমার শুভেচ্ছা জানাই।

সর্বান্তঃকরণে আশা করি এই বর্ষব্যাপী ঐতিহাসিক শতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গসুন্দর ও সার্থক হয়ে উঠুক।

শুভেচ্ছান্তে,

সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়

(অধ্যাপিকা সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়)
উপাচার্য
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রী প্রণবকৃষ্ণ চৌধুরী,
অধ্যক্ষ,
ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ,
কলকাতা

Bikash Ranjan Bhattacharyya
Mayor

The Kolkata Municipal Corporation
Central Municipal Office
5, S. N. Banerjee Road, Kolkata-700013
West Bengal, India
Phone : 2286-1211/1111/1011
: 2286-1000 (Extn.2471)
Fax : 0091-33-2286-1311
e-mail : cmcmayor@vsnl.net

18th June, 2007

MESSAGE

I am delighted to know that the yearlong Centenary Celebration Programmes of David Hare Training College are going to be observed on and from 1st July, 2007.

David Hare Training College, a Century old Teacher Education College of International repute is regarded as a pioneer in Teacher' training in our country. I would have been delighted to be present in the meeting, but, because of my pre-occupation, it may not be possible for me to attend. I regret my inability.

I wish a grand success of the celebration.

With warm greetings,

(Bikash Ranjah Bhattacharyya)

Dr. P. K, Choudhury
Principal,
David Hare Training College &
President, Centenary Celebration Committee,
25/3, Bailygunge Circular Road,
Kolkata - 700 019.

Resi.: 35 Purbalok • Kalikapur • Kolkata 700099 • ✆ : +91 (033) 2426 5555

Dr. S.S.Sarkar,
DIRECTOR OF PUBLIC INSTRUCTION, West Bengal
&
SECRETARY, EDUCATION DEPARTMENT (Ex-officio)
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
BIKASH BHAVAN, SALT LAKE, KOLKATA - 91

सत्यमेव जयते

Dated: 08.05.2007

MESSAGE

I am glad to know that the David Hare Training College, 25/3,Ballygunge Circular Road, Kolkata-700019, is going to observe the yearlong Centenary Celebration on 1st Jufy,2007.

On this occasion, I offer my best wishes to all concerned and wish the celebration a grand success.

(Dr.S.S.Sarkar)

Dr. Pranab Krishna Chowdhuri, Principal,
David Hare Training College,
25/3, Ballygunge Circular Road,
Kolkata-700019

FOREWORD

The David Hare Training College founded in 1908, is a name to conjure with in the field of education in general and teacher education in particular. Since its inceptiion, it has been continuously contributing to open newer frontiers in teaching-learning spheres providing the much needed academic leadership in the eastern part of the Indian sub-continent. Therefore, it is considred to be the pioneer and premier institution of teacher education in the country as a whole.

With the passage of time centenary of this illustrious institution has come as a natural consequence. We have also seized the opportunity to rise to the occasion by celebrating it in a befitting manner.

The inaugural ceremony was held on 1st July 2007, which was declared open by our Honourable Chief Minister Shri Buddhadeb Bhattacharjee. In his illuminating address on the occasion he made a special mention of the role of our college in promoting the cause of secondary education by imparting efficacious teacher education in the light of the innovations in this field.

We owe our sincerest gratitude to him for his august presence and the favour he bestowed on us by responding to our humble request.

We also express our heart—felt thanks to Shri Sudarshan Roy Chowdhuri, the Honourable Minsiter-in-charge of Higher Education, Government of West-Bengal for his inspiring and thought provoking speech and continuous encouragement with ample support to fulfil our mission of organizing the Centenary Celebration in a colorful manner.

We place on record our warmest gratitude to Shri Kshiti Goswami, Honourable Minister in charge, PWD, Government of West-Bengal, Professor Asis Kumar Banerjee, Honourable Vice Chancellor, Calcutta University, Professor Shyamal Kanti Sanyal, Honourable Vice Chancellor, Jadavpur University, Shri Ashok Mohon Chakrabarty, Additional chief Secretary, Dept. of Higher Education, Government of West-Bengal, Prof. Subha Sankar Sarkar, Director of Public Instruction, Government of West-Bengal and all other dignitaries and guests who inspired us with their presence, encouragement, valuable advices on this special occasion of the year long centenary celebration programme.

I, on behalf of the Centenary Celebration Committee, feel myself quite gratified to record my sincere feelings of pride to publish this Centenary Volume to commemorate the glorius and eventful existence of our beloved institution for the last one hundred years.

The publication contains summary of the lectures delivered by the distinguished guests on the eve of inauguration of the centenary celebration programme. Moreover, valuable contributions made by eminent educationists in this volume have added a new dimension to our understanding of the various relevant aspects of the field of education. Some articles or write-ups contributed by the alumni are by and large the memorabilia of their alma mater reflecting the rich tradition and glorius past of the institution. A short history of the college has also been incorporated in this volume.

A glimpse of the various programmes carried out at our institution during the year 2007 has also been included there.

In fine I consider myself very fortunate to have the privilege of serving this institution during this memorable period. I express my deep sense of admiration for my colleagues but for whose dedication and devotion, the programmes could not have been held nicely, the present volume would not have been published. Their unstinted support has made everything so beautifully performed. I am also very happy to have enthusiastic and sincere batches of students, alumni of the college to work with me for the success of the celebration programmes.

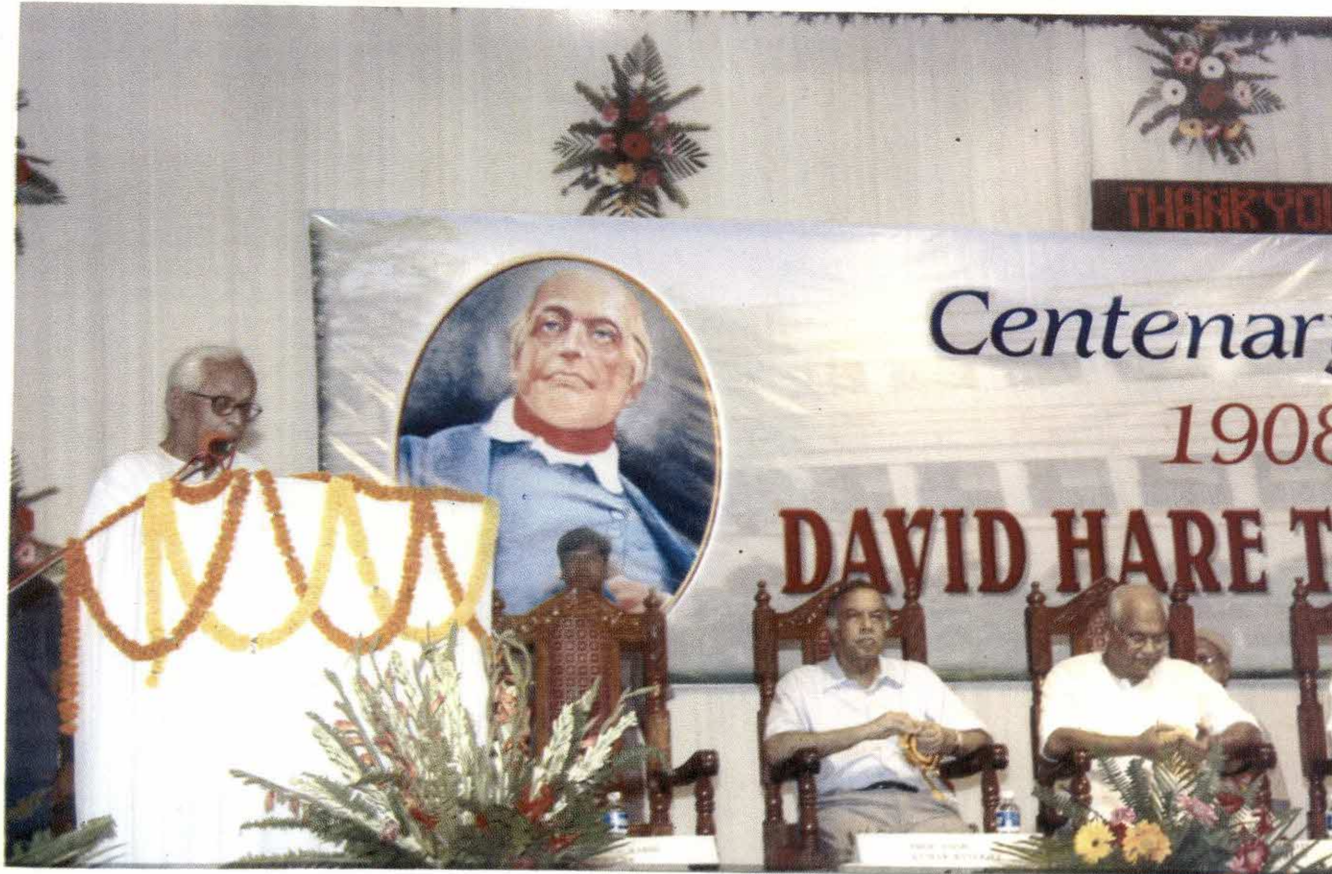
I also extend my warm sense of gratitude to all staff of this college for their useful services to make the programmes successful..

Lastly I thank all who love this institution from the core of their hearts.

Pronab Krishna Choudhury
Principal
David Hare Training College
and
President
Centenary Celebration Committee



কলেজের শতবর্ষ অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।



কলেজের শতবর্ষ অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

ডেভিড হেয়ার শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের বর্ষব্যাপী শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রারম্ভিক উদ্‌বোধনী দিবসে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন

ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী প্রণবকৃষ্ণ চৌধুরী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী শ্যামলকান্তি সান্যাল, আমার সহকর্মী উচ্চশিক্ষামন্ত্রী শ্রী সুদর্শন রায়চৌধুরী, পূর্তমন্ত্রী শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী, শিক্ষাসচিব শ্রী অশোকমোহন চক্রবর্তী, শিক্ষা অধিকর্তা শ্রী শুভশঙ্কর সরকার এবং উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী, শিক্ষা অনুরাগী ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি সত্যই খুব আনন্দিত। মানুষ গড়ার কারিগর তৈরির প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানের শতবর্ষ পূর্তি নিশ্চিতভাবেই একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। শিক্ষকদের শিক্ষণের যে গুরুদায়িত্ব, আপনাদের সেই গুরুদায়িত্ব, আপনারা আমরা একত্রে পালন করেই, এই প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচিয়ে রেখেছি, এগিয়ে নিয়ে চলেছি।

ইংরেজ আমলে আমাদের দেশের মাটিতে ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম ছিল, একথা সবাই আমরা জানি। ছিল শোষণ পীড়ন অত্যাচার। ঔপনিবেশিক শাসনের এ ছিল একটা দিক। এটি আমাদের কাছে সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক ছিল। যার বিরুদ্ধে সারা দেশে, দীর্ঘ সংগ্রামের পর আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম। যদিও ইংরেজশাসন ছিল মূলত অত্যাচার এবং দমননীতিনির্ভর, তবু ইংরেজশাসনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কার্ল মার্কস তিনি একটি আপাত অদ্ভুত কথা বলেছিলেন। কথাটি লক্ষ করবার মতো; তিনি বলেছিলেন, ইংরেজদের শাসনের এই ভয়ংকর দিকগুলোর সাথে সাথে, তারা ভারতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে বাধ্য হয়েছিল, সরকার চালাতে তারা রেলপথ গড়ে তুলতে বাধ্য হয়েছিল, তাদের ব্যাবসা বাড়াতে বেশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছিল, এগুলি ছিল ভারতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে অগ্রগতির অবচেতন হাতিয়ার। ইংরেজিতে বলা হয়েছে, 'Unconscious tool of history'-ইতিহাসের অবচেতন হাতিয়ার। তারা জানতেন না, এই হাতিয়ারগুলি তাদের বিরুদ্ধেই শেষ পর্যন্ত শানিত হবে।' সত্যই তাই, স্বাধীনতার আগের যুগে তারা এই ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের মতো সরকারি কলেজে সরকারি দপ্তরের কর্মী তৈরির জন্য, বাংলা-বিহার-ওড়িশা থেকে ছাত্রদের সমবেত করতেন। কিছু শেখাতেন, মূলত ইংরেজি শেখানো হত। ইংরেজি না শিখলে ঔপনিবেশিক শাসন চলে না। কিন্তু সেই যুগ থেকেই এই ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের মতো প্রতিষ্ঠান থেকেই নতুন চিন্তা, স্বাধীনতার নতুন চিন্তা শুরু হয়ে গিয়েছিল যা ইংরেজরা ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। তারই ফলে পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আমরা পেলাম; দেশকে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের হাতে এল। এরপর এই ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের ইতিহাস অগ্রগতির ইতিহাস। প্রতিটি বছর ধরে হিসেব করে যদি আমরা বিগত একশ বছরে, স্বাধীনতা-উত্তর পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস দেখি, যেটা আমাদের সচিব শ্রী অশোকমোহন চক্রবর্তীও উল্লেখ করেছেন, আমরা এই প্রতিষ্ঠানে এই শিক্ষাকেন্দ্রে বহু কাজ হতে দেখেছি। বহু কাজ এখনও হয়ে চলেছে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষণ এখানে বহুদিন ধরে চলেছে। বর্তমানে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও ট্রেনিং শুরু হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে সরকারের ভাবনাচিন্তা আমি আপনাদের সঙ্গে এই অবসরে ভাগ করে নিতে চাই। রাজ্যে সরকারের সামগ্রিক পরিকল্পনার মধ্যে দেখবেন, শিক্ষাকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি।

উন্নয়নের একটা ধারণা আছে শুধু শিল্পের উন্নয়ন, পরিকাঠামোর উন্নয়ন, কিন্তু আমাদের কাছে শিল্পের উন্নয়ন, কৃষির উন্নয়ন, পরিকাঠামোর উন্নয়নের পাশাপাশি মানব উন্নয়নের ব্যাপারটাও খুব জরুরি। গোটা দুনিয়া জুড়ে অর্থনীতিবিদদের এই লড়াই চলছে। মানব উন্নয়নকে বাদ দিয়ে কোনো উন্নয়নই শেষ পর্যন্ত টিকবে না, দাঁড়াবে না।

কিছু প্রতিষ্ঠান আমাদের অনবরত বোঝাচ্ছে, সরকারকে শিক্ষা থেকে উঠে আসতে হবে, স্বাস্থ্য থেকে উঠে আসতে হবে। এগুলিকে সব ব্যক্তিগত পুঁজির হাতে, দায়িত্বে দিয়ে দেওয়া হোক বাজার অর্থনীতির প্রবক্তারা এটা বলেন। তাঁরা মনে করেন বাজার অর্থনীতি 'Omnipotent' সর্বশক্তিমান। আমরা মনে করি না; বাজার অর্থনীতির মধ্যে আমরা আছি, কিন্তু বাজার অর্থনীতি অধিকাংশ মানুষকে প্রান্তিক অবস্থায় ফেলে দিচ্ছে। প্রশ্ন হল, এদের দায়িত্ব কে নেবে? এখানেই সরকারের দায়িত্ব। তাই আমাদের সরকার শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ। আমরা দায়িত্ব তুলে নিতে চাই। আপনারা লক্ষ করেছেন যে অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের ওয়েলফেয়ার স্টেট সম্পর্কে যে ধারণা, সেখানে একটা কথার উপর তিনি খুব জোর দিচ্ছেন। তিনি বলেছেন তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির মৌল শর্ত দুটি—এক, ভূমি সংস্কার, দুই, সার্বিক সাক্ষরতা। ভূমি সংস্কারে আমরা সারা দেশে একটা পথ দেখিয়েছি। তার ফলও আমরা অর্থনীতিতে পেয়েছি, কৃষি উৎপাদনে পেয়েছি। আমরা চাই সার্বিক সাক্ষরতা অর্জন করতে। একটা দেশের অন্তর্নিহিত শক্তি কত? তা আমাদের পারমাণবিক অস্ত্র আছে কি নেই তার উপর নির্ভর করে না। তা নির্ভর করে আমাদের সাক্ষরতার হার কত, তার উপরে। সারা দেশের মধ্যে কেরল এগিয়ে আছে ঠিকই, কিন্তু আমরা কেন পিছিয়ে থাকব? আমি শেষ পর্যন্ত যে হিসাব পেয়েছি, গত জনগণনার সময় আমাদের রাজ্যে সাক্ষরতার হার ছিল প্রায় ৭০-এর কাছকাছি। এখন আমরা প্রায় ৭৫ ভাগ সাক্ষরতায় পৌঁছেছি। যাদের বয়েস হয়ে গেছে, তাদের হয়তো শেষ পর্যন্ত, আমরা সাক্ষর করে তুলতে পারব না। কিন্তু যে নতুন প্রজন্ম আমরা চাই তাদের শতকরা একশো ভাগকে স্কুলে নিয়ে যেতে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর তাই আমাদের এত জোর। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য আমরা অর্থ ব্যয় করছি। শিক্ষকমহাশয়দের মাইনে, স্কুলের বই, মিড ডে মিল এই সব ব্যবস্থা আমরা করছি। আজকে আটষট্টি হাজার প্রাইমারি স্কুল আমাদের রাজ্যে। এই ৬৮ হাজার স্কুলের লক্ষ্য হচ্ছে, সর্ব অর্থে প্রকৃত সর্বশিক্ষা। সমস্ত শিশুকেই শিক্ষার অঙ্গনে, বিদ্যালয়ে নিয়ে আসা। একটা তথ্যসূত্রে আমি গতমাসে জেনেছি, সাত থেকে আট লাখ ছেলে-মেয়ে এখনও শিক্ষা অঙ্গনের বাইরে আছে। আমাদের লক্ষ্য একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে, প্রত্যেকটি শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসব। তার জন্য একদিকে যেমন শিক্ষা-দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে হবে, তেমনি অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকেও উদ্যোগ নিতে হবে। তাহলে হয়তো আরও পাঁচ-দশ বছর পরে, পরবর্তী প্রজন্মের সমস্ত শিশুকে বিদ্যালয়ে নিয়ে যেতে পারব। ঠিক এভাবেই আমরা চাইছি মাধ্যমিক শিক্ষাকেও বিস্তৃত করতে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়লেই অবশ্যই মাধ্যমিক স্কুলেও ছাত্রছাত্রীসংখ্যা বাড়বে। মাঝপথে আমরা আরেকটা পরিকল্পনা করেছি, যদিও দেরিতে, আমি বলতে বাধ্য, মাধ্যমিক স্তরেই সাধারণ পড়াশোনার সঙ্গে যদি আমরা ভোকেশনাল ট্রেনিংকে ব্যাপকভাবে না নিতে পারি, তবে চলবে না। ধরুন পাঁচ লাখ, ছ-লাখ ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে। ক-জন ফার্স্ট ডিভিশন পাবে? নিশ্চয়ই সকলে নয়, পৃথিবীর কোনো দেশেই সকলেই প্রথম বিভাগে পাশ করে না। কাজেই আমাদের প্রয়োজন জীবনমুখী শিক্ষা। ভোকেশনাল ট্রেনিং ব্যাপকভাবে মাধ্যমিক স্তরে প্রয়োগ করবার জন্য আমরা একটা পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা নিয়েছি। যদিও কাজটা শ্লথ গতিতে এগোচ্ছে, কিন্তু এগোচ্ছে।

টেকনিকাল এডুকেশন দপ্তরকে আমরা বলেছি এই কাজটায় গুরুত্ব দিতে। প্রত্যেকটি মাধ্যমিক স্কুলে যাতে (বৃত্তিমূলক শিক্ষা) আমরা একই সঙ্গে দিতে পারি তার চেষ্টা করতে হবে। যেসব ছাত্রছাত্রী হয়তো উচ্চমাধ্যমিকের স্তরে বা কলেজের স্তরে আর এগোতে পারবে না, পারছে না, তাদের সেখান থেকেই এই ট্রেনিংটা (বৃত্তিমূলক) দেওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

এর পরের প্রশ্ন বা বিষয় হচ্ছে উচ্চশিক্ষা। উচ্চশিক্ষা দপ্তর নতুন নতুন কলেজ খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অনেকগুলি কলেজ খোলা হয়েছে। গত এক বছরে আমার নতুন মন্ত্রী (উচ্চশিক্ষা) এতগুলি কলেজ করেছেন যে আমাদের রাজ্যে কলেজের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চারশো ছাড়িয়ে গেছে। আমরা এখন সারা রাজ্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানবিষয়ক একটি মানচিত্র করছি। সারা রাজ্যে কত স্কুল আছে, কত মাধ্যমিক স্কুল উচ্চমাধ্যমিক স্কুল এবং কোন্ জায়গায় সত্যি কলেজের অভাব আছে, প্রয়োজন আছে, কোথায় ঘাটতি রয়েছে। অর্থাৎ যেখানে কলেজ রয়েছে, সেখানে বাড়তি কলেজ করে লাভ নেই। এইভাবে একটা চেষ্টা হচ্ছে নতুন কলেজ সম্পর্কে একটা নীতি নির্ধারণ করার। আর একটা কথা, এটা আমরা আলোচনা করেছি নিজেদের মধ্যে, যে, নতুন কলেজ যেগুলি আমরা করব সেখানে বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিদ্যার উপর আমরা বিশেষ জোর দেব। আমরা সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শনকে বাতিল করছি না। কিন্তু আজকের যুগে বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিদ্যার যে অভাবনীয় উন্নতি, সারা দুনিয়াব্যাপী চলেছে, তার সঙ্গে তাল আমাদের রাখতেই হবে। আর তার জন্য উচ্চশিক্ষাকে একটু বেশিভাবে বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিদ্যা-অভিমুখী করতে হবে। না হলে আমাদের ছেলেমেয়েরা পিছিয়ে পড়বে। এই কথাটা আমাদের বিশেষভাবে উচ্চশিক্ষাস্তরে মনে রাখতে হবে।

সব শেষ কথা হচ্ছে এই, গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে যদি আমরা দেখি, প্রাথমিক-মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক-উচ্চশিক্ষা, (সেক্ষেত্রে) সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে যে কী করে শিক্ষার মানকে উন্নত করা যায়। কী করে শিক্ষা কেন্দ্রগুলিকে উৎকর্ষ-কেন্দ্র করা যায়। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকেই সমস্যার শুরু। আটষট্টি হাজার স্কুলতো হয়েছে। শিক্ষকরা কী রকম পড়াচ্ছেন? পড়াতে পারছেন কি না? তাঁর বা তাঁদের পড়ানোর পর, সেই ছেলেমেয়েগুলি, প্রাথমিক স্কুল থেকে, যখন ক্লাস ফোর ছেড়ে বেরিয়ে আসছে, (তখন) কী অবস্থা তাদের? সত্যিই তাদের শিক্ষার মান কত? আমি সংখ্যাতত্ত্বের মধ্যে যাব না, আত্মসন্তুষ্টির কোনো জায়গা নেই। মাধ্যমিক স্তরের অবস্থা হয়তো বা আর একটু উন্নত। কিন্তু আমাদের যা আশা আকাঙ্ক্ষা, তার থেকে এখনও আমরা দূরে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, আমাদের রাজ্যে ঐতিহ্যশালী ও উন্নত মানের সব বিশ্ববিদ্যালয় আছে। শিবপুরে আমাদের আরও একটি বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে গেল। আমাদের রাজ্যে উন্নত মানের কলেজ আছে। প্রেসিডেন্সি কলেজ আছে, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ আছে। উৎকর্ষ কেন্দ্র আমাদের আছে। (আমরা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজকে অটোনমাস স্ট্যাটাস দিয়েছি। প্রেসিডেন্সি সম্পর্কে অটোনমি নিয়ে, অটোনমির জন্য আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চলেছি।...) একদিকে হচ্ছে শিক্ষা বিস্তার। আমরা চাই সার্বিক সাক্ষরতা। আর উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে চাই আমরা উন্নতমান, উৎকর্ষ কেন্দ্র, সেই উৎকর্ষ কেন্দ্রের শিক্ষক তৈরি করার... স্কুলে এবং কলেজে শিক্ষক তৈরি করার দায়িত্ব অনেকাংশে আপনাদের ওপর রয়েছে। তাই আমি আশা করব...এই শতবর্ষে আসুন আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করি। পশ্চিমবাংলার সম্মান এখনও সারা দেশে, শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তত এখনও স্বীকৃত। এখনও আমরা সম্মানিত হই। কিন্তু আত্মসন্তুষ্টির কোনো জায়গা নেই। অন্য রাজ্যগুলি দ্রুত এগোচ্ছে। তাইজন্যে আমাদের শিক্ষার মানকে...যে উচ্চস্থানে আমরা ছিলাম, সেই উচ্চস্থানে রাখতেই হবে। সেই জন্য আমাদের সরকারের এবং আপনাদের ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজসহ সকল ঐতিহ্যময়

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অধ্যক্ষ আমাকে কলেজের একটা কথা বলছিলেন যে এই ক্যাম্পাসে আমাদের যে ক্লাসরুম আছে, তাতে কিছু সমস্যা তৈরি হচ্ছে, আরও কিছু ক্লাসরুম দরকার। শতবর্ষে সরকার এ ব্যাপারে কোনো প্রকল্প ভাবতে পারে? আমি বলছি অবশ্যই ভাবতে পারে। সরকারকে ভাবতে হবে। আমরা অনেকেই আছি...এখানে পূর্তমন্ত্রী আছেন। তাঁকে বলছি...আপনি অন্তত তৈরি করুন প্রোজেক্ট, অ্যানেক্স বিল্ডিং কোথায় হতে পারে। কত তলা ইত্যাদি। তারপরে অর্থদপ্তর অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে আমি, উচ্চশিক্ষামন্ত্রী, আমরা কথা বলব। কথাটা এই, যাতে এখানে জায়গার অসুবিধার জন্য, আমাদের কাজের পরিধি আটকে না থাকে। কাজ যাতে আরও উন্নত মানের করা যায়। আপনারা এখন স্কুল ছেড়ে কলেজের শিক্ষকদেরও দায়িত্ব নিয়েছেন, সুতরাং তার জন্য ক্লাসরুম চাই, ল্যাবোরেটরি চাই, আরও অনেক প্রাথমিক জিনিসও চাই। তার জন্য, এর অগ্রগতির জন্য, আপন স্বার্থেই সরকারকে কিছু করতে হবে এবং আমরা তার জন্য দায়বদ্ধ। আপনারা এই শতবর্ষে এই ঐতিহাসিক দিনটিতে ..যা আমরা পালন করছি, আসুন সকলে মিলে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজকে, আমরা আরও উন্নত মানের একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাকে তুলে ধরি। এই কথা বলে, আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য আমি শেষ করলাম। নমস্কার।



ভাষণরত মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী শ্রী সুদর্শন রায়চৌধুরী।

ডেভিড হেয়ার শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের বর্ষব্যাপী শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রারম্ভিক উদ্‌বোধনী দিবসে সম্মানীয় অতিথি হিসাবে উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী **শ্রী সুদর্শন রায়চৌধুরী** মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় মন্ত্রী শ্রীক্ষিতি গোস্বামী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক শ্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক শ্রী শ্যামলকান্তি সান্যাল, আমাদের সরকারের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব শ্রী অশোক মোহন চক্রবর্তী এবং শিক্ষা অধিকর্তা অধ্যাপক শ্রী শুভশঙ্কর সরকার, আর এই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মাননীয় শ্রী প্রবণকৃষ্ণ চৌধুরী, সমবেত বন্ধুগণ, আপনারা সবাই আজকের এই বিশেষ সময়ে, আমার ব্যক্তিগত ভাবে অভিনন্দন জানবেন এবং আপনাদের সামনে এই প্রত্যাশা রাখতে (আমার তরফে) লেশমাত্র দ্বিধা নেই, যে একশ বছর ধরে নানা কঠিন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে, বিশেষ করে, আমি, আপনাদের ঐ যেটা সুভেনিয়ারে দেখছিলাম, এক ঝলক, যে বিশেষ করে ঔপনিবেশিক আমলে, এই মহাবিদ্যালয় একাধিকবার বন্ধও হয়ে গেছে, তদানীন্তন প্রশাসনের তরফে যে সাহায্য সহযোগিতা পাওয়া গেছে তা নয়, অবশ্য এ নিয়ে দুঃখ করার কিছু নেই। আর এই মহাবিদ্যালয়ের যে ধরন (বৈশিষ্ট্য), সে ধরনটাই হচ্ছে (অন্যরকম), এখানে যাঁরা প্রশিক্ষিত হবেন (হচ্ছেন) তাঁরা বেরিয়ে, কর্মজীবনে, আমাদের যারা নতুন প্রজন্ম তাদেরকে প্রশিক্ষিত করবেন, তাদেরকে আলো দেখাবেন, স্বভাবতই এই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতি ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী খুব যে ঔদার্য দেখাবে, অনুকম্পা দেখাবে এটা মনে করবার কোনো কারণ নেই। স্বাধীনতার পরেও নানান সমস্যার মধ্য দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানকে চলতে হয়েছে, আজও নিশ্চয়ই কিছু সমস্যা রয়েছে, আমি ধরেই নিচ্ছি (রয়েছে) এটা স্বতঃসিদ্ধ, কারণ আমাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাছাড়া নানান কাঠামোগত অসুবিধাতো থাকতেই পারে। কিন্তু সামনের এই একটা বছর আমাদের (সকলের) খুব চেষ্টা থাকবে অসুবিধাগুলি দূর করবার জন্য। সীমিত ক্ষমতার মধ্যে, আমাদের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে এগুলি (অসুবিধাগুলি) দূর করা এবং একই সঙ্গে নিরন্তর চেষ্টা চালানো উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে। কারণ ঐ যেটা বললাম, এই মহাবিদ্যালয়ের একটা স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, যে এখানের থেকে বেরিয়ে যাঁরা কর্মজীবনে প্রবেশ করছেন তাঁদের একটা বড়ো দায়িত্ব ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের আগামী দিনের উপযুক্ত করে তোলা। এই ব্যাপারে আগামী একটা বছর এই শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে যে নানান অনুষ্ঠান আলোচনা ইত্যাদি হবে, সেগুলি ওই মহত্তর যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখে, সেই কাজে নিশ্চয়ই নিবেদিত হবে, এই প্রত্যাশা রেখে, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ, সবাইকে নমস্কার, সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার কথা শেষ করছি।

ডেভিড হেয়ার শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের বর্ষব্যাপী শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রারম্ভিক উদ্‌বোধনী দিবসে মাননীয় অতিথি হিসাবে উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গের পূর্ত ও সড়ক বিভাগের শ্রদ্ধেয় মন্ত্রী **শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী** মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন

মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী শ্রী সুদর্শন রায়চৌধুরী মহাশয়, এখানে উপস্থিত আছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর আশিস ব্যানার্জি মহাশয়, উপস্থিত আছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শ্যামলকান্তি সান্যাল মহাশয়, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সচিব, যিনি অতিরিক্ত মুখ্যসচিবও বটে—শ্রী অশোকমোহন চক্রবর্তী এবং শিক্ষা অধিকর্তা শ্রী শুভশঙ্কর সরকার ও এই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ প্রফেসর চৌধুরী এবং আমার সামনে যাঁরা বসে আছেন, যাঁরা নিজেরাই যথেষ্ট সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা নিয়ে তাঁদের অনেক গবেষণা, তাঁরা এখানে অছেন, আর আমার প্রিয় উপস্থিত ছাত্রছাত্রী ভাই-বোনেরা। আজকের এই শুভদিন,একটা ঐতিহাসিক দিন। শতবর্ষে পদার্পণ করেছে এই মহাবিদ্যালয়। এই মহাবিদ্যালয় যাঁর নামে নামাঙ্কিত তিনি ভারতবর্ষে জ্ঞানাঞ্জনশলাকা প্রজ্বলিত করতে এক অনবদ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, যা আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি। অনেক প্রশ্ন ওঠে, যাঁরা আমাদের শাসনকর্তা ছিলেন, তাঁরা যে সময়ে এখানে শিক্ষা প্রসার শুরু করেছিলেন (তখন) স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের মনে (বোধহয়) এই ধারণা ছিল, যে ভারতবর্ষে ইংরেজশাসন কোনোদিনই শেষ হবে না। ভারতবর্ষে ইংরেজশাসন চলছে, চলবেই। আর সেই শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গেলে, তার একটি আদল (মডেল) অবশ্যই তৈরি হওয়া দরকার, এইসঙ্গে সেই শিক্ষা যা সেই সময়ে আন্তর্জাতিক মানের বলে গৃহীত হয়েছিল, সেই আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা যাতে ভারতবর্ষে প্রচলিত করা যায়, সেই ধরনের প্রচেষ্টা, সেদিনের শাসক যাঁরা ছিলেন তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আমরা জানি, এরই মধ্য দিয়ে, সেদিন যাঁরা শিক্ষা লাভ করেছেন, চেতনা লাভ করেছেন, যাঁদের কাছে শিক্ষাসংক্রান্ত নানান চিন্তা গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে, যাঁরা তার মধ্যে থেকে কাজ করেছেন, গবেষণা করেছেন। তাঁরা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমস্ত বিষয়টাকে দেখতে চেষ্টা করেছেন, আর এটা স্বাভাবিক যে দেশে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, সে দেশের প্রতি তার একটা টান থাকেই এবং আমরা যেখানে বাস করি, সেখানকার, সেই দেশের একটা (বিশেষ) সংস্কৃতি একটা শিক্ষা, একটা সামাজিক বাতাবরণ তাঁর বা তাঁদের চিন্তায় কর্মকাণ্ডে প্রভাব ফেলেই থাকে। যদিও আমাদের বিদেশি শাসকেরা এরকম ভাবে ভাবতেন না, বা মানতেনও না, তাঁরা মনে করতেন তাঁরাই প্রথম এসে আমাদের দেশটাকে সুসভ্য করলেন। যদিচ আমরা প্রাচীনতম সভ্যতার দেশ, কাজেই এই দেশের মানুষের মনে একটা আত্মমর্যাদা এবং গৌরবের বোধ অবশ্যই ছিল। বিদেশি শাসককুল এসে তা ভেঙে ধূলিসাৎ করে দিতে কখনোই পারেনি। কাজেই যা অন্তরে প্রকাশিত হয়েছিল, তাকে এই ইংরেজপ্রবর্তিত শিক্ষাও খানিকটা উস্‌কে দিয়েছিল। এরই ফলশ্রুতিতে শিক্ষাকে, শিক্ষার প্রসারকে একটা আন্দোলনের মতো গ্রহণ করে, বহু মানুষ, বহু মনীষী, তাঁরা শিক্ষার প্রসারণ ঘটানোর জন্য পরবর্তী সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। অতএব আমাদের প্রাক্তন শাসকবর্গ যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই শিক্ষার প্রসার ঘটানোর চেষ্টা করুন না কেন, ভারতবর্ষের আর একদল মানুষ তাঁরা কিন্তু এই শিক্ষাকে অবলম্বন করে, সারা পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দিতে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন—আধুনিক শিক্ষা—যা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় প্রচলিত



শতবর্ষের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণরত মাননীয় পূর্তমন্ত্রী শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী।

ছিল তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার জন্য আমাদের দেশকে জাতিকে গড়ে তুলবার জন্য নিরন্তর কর্মযজ্ঞ তাঁরা শুরু করেছিলেন এবং এরই সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় মূল্যবোধকে জাগ্রত রেখে, দেশমাতৃকার প্রতি যে দায়বদ্ধতার পবিত্র কর্তব্য একজন দেশের সচেতন শিক্ষিত মানুষের থাকা উচিত তাঁরা প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি তা সঞ্চালিত করে গিয়েছেন। কাজেই এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যা ডেভিড হেয়ার-এর নামে নামাঙ্কিত তাতে মনে হতে পারে যে এই প্রতিষ্ঠানটি বোধহয় বিদেশি স্বার্থবাহী শিক্ষাই প্রচলিত করার বাহন হিসেবেই কাজ করেছে যেহেতু ব্রিটিশ সরকার এই প্রতিষ্ঠানটিকে গড়ে তুলেছিলেন। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের জাতীয়তাবাদী গুরুত্ব ছিল, না এমন নয়। বরং এখান থেকেই বীজতলা তৈরি হয়েছে আধুনিক জাতীয়তাবাদী শিক্ষারও। আমরা জানি শত শত বিঘে জমিতে চাষ করতে গেলে, কয়েক কাঠা জমিতে বীজতলা তৈরী করতে হয় এবং সেই বীজতলাতে যদি আমরা সুস্থ বীজ দিয়ে সুস্থ চারা তৈরি করতে পারি, তবেই সেই চারা বিভিন্ন জায়গায় রোপণ করে দিলে, শতশত বিঘে জমিতে চাষ সম্ভব হয়। ঠিক তেমনই এই ধরনের (ডেভিড হেয়ার) প্রতিষ্ঠান, একটা বীজতলার মতো কাজ করেছে। আর এখানে যাঁরা শিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা সেভাবেই, সেই চারাগাছেই পরিণত হয়েছেন, যাঁরা বিভিন্ন জায়গায়, যাঁরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জীবিকা ও শিক্ষাপ্রসারে নিয়োজিত হয়েছেন—তাঁরা সেই সব জায়গায় জ্ঞানের আলো উদ্‌ভাসিত করবার চেষ্টা করেছেন। অজ্ঞানতার অন্ধকারকে দূর করে বহু মানুষের মধ্যে তাঁরা শিক্ষার আলো পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। কাজেই এই প্রতিষ্ঠানের অবদানকে কখনোই আমরা ছোটো করে দেখতে পারি না। এ অবদান ঐতিহাসিক অবদান। আমাদের জাতি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছে, এই শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় নিঃসন্দেহে তার মধ্যে অন্যতম ও প্রাচীনতম। আজকে আধুনিক শিক্ষার যে প্রচলন হচ্ছে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির যে অগ্রগতি ঘটছে, তার সঙ্গে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা গবেষণা ইত্যাদি চলেছে। যাঁরা এখানে শিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন, সেই সমস্ত আদর্শ শিক্ষক মহাশয়গণ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে যাঁরা অবিরাম গবেষণা করে চলেছেন, আজকে তাঁদের এটাই ভাবতে হচ্ছে যে, আধুনিক যে বিষয় এসেছে, প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশের শিক্ষা কী করে, কোন্ পথে এগোবে? এবং শিক্ষা এগোবার ক্ষেত্রে যেমন উচ্চশিক্ষার একটা ক্ষেত্র রয়েছে তেমনই রয়েছে সার্বিক সাক্ষরতার দিকটিও। যেহেতু আজকে আমরা স্বাধীন হয়েছি, সেহেতু আমাদের শুধু উচ্চশিক্ষার দিক দেখলেই চলবে না। আপামর জনসাধারণ যেখানে আছেন, সেখানে অশিক্ষার অন্ধকারকে দূর করতে হবে। আর সেই অশিক্ষার অন্ধকারকে দূর করতে গেলে, শিক্ষার যে বিভিন্নরকম পদ্ধতি প্রকরণ রয়েছে, তাকে আরও বেশি করে কীভাবে মানুষের কাছে নিয়ে আসা যায়, সে প্রচেষ্টা যাঁরা শিক্ষা নিয়ে গবেষণা করছেন তাঁদের কাছ থেকে আমরা নিশ্চয়ই আশা করব। আমাদের সকলেরই জানা আছে ইংল্যাণ্ডে যখন রাজতন্ত্রের অবসান হয়েছিল ইংরেজগণ নিজেদের দেশে যখন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা শুরু করেছিলেন, তখন তার অন্যতম শর্ত ছিল শিক্ষাকে সর্বস্তরে পৌঁছিয়ে দেওয়ার।

আর তখনই তাঁরা একদিকে যেমন ফর্মাল এডুকেশনের প্রচলন করেন, তেমনি তার পাশাপাশি নন-ফর্মাল এডুকেশন নিয়েও তাঁরা আন্দোলন করেন, ও সেই আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেন। আজকে যখন আমরা দেখি যে পৃথিবীর নিরক্ষর মানুষের অর্ধেক অংশই ভারতবর্ষে বসবাস করে, স্বাধীনতার এতদিন পরে এসেও যখন একথা আমাদের উচ্চারণ করতে হয়, তখন মর্মবেদনার শেষ থাকে না। কাজেই (শিক্ষাকে) শুধুমাত্র ফর্মাল এডুকেশনে সীমাবদ্ধ রেখে অশিক্ষাকে আমরা দূর করতে পারব না। ফর্মাল এডুকেশন ছাড়াও অন্য পদ্ধতির মধ্য দিয়ে আমাদের মানুষের কাছে পৌঁছাতে চেষ্টা চালাতে হবে। তাছাড়া, শুধু কি সাক্ষর করলেই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যায়? সাক্ষরতার পরবর্তীকালে সেই

শিক্ষক ব্যাবহারিক জীবনে কাজে লাগানোর জন্য, শিক্ষাকে হাতিয়ার করে মানুষ যাতে তাকে জীবিকার ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারে, তার দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। আর আমাদের নিশ্চয়ই মনে রাখতে হবে যে, কোনো মানুষের যদি আত্মমর্যাদা জ্ঞান না থাকে, আত্মসচেতনতা যদি না থাকে, তাহলে সেই মানুষ জাতি গড়তে পারে না, জাতি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সমৃদ্ধিময় অবদান রাখতে পারে না। কিন্তু আমাদের এখানে আজও দারিদ্র্যসীমার নীচে অনেক মানুষ বসবাস করেন, যাঁরা শিক্ষার ধারে পাশেই আসতে পারেন না, পারছেন না। দারিদ্র্যসীমার নীচে যে মানুষেরা আছেন, তাঁদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করাটাও কিন্তু গণতন্ত্রের একটা শর্ত। সেই শর্তে আমরা শিক্ষাকে ততদূর পৌঁছে দিতে পারি কি না দেখতে হবে। যার মধ্য দিয়ে দেখতে হবে, সেই অংশের মানুষেরা সক্ষম হয়ে উঠেছেন, তাঁদের ক্ষমতায়ন ঘটেছে এবং শিক্ষাই পারে তাদের সেই সত্যিকারের ক্ষমতায় এনে দিতে। সেই কারণে শিক্ষা নিয়ে অনেক ভাবনাচিন্তা হচ্ছে এবং আমাদের পশ্চিমবাংলার দীর্ঘ দিনের একটা প্রগতিশীল সরকার, যাঁরা ভাবনা চিন্তা করেন, যাঁদের প্রগতিশীল বলে সারা পৃথিবী মেনে নিচ্ছে, সেই প্রগতিশীল সরকারের দায়িত্ব আমরা মনে করি অনেক বেশি, অনেক গভীর; তবে এই দায়িত্ব পালন করতে গেলে শিক্ষাবিদ যাঁরা আছেন, গবেষক যাঁরা আছেন,শিক্ষা নিয়ে কাজে যাঁরা নিজেদের উজাড় করে দিচ্ছেন, সেই সব মানুষ—তাঁদেরকে অনুরোধ করব নেতৃত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে। আর ইতিমধ্যেই আমরা জানি, গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে এখন এই প্রচেষ্টাই চলছে, প্রায় দেড় কোটি মানুষ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে বা সাক্ষরতা অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন—এ বড়ো কম কথা নয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে কত মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন, তার হিসেব আমরা জানি না, কিন্তু আজকে ভারতবর্ষকে গড়বার জন্য যখন দেড় কোটি মানুষ নিজেদেরকে উৎসর্গীকৃত করেন, শিক্ষা প্রসারের জন্য তাঁরা কাজে লাগেন, তখন মনে হয়, স্বাধীনতা আন্দোলনের থেকে এ আন্দোলন কম নয়, এ আন্দোলন উন্নয়নের আন্দোলন। আজকে ভারতবর্ষ জুড়ে আন্দোলন চলছে, আমাদের পশ্চিমবাংলায় সাক্ষরতার যে আন্দোলন চলছে সে আন্দোলনে আমরা লক্ষ লক্ষ মোটিভেটরদের পাচ্ছি। তাঁরা খুবই উৎসাহের সঙ্গে কাজ করছেন। আমরাই হয়তো বা তাদের উৎসাহের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সবটা দেখে উঠতে পারছি না। তাই আমাদের আরও সচেতনভাবে সেটা দেখতে হবে। আজকে শতবর্ষে এই পবিত্র দিনটিতে যাঁরা শিক্ষা নিয়েই গবেষণা করছেন, সেই সব শ্রদ্ধেয় যাঁরা উপস্থিত আছেন, যাঁরা প্রাক্তনী ছাত্রছাত্রী আছেন, যাঁরা অনেক চিন্তাভাবনা করেন, যাঁদের বহু লেখাজোকা আমরা মাঝেমধ্যে পাই, দেখি, পড়বার সুযোগ হয়, আর বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত আছেন, তাঁরাও এখন আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে অনেক ভাবনাচিন্তা করছেন। আমি আশা করব, সব দিক থেকে তাঁরা আমাদের সমাজকে সমৃদ্ধ করার ভূমিকা গ্রহণ করবেন। আমাদের দেশকে আমাদের এ রাজ্যকে আরও সমৃদ্ধ করবার জন্য তাঁরা এগিয়ে আসবেন। আজকে শতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে সেই কামনা জানিয়ে, আপনাদের সকলকে আমার শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য শেষ করলাম। নমস্কার।

শতবর্ষে ডেভিড হেয়ার শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়

—*(সংকলক)* শ্রী নাগার্জুন ভরদ্বাজ

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে পয়লা জুলাই তারিখে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এই কলকাতা শহরে। বাংলার সরকারি উচ্চবিদ্যালয় (High School) গুলির ইংরেজী মাধ্যম (English Teachers) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যেই কলেজটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এর পর এর কাজের পরিধি বাড়ে, অন্য বর্গের (Categories) শিক্ষকদের এবং বিদ্যালয় পরিদর্শকদের প্রশিক্ষণও এখানে দেওয়া হতে থাকে। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার ইংরেজী মাধ্যম ও দেশীয় ভাষার বিদ্যালয়ের ভারতীয় শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণদানের জন্য পরিকল্পিত এই প্রকল্পটির বাস্তবায়ন হবার পূর্বেই বহুবার ও বহুলভাবে পরিবর্তন ঘটেছিল।

তৎকালে ইংরাজী মাধ্যম শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে বাংলা বেশ অনেকটাই পিছিয়ে ছিল। অথচ মাদ্রাজ সেই ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দেই দেশীয় ভাষায় ও ইঙ্গদেশীয় বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের জন্য একটি নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিল, যেটি ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে একটি গ্রাজুয়েট ট্রেনিং কলেজে উন্নীত হয়। অন্য দিকে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে জন্মলাভ করেছিল লাহোর সেন্ট্রাল ট্রেনিং কলেজ। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে কার্শিয়াং-এ ইংরেজী মাধ্যম শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ ক্লাস শুরু হয়েছিল কিন্তু এই কেন্দ্রে দেশীয় ভারতীয় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ পাবার সুযোগ প্রায় ছিল না। এমত অবস্থায় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে এই ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের প্রতিষ্ঠা, বাংলা তথা পূর্ব ভারতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় পদক্ষেপ ছিল। ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের প্রতিষ্ঠা হবার পর 'দি ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল' নামে যে অর্ধশতক প্রাচীন ক্যালকাটা নর্মাল স্কুলটি ছিল সেটি এই কলেজের অধ্যক্ষের শিক্ষাসংক্রান্ত ও প্রশাসনিক কর্তৃত্বের আওতায় নিয়ে আসা হয়। নর্মাল স্কুল ব্যবস্থার বিলুপ্তির পর নূতন কীভাবে বা কোন্ পথে শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়টি বিকশিত হবে, এই প্রশ্নের মীমাংসাকল্পে ও উন্নত পথের হদিশ পেতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাস্তবিক দেশীয় ভাষার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণকে অধিকতর উপযোগী এবং কার্যকরী করার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তাও ছিল অসীম।

প্রদীপ প্রজ্বলনের আগে সলতে পাকানোর পর্ব ঃ

১৯০১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তা শ্রী আলেকজান্দার পেডলার শিক্ষক প্রশিক্ষণের উন্নয়নের লক্ষ্যে যখন একটি সার্বিক প্রকল্প রচনা করেন তখন তার মধ্যেই এই কলেজ প্রতিষ্ঠার বীজটি রোপিত হয়েছিল। তবে পেডলার প্রস্তাবিত প্রকল্পে প্রথম শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হবার কথা হয়েছিল হুগলিতে।

এই সময় একসঙ্গে তিনটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। যার মধ্যে প্রথম কলেজটি প্রতিষ্ঠার কথা হয়েছিল হুগলি জেলায়। সেখানকার ট্রেনিং স্কুলের বাড়িটির একাংশেই প্রাথমিক ভাবে কলেজটি প্রতিষ্ঠার কথা ভাবা হয়। এই সঙ্গে প্রস্তাব ছিল হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলটিকে ট্রেনিং কলেজের মডেল স্কুলে পরিণত করার। অতএব ৮০০০ টাকা ধার্য করার প্রস্তাব ছিল সাজসরঞ্জাম বাবদে ও বার্ষিক নিয়মিত খরচ বাবদে (মুখ্যত বেতন) ধার্য করার প্রস্তাব করা হয়েছিল আরও ১৫,৭৩২ টাকা।

দ্বিতীয় ট্রেনিং কলেজটি প্রতিষ্ঠার কথা ভাবা হয়েছিল ঢাকা জেলায় যেখানে কলেজের বাড়ি এবং মডেল স্কুলটির বাড়ি তৈরির জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ৬০,০০০ টাকা। তৃতীয় কলেজটি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ছিল ভাগলপুরে। এরপর ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কিছু পরামর্শ অনুসারে প্রকল্পটি নূতন করে ভাবা হয়, শিক্ষা দপ্তরের বদলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইংরেজী মাধ্যম শিক্ষকদের

জন্য একটি মাত্র ট্রেনিং কলেজ স্থাপনার কথা হয়। আর অন্য দুটি নর্মাল কলেজ হিসাবে গড়ে তোলার কথা ভাবা হয়, যে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ (affiliated) না হয়ে, হবে শিক্ষা দপ্তরের আয়ত্তাধীন। মাধ্যমিক বা ইন্টারমিডিয়েট স্তর উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের এই নর্মাল কলেজগুলি দুই বছরের একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। বিদ্যালয়ের উচ্চপ্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য এই কোর্সটি হবে স্বীকৃতি স্বরূপ। অন্যদিকে ট্রেনিং কলেজটি হবে একবছরের একটি প্রশিক্ষণদানের কেন্দ্র যা হবে কেবলমাত্র গ্রাজুয়েটদের জন্যই। উচ্চবিদ্যালয় স্তরে শিক্ষকতার জন্য এই প্রশিক্ষণ কোর্সটি হবে একটি পেশাদারিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ কোর্স। পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত অনুসারে ট্রেনিং কলেজটি হবে হুগলিতে আর নর্মাল কলেজ দুটি হবে যথাক্রমে ঢাকায় ও ভাগলপুরে।

আশা প্রকাশ করা হয় শিক্ষকতার ক্ষেত্রে এই স্নাতকোত্তর ট্রেনিং কোর্সটি, মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনীয়ারিং পেশায় প্রবেশের ক্ষেত্রে যে পেশাদারিত্বের প্রশিক্ষণ হয়, তার সমমর্যাদাসম্পন্ন হবে।

ঐ সময়ে বার্ষিক ৪৫০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষিত করার লক্ষ রেখে প্রাথমিক প্রস্তাবে প্রতিটি কলেজে ১৫০ জন ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণদানের কথা ভাবা হয়েছিল। এখন পরিবর্তিত প্রস্তাবে প্রতিটি কলেজে ৫০ জন ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণদানের কথা বলা হয়।

পরিবর্তিত প্রকল্পটি এরপর ১৯০৪-এর জানুয়ারি মাসে ভারত সরকারের অনুমোদন লাভ করে। অনুমোদনের পর সরকারি চাকুরির নিয়োগপত্র পেয়ে বিলাত থেকে রওনা হয়ে ১৭ই ডিসেম্বর ১৯০৬ কলকাতায় আসেন শ্রী ডব্লু.ই.গ্রিফিথ্, শ্রী এ. করম্যাক, শ্রী এইচ্. আরমিস্টেড্, শ্রী ডব্লু. বেলারবি এবং শ্রী জে.ই.হুইটেকার।

যথাক্রমে প্রথম দুজন ট্রেনিং কলেজের শিক্ষকরূপে এবং পরবর্তী তিনজন প্র্যাকটিসিং মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে।

কর্মক্ষেত্রে নিযুক্তির জন্য এঁরা বাংলার প্রাদেশিক শিক্ষা অধিকর্তার কাছে রির্পোট করলেও, ইতিমধ্যে প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে, নানা রকম প্রশাসনিক জটিলতায় ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অঙ্কুরেই চাপা পড়ে যায় এবং এদের নিযুক্তির বিষয়টি নিয়ে অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়।

এর আগে ১৯০৬-এর পয়লা অক্টোবর তারিখে প্রস্তাবিত ট্রেনিং কলেজটির অধ্যক্ষ এবং নর্মাল কলেজ—দুটির সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসাবে নিযুক্ত শ্রী আর.এস ভারলে-ও কলকাতায় এসে গিয়েছিলেন। তিনি হুগলিতে নির্বাচিত ক্ষেত্রটি পরিদর্শন করেন এবং মুখ্যত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিবেচনায় ঐ স্থানে কলেজ প্রতিষ্ঠার তীব্র বিরোধিতা করেন। এই সঙ্গে ঐ স্থানে প্র্যাকটিস টিচিং-এর সুবিধাও কম পাওয়া যাবে বলে মত প্রকাশ করেন।

অতঃপর কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগটি একটি ঘূর্ণাবর্তের সম্মুখীন হয়। এমত অবস্থায় বিলেত থেকে আসা দ্বিতীয় দলটির সদস্যরা প্রেসিডেন্সি কলেজে কাজে যোগদান করেন ও সেখানে পড়াতে শুরু করেন। এই সঙ্গে তারা হেয়ার ও হিন্দু কলেজের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের কাজও শুরু করে দেন। একসময় এঁরা এই স্কুল দুটিতেও কিছু কিছু বিষয়, বিভিন্ন শ্রেণিতে তাদের আগ্রহ ও পছন্দ অনুসারে পড়াতে শুরু করে দেন।

অন্যদিকে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষক প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশক্রমে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন মোতাবেক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দুটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এক, শিক্ষকতার ক্ষেত্রে একটি লাইসেনসিয়েট (Licentiate in Teaching) কোর্স প্রচলন করা হবে যেখানে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করাবার পর দু বছরের জন্য যে কেউ এই কোর্স পড়তে পারবেন। আর দুই, শিক্ষকতার ক্ষেত্রে একটি ডিগ্রি কোর্স (a degree of Bachelor of Teaching) প্রবর্তন করা হবে যা হবে এক বছরের জন্য।

ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে যে কেউ দু বছরের জন্য এই (L.T.Course) লাইসেনসিয়েট কোর্সে ভর্তি হবার আবেদন করার যোগ্য বিবেচিত হবেন। এই কোর্সে তাদের বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃত কোনো কলেজে শিক্ষাতত্ত্ববিষয়ক পাঠ গ্রহণ (Lecture attend) করতে হবে। আর ছয় মাস কোনো বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক ব্যাবহারিক শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। এই কোর্সের তাত্ত্বিক অংশের পাঠ্যক্রমটি হবে নিম্নরূপ ঃ-

১। নৈতিক ও মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষকতার তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত ব্যাবহারিক কৌশল।

২। নির্দিষ্ট বিষয়ে পাঠদান পদ্ধতি ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা।

৩। নির্বাচিত শিক্ষাসংক্রান্ত ধ্রুপদী রচনা।

৪। স্নাতক স্তরের উপযোগী নির্বাচিত ইংরাজী গদ্য ও পদ্য।

পাঠান্তে এই চারটি বিষয়ের উপর একটি লিখিত পরীক্ষা হবে এবং একটি ব্যাবহারিক পাঠদানের বা শিক্ষকতার পরীক্ষা হবে কোনো একটি স্বীকৃত বিদ্যালয়ে নিম্মলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে যে কোনো তিনটি বিষয়ে।

(ক) ইংরেজী (খ) একটি ধ্রুপদী ভাষা (গ) ইতিহাস (ঘ) অঙ্ক (ঙ) ভূগোল (চ) স্কুলস্তরের পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র (ছ) মেকানিকস্ (জ) কিন্ডারগার্টেন এবং অবজেক্ট লেশান।

আর ব্যাচেলার অব টিচিং (Bachelor of Teaching) কোর্সের জন্য বি.এ. বা বি. এস. সি. পাশ করে যে কেউ এই কোর্সে সামিল হতে পারবেন। তাদের ট্রেনিং কলেজে নিয়মিত ক্লাস করার পাশাপাশি ছয় মাসব্যাপী ন্যূনতম পঞ্চাশটি লেসন্ বিদ্যালয়ে পড়িয়ে ব্যাবহারিক অনুশীলনে অংশ নিতে হবে।

কোর্সে যা থাকবে তা হল এক এবং দুই L.T. কোর্সের অনুরূপ। তিন শিক্ষাবিষয়ক চিন্তা ও পদ্ধতির ইতিহাস। চার নির্বাচিত শিক্ষাসংক্রান্ত ধ্রুপদী আলোচনা/রচনা। তাত্ত্বিক অংশের মোট নম্বর হবে ৪০০ আর ব্যাবহারিক অংশের মোট নম্বর হবে ৩০০।

উপরিউক্ত পরিকল্পনাগুলি চিন্তাভাবনাগতভাবে অনেকদূর এগিয়ে গেলেও বাস্তবায়নের বিষয়টা কিন্তু এত সহজে কোনো মতেই হয়ে ওঠেনি। নানান সমস্যা ও জটিলতার জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল প্রকল্পসমূহ। তবুও হতাশার পাশ ছিন্ন করে এই কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কিভাবে মন্থর অথচ নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলতে হয়েছিল সেই সময়কার শিক্ষাব্রতী ব্যক্তিবর্গকে তা এই সময়ে বসে আমরা অনুমান করতে পারি মাত্র।

ইত্যবসরে প্রস্তাবিত অধ্যক্ষ শ্রী আর এস ভারলে্ পদত্যাগ করেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে শ্রী এইচ.আর.জেমসকে তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তা, এই ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তা ও উদ্যোগ গ্রহণের দায়িত্ব দেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী এইচ.আর জেমস চিন্তা ভাবনা ও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা শুরু করেন। জেমস-এর নূতন আকারের প্রকল্পটি ২১ শে জানুয়ারি ১৯০৮ খ্রি.এর পর উচ্চস্তরের একটি কমিটিতে আলোচিত ও অনুমোদিত হয়। অতঃপর পদ্ধতিগত বিষয়ে লেকচারগুলি শ্রী গ্রিফিথ ও আর্মিস্টেড দেবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়। অস্থায়ী ভাবে কলেজটি কোথায় প্রতিষ্ঠিত হবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। কলেজ প্রতিষ্ঠার দিন ঠিক হয় পয়লা জুলাই, ১৯০৮ খ্রি.। প্রস্তাবে বলা হয় হেয়ার ও হিন্দু কলেজের কাছাকাছি কোথাও চার পাঁচটি ঘর ভাড়া নিয়ে অস্থায়ী ভাবে কলেজ শুরু করে দেওয়া হবে। হেয়ার ও হিন্দু স্কুলকে ব্যাবহারিক অনুশীলনের কাজে ব্যবহার করা হবে। আর প্রেসিডেন্সি কলেজের কাছে শিয়ালদহের উত্তরে কোথাও কলেজের স্থায়ী বাড়ি তৈরির লক্ষ্যে জমির খোঁজ চালানো হবে, তা না হলে শহরের কোনো স্বাস্থ্যকর স্থানে প্রস্তাবিত কলেজটি

প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই সঙ্গে শ্রী জেমস্-এর প্রস্তাব অনুসারে প্রস্তাবিত কলেজটির নামও মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের নামে করার কথা স্বীকৃত হয়।

প্রদীপ জ্বলার পর্ব

অবশেষে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ২০ জন গ্রাজুয়েট বিদ্যার্থীকে নিয়ে সূচনা হয় ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের পথচলা। এই সময় ১৮ টি আসন সরকারি বিদ্যালয়ের জন্য সংরক্ষিত করা হয়, আর মাত্র দুটি আসন রাখা হয় বেসরকারি স্কুলের জন্য। কলকাতায় ১৫ জানুয়ারি হেয়ার স্কুলে প্রশিক্ষণ কোর্সের সূত্রপাত হয়। ঐদিন কলকাতার কিছু শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাবিষয়ক উপকরণাদির ও বইপত্রের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, বেশ কিছু বইপত্র, শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্র শিক্ষকদের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করেন।

ইতিমধ্যে অধ্যক্ষ গ্রিফিথ ১৫ নম্বর কলেজ স্কোয়ার-এ একটি দোতলা বাড়ির দ্বিতলে পাঁচটি ঘর কলেজের জন্য মনোনীত করেন। ঐ গৃহে পূর্বে অ্যালবার্ট কলেজ নামে একটি কলেজ চলত, অবশ্য সেই সময়ে ঐ কলেজটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু স্কুলের কিছু ক্লাস এখানে সে সময়ে হত। দুই বছরের লীজে ১৫ই জুন ১৯০৮ খ্রিঃ মাসিক ১০০ টাকা ভাড়ায় ঐ পাঁচটি ঘর নেওয়া হয়। শর্ত ছিল ঘরগুলির প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কলেজ কর্তৃপক্ষের। শ্রী গ্রিফিথ্ অতঃপর পূর্ব নির্দ্ধারিত দিনে বুধবার পয়লা জুলাই তারিখে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের ক্লাস শুরু করেন। ঐ একই দিনো শ্রী আর্মিস্টেড কাজে যোগ দেন। আর কলেজ গৃহের দায়িত্বে শ্রী ভবানী প্রকাশ সিংহ এবং করণিক ও গ্রন্থাগারিকের পদে শ্রী মন্মথনাথ মিত্র ৭ জুলাই কাজে যোগদান করেন। এরপর পাটনা ডিভিশনের বিদ্যালয় পরিদর্শকের কর্মভার থেকে অব্যহতি নিয়ে শ্রী থিকেট ১০ই জুলাই কলেজে যোগদান করেন। এখন অধ্যক্ষকে নিয়ে অধ্যাপকের সংখ্যা দাঁড়ায় তিন।

প্রথম বছর ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা না হওয়ায় বিদ্যার্থীরা নিজেরাই নিজেদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে নেন। অন্যদিকে মহাবিদ্যালয়ের স্থায়ী স্থান নির্বাচন বিষয়ক কমিটি ১৯০৮-এর ২১শে ফেব্রুয়ারি সমবেত হন এবং শিয়ালদহ সন্নিহিত একটি স্থান উপযুক্ত এবং শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিটে, ভবানীপুর অঞ্চলে একটি স্থানকে অধিক উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেন।

তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তা শ্রী এইচ্.আর জেমস্-কে চেয়ারম্যান করে একটি বোর্ড অব এগজামিনারস গঠন করা হয়, যাতে অন্যান্য সদস্যের মধ্যে ছিলেন শ্রী গ্রিফিথ, শ্রী থিকেট, শ্রী আর্মিস্টেড এবং ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়। এই ভাবে খুব স্বল্প পরিসরে এই মহাবিদ্যালয় তার কাজকর্মের সূচনা করে। কুড়ি জন বিদ্যার্থীর মধ্যে শিক্ষাবর্ষের শেষলগ্নে একজন গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। বাকি ১৯জনের ১৬ জন পরীক্ষায় বসেন এবং ১৪ জন কৃতকার্য হন। এদের মধ্যে চারজন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এঁরা হলেন যথাক্রমে সর্বশ্রী মনোরঞ্জন মিত্র, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, বিনয় ভূষণ সরকার এবং বনবিলাস রায়। দ্বিতীয় বর্ষে ১৮ জন সরকারি চাকুরের মধ্যে ১৩ জন ছিলেন সরকারি স্কুল শিক্ষক আর ৫ জন ছিলেন বিদ্যালয় পরিদর্শক। এঁদের মধ্যে তিনজন ছিলেন এম.এ.পাস, ১৫ জন বি.এ.পাস। ১৫ জন পরীক্ষায় কৃতকার্য হন, তার মধ্যে ৫ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। দ্বিতীয় বর্ষে মুজফফরপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ও রাচিঁ জিলা স্কুলের সহকারি শিক্ষক শ্রী বনবিলাস রায় অস্থায়ী অধ্যাপক হিসাবে কাজে যোগদান করেন।

এই শিক্ষাবর্ষে ১০ জন বিদ্যার্থীর উপযুক্ত একটি ছাত্রাবাসের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯ নম্বর হ্যারিসন রোডের একটি ভাড়া বাড়িতে। যার মাসিক ভাড়া ছিল১০০ টাকা। ইত্যবসরে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে এল.টি. ও বি.টি. উভয় কোর্স সহকারে স্থাপিত হয় ঢাকা ট্রেনিং কলেজ। ১৯১০-১১খ্রিস্টাব্দে মহাবিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষে ১৯ জন বিদ্যার্থী পাস করে বেরোয়। চতুর্থবর্ষে ১৯১১-১২ শ্রী এম.পি.ওয়েস্ট (অক্সফোর্ডের ছাত্র)

উপাধ্যক্ষ ও মেথড এর অধ্যাপক (নভেম্বর ১৯১২) হিসাবে কলেজে কাজে যোগদান করেন। চতুর্থ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রাবাসটি নূতন ঠিকানায় স্থানান্তরিত হয়। ঠিকানা হয় ২২ নম্বর হ্যারিসন রোড। মাসিক ৮০ টাকা ভাড়া। এখন থেকে সরকার স্বয়ং ছাত্রাবাসের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, এর আগে যা ছিল অধ্যক্ষের দায়িত্বে। ২০ জন বিদ্যার্থীর মধ্যে ১৮ জন এই শিক্ষাবর্ষে কৃতকার্য হন। শিক্ষাবর্ষের দ্বিতীয় বছর থেকেই বার্ষিক পুনর্মিলন উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই সময় সকালে একটি সভা বসানো হত, যে সভায় পুরাতন ছাত্র ও বর্তমান শিক্ষকমণ্ডলী নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসতেন এবং দ্বিতীয় সভাটি বসত দ্বিপ্রহরে। এই সভায় বর্তমান, প্রাক্তনী এবং শিক্ষক ও হিতৈষী ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়ে মহাবিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য আলাপ আলোচনা চালাতেন। এই সভায় অধ্যক্ষ তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরতেন কলেজের নিয়মিত কাজকর্ম ও ভবিষ্যতের নানাবিধ সম্ভাব্য কাজকর্মের খতিয়ান। সদ্যোজাত কলেজটি এই সময় বেড়ে উঠছিল অসীম যত্নে ও মমতায়। তদানীন্তন অধ্যক্ষের ভূমিকা ছিল ধাত্রী মাতার। ১৯১২ থেকে ১৯১৭ খ্রি. এই সময় পর্বে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ পরিকল্পনা রদ হয় ও বিহার এবং উড়িষ্যা পৃথক হয়ে যায়। ফলত পাটনা ট্রেনিং কলেজটি, যেটি এর আগে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেটি বাংলা প্রদেশের বাইরে চলে যায় ও ঢাকা ট্রেনিং কলেজটি বাংলা প্রদেশের মধ্যে আসে। পাটনা ট্রেনিং কলেজ-এ বিটি কোর্স না খোলা পর্যন্ত বিহারের জন্য ছটি আসন ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে সংরক্ষিত রাখা হয়। ডেভিড হেয়ারে ছিল ২৪ জন ছাত্র। এমত অবস্থায় কলেজের পরিসর ও অধ্যাপকদের সংখ্যা বৃদ্ধি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। অতএব অ্যালবার্ট হলের আরও দুটি ঘর ভাড়া নেওয়া হয়। যার একটি একজন উপাধ্যক্ষের জন্য বরাদ্দ করা হয়। ড্রইং মাস্টার পদে শ্রী পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ১৯১৩ খ্রিঃ ডিসেম্বরে কলেজে যোগদান করেন।

অন্যদিকে খোঁজ চলতে থাকে বৃহৎ পরিসরে স্থায়ী ঠিকানায় ডেভিড হেয়ার মহাবিদ্যালয়টিকে স্থানান্তরিত করার জন্য। অধ্যক্ষ গ্রিফিথ শহরের দক্ষিণ অংশে বালীগঞ্জ অঞ্চলে একটি এলাকা কলেজের স্থায়ী ভবনের জন্য নির্বাচন করেন।

কলেজ ভবন, ছাত্রাবাস, মডেল স্কুল এগুলি নিয়ে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজটিকে সুচারুরূপে প্রতিষ্ঠা করার মতো একটি সার্বিক পরিকল্পনা রচনা করে অধ্যক্ষ গ্রিফিথ ভূমি অধিগ্রহণের একটি প্রস্তাব ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ২রা আগষ্ট সরকার বাহাদুরের কাছে পেশ করেন। শিক্ষা অধিকর্তার সমর্থনে এই পরিকল্পনা ও প্রকল্প অনুসারে সরকারি মহলে কাজ এগোতে থাকে। জমিটি অধিগৃহীত হয়। ইতিমধ্যে কলেজে উপাধ্যক্ষ পদে শ্রী ওয়েষ্ট-এর স্থলাভিষিক্ত হন শ্রী এ. মারসার এবং শ্রী ওয়েষ্ট ঢাকা ট্রেনিং কলেজের উপাধ্যক্ষ হিসাবে কাজে ব্রতী হন। ১৯১৫ খিস্টাব্দের পয়লা আগষ্ট থেকে এক বছরের জন্য স্বাস্থ্যজনিত কারণে শ্রী গ্রিফিথ ছুটিতে যান। শ্রী স্টার্ক কলেজের দায়িত্ব ভারগ্রহণ করেন, যিনি এর আগে অতিরিক্ত শিক্ষা অধিকর্তার দায়িত্বে ছিলেন এবং অধ্যক্ষের দায়িত্ব ভার নেবার আগের মুহূর্তে শ্রীমারসার-এর জায়গায় কলেজের একজন অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এরপর শ্রীমারসার ইউরোপীয় স্কুলসমূহের পরিদর্শকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়ে নভেম্বর মাসে এসে কলেজের অধ্যক্ষের দারিত্বভার গ্রহণ করেন এবং ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন। এর মধ্যে শ্রী গ্রিফিথ ছুটি থেকে ফিরে এলেও কলেজের দায়িত্বের বদলে, তাঁকে বর্দ্ধমান ডিভিশনের বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শকের দায়িত্ব নিতে বলা হয়। অন্য দিকে শ্রীস্টার্ক্ ঢাকা ট্রেনিং কলেজে বদলি হয়ে যান। কলেজের অধ্যক্ষের পদে দায়িত্বভার সামলানোর দায়িত্ব নেন শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়।

এই সঙ্গে স্থির হয় যে বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাজের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগ্রিফিথ কলেজের নিয়ন্ত্রক ও তদারকের দায়িত্বও অতিরিক্তভাবে বহন করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন মোতাবেক এই সময় কলেজের

একটি গভর্নিং বডিও (পরিচালকসভা) গঠন করা হয়। ২৫শে আগস্ট ১৯১৫ খ্রি. ক্যালকাটা গেজেটে নথিভুক্ত ঐ গভর্নিং বডির গঠনটি ছিল নিম্নরূপ—

বাংলার সহকারী শিক্ষা অধিকর্তা—সহসভাপতি এবং সম্পাদক

বর্ধমান ডিভিশনের বিদ্যালয় পরিদর্শক—সদস্য

প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের বিদ্যালয় পরিদর্শক—সদস্য

অধ্যাপক ডক্টর ডি. এল. মল্লিক—সদস্য

এই পর্বে কলেজের বর্ধিত পরিসেবার মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রেখে চলবার প্রচেষ্টাটি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে অনুসৃত পাঠদান পদ্ধতির সঙ্গে ট্রেনিং কলেজের পদ্ধতির মধ্যে একটা তালমিল বজায় রাখা বা মেলবন্ধনের প্রচেষ্টা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ।

১৯১৫-১৬ খি. কলেজে আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ৩০ করা হয়। সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বা স্কুল পরিদর্শকের সংখ্যা এখন থেকে হ্রাস পাবার পরিপ্রেক্ষিতে অনুদান বা সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সদ্য গ্রাজুয়েট কর্মপ্রার্থী বিদ্যার্থীদের প্রতি কলেজ আগ্রহী হয়ে ওঠে। ১৯১৩-১৪ খ্রি. নাগাদ প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে দুজন মুসলিম বিদ্যার্থীও ট্রেনিং নেন। ১৯১৪-১৫ খ্রি. হায়দ্রাবাদ সরকারের জন্য ২টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়। ১৯১৮ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি সরকারি আদেশ বলে বি. টি. কোর্সের পাশাপাশি এল. টি. কোর্সও চালু করা হয়।

এই সুবাদে একজন অধ্যাপকের বাড়তি পদ সৃষ্টি হয়। এখন ৩০ জন বি.টি.আর ২০জন এল.টি.নিয়ে বিদ্যার্থী সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০। শ্রী গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত ১৯১৮ খ্রি.জুলাই মাসে কলেজে অধ্যাপক হিসাবে কাজে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন আর্মানিটোলা সরকারি স্কুলের সহকারি প্রধান শিক্ষক এবং ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের একজন প্রাক্তন ছাত্র। হেয়ার ও হিন্দু স্কুলের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলটিকেও এখন প্রাকটিক্যাল টিচিং-এর জন্য ব্যবহার করা হতে থাকে। ১৯১৮-১৯সাল নাগাদ সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে এই প্রথম কলেজে দাখিল হবার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্বলিত প্রস্পেক্টাস্ ছাপানো হয়। ঐ বছরেই গর্ভনিং বডিতেও সামান্য পরিবর্তন আনা হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষকে গভর্নিং বডির সভাপতি আর সহকারী শিক্ষা অধিকর্তাকে একজন সাধারণ সদস্য হিসাবে রাখা হয়। ১৯১৯ খ্রি. ঢাকা ট্রেনিং কলেজের শ্রী ইভান বিস্ (Evan Biss) অধ্যক্ষ হিসাবে কলেজে যোগ দেন ও শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সাধারণ অধ্যাপক হিসাবে থাকেন। ১৯১৯ খ্রি. জুলাই মাসে শ্রী বিস্ চলে যাওয়ার পর শ্রী চক্রবর্তী পুনরায় অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

১৯১৮-র মার্চে কলিকাতা বিশ্বাবিদ্যালয় কমিশন (স্যাডলার কমিশন) কলেজ পরিদর্শন করেন। এই কমিশনের রিপোর্টে (ক.বি.ক.) একটি পৃথক বৃহৎ শিক্ষা বিভাগের সুপারিশ করে। এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বিভাগের মুখ্য কেন্দ্র হিসাবে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের বালিগঞ্জে অবস্থানের প্রস্তাবের বিরোধিতাও এই ক.বি.ক রিপোর্টে স্থান পায়। ভবিষ্যতে বৃহত্তর ভূমিকা গ্রহণের প্রস্তাবে ও আশায় বালিগঞ্জের পরিসরটি ক্ষুদ্র বলে বিবেচিত হয়। ১৯২০ খ্রি.এই ক.বি.ক. রিপোর্টটি ভারত সরকার গ্রহণ করেন এবং প্রস্তাবিত শিক্ষাবিভাগের অধীনস্থ অনেকগুলি কলেজের একটি অন্যতম কলেজ হিসাবে ডেভিড হেয়ার প্রতিষ্ঠিত হবে এই আশায় ও প্রতিশ্রুতিতে ভবিষ্যতে বৃহদায়তন কর্মভার প্রাপ্ত ডেভিড হেয়ারের কথা বিবেচনা করে, শিক্ষা অধিকর্তা বালিগঞ্জ অঞ্চলের কলেজের জন্য অধিগৃহীত নির্দিষ্ট জমি আর দরকার নেই বলে সিদ্ধান্ত নেন। অনতিবিলম্বে অধিগৃহীত জমি রাজস্ব দপ্তরের কাছে হস্তান্তরিত হয়। অতঃপর ১৯১৮-১৯-এ কলেবর বৃদ্ধির আশায় থাকা কলেজে ২৬ জন বি.টি.ও ১৬ জন

এল.টি.বিদ্যার্থী অ্যাডমিশন নেন। পরবর্তী বছরগুলিতেও ৫০ টি আসন পূর্ণ না করেই শিক্ষাবর্ষ সমাপ্ত হয়। অন্যদিকে ১৯১৯-এর ৩০শে জুন অ্যালবার্ট ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ পুরাতন গৃহ ভেঙে নতুন গৃহ নির্মাণের কারণে কলেজকে উঠে যাবার নোটিশ দেয়। অনেক প্রচেষ্টার পর ৪৫ নম্বর বেনিয়াটোলা লেন হয় কলেজের নূতন ঠিকানা। বেনিয়াটোলা লেনের এই তিনতলা বাড়িটির সর্ব্বোচ্চতলের ৮টি ঘর নিয়ে ২৫ জন হিন্দু বিদ্যার্থীর জন্য ছাত্রাবাসটিও একই ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর বাকি অংশ কলেজের জন্য নির্দিষ্ট হয়। এই নতুন গৃহের মাসিক ভাড়া ধার্য হয় ৬৫০ টাকা।

১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসে শিক্ষা বিভাগে ভারতীয় মন্ত্রী হিসাবে শ্রী প্রভাস চন্দ্র মিত্র দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কয়েক মাসের মধ্যে তাঁর গোচরে আসে যে বালিগঞ্জ অঞ্চলে ডেভিড হেয়ারের জন্য অধিগৃহীত জমি রাজস্ব বিভাগে হস্তান্তরিত করে দেওয়া হয়েছে।

কালক্ষেপ না করে মন্ত্রী মহোদয় উদ্যোগী হন, যে উদ্দেশ্যে ঐ জমি অধিগৃহীত হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্যেই যাতে এখন ব্যবহার করা হয় তা সফল করার কাজে। অন্য দিকে রাজস্ব বিভাগ ইতিমধ্যে জমিখন্ডটি পুলিশ বিভাগকে হস্তান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল। উক্ত জমিটিতে একটি নূতন পুলিশ থানা ও কেন্দ্রীয় মোটর ভিহিকেলস অফিস প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই এই হস্তান্তর। মন্ত্রী মহাশয়ের সময়োচিত হস্তক্ষেপের ফলেই পুনরায় সমস্ত জমি খণ্ডটি শিক্ষা বিভাগের হাতে চলে আসে (১৯২২, মার্চ)। এতে সাময়িক আশার সঞ্চার হলেও শীঘ্রই আবার বিষাদের মেঘের সঞ্চার হল ১৯২২ সালের Bengal Retrenchment Committee-র রিপোর্টের মাধ্যমে। ট্রেনিং কলেজ সম্পর্কে তাদের পরামর্শ ছিল দুটি ট্রেনিং কলেজকে একটিতে রূপান্তরিত করা ভালো এবং সেটির সম্ভাব্য অবস্থান হোক ঢাকা। এমনকি এই প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও তার জন্য ব্যয় এ দুটি সঙ্গতিপূর্ণ কি না এ নিয়েও সন্দেহপ্রকাশ করা হয় ঐ রিপোর্টে। বলা হয় একজন শিক্ষকের মুখ্য যোগ্যতা তাঁর নিজস্ব শিক্ষার গুণমান। বহু শিক্ষকই নিজস্ব উৎকৃষ্ট শিক্ষা, সাধারণ জ্ঞান ও সহজাত প্রবৃত্তি/প্রকৃতি অনুসারেই অত্যন্ত গুণী শিক্ষক হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে থাকেন। এমত অবস্থায় যেখানে সাধারণ শিক্ষায় অধিক ব্যয় করা প্রয়োজন, সেখানে টেক্‌নিক্যাল ট্রেনিং-এ কতিপয় ব্যক্তিবর্গের জন্য, কোন্ প্রত্যাশায় অর্থ বরাদ্দ করা হবে মুখ্যত এটাই ছিল প্রশ্ন। কার্যত দুটির বদলে একটি কলেজ এ দাওয়াই থেকেও তাদের মোক্ষম দাওয়াই ছিল বস্তুত দুটি কলেজেরই বিলুপ্তি সাধন।

১৯২৩ খ্রিঃ জানুয়ারিতে এই রিট্রেঞ্চমেন্ট কমিটি রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর কার্যত এই কলেজ তার জন্মের পর সব থেকে কঠিন সময় ও সঙ্কটের মধ্যে গিয়ে পড়ে। কিন্তু আশার কথা ছিল এই যে, ডেমোক্লিসের খড়্গের মতোই এই প্রস্তাব কলেজের পঞ্চত্বপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে উদ্যত হতে দেখে, কলেজের বহু প্রাক্তনীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হতে দেখা গেল। আর তারা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা শুরু করলেন। প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রকাশ পেতে লাগল বহু লেখা। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত হল একটি সাধারণ জনসভা। শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী জি.হাউয়েলস্ এই সভার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ট্রেনিং কলেজের অবলুপ্তি সাধনের প্রস্তাবের তিনি তীব্র বিরোধিতা করেন। এমনকি ঢাকাতে দুটি কলেজের সংযুক্তিকরণের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাঁর প্রস্তাব ছিল সংযুক্তিকরণ যদি একান্তই হয়, তবে তা হবে কলকাতায়।

এরপর ১৯২৩ সালের মে মাসে ক্যালকাটা মিশনারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের প্রাক্তনীদের একটি দল দার্জিলিংএ শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন এবং এই সমস্যা বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী পরিপূর্ণভাবে অবগত ও সচেষ্ট এটা তারা উপলব্ধি করেন। শিক্ষামন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় বড়লাট লর্ড লিটন, রিট্রেঞ্চমেন্ট কমিটির সুপারিশ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেন। উপরন্তু ডেভিড

হেয়ার ট্রেনিং কলেজ তার নিজের গৃহ নির্মাণ করে যাতে আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সেই দিকেই উদ্যোগ গ্রহণের পক্ষে বড়লাটের সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। তবে যেহেতু পুলিশের কিছু জমি দরকার সেহেতু স্কুলের অংশের ১০ বিঘা জমির ৩½ বিঘা পুলিশ বিভাগকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কলেজের জন্য নির্দিষ্ট ৫½ বিঘা জমিতেই কলেজ হবে। আর ৩½ বিঘা জমিকে আগের মতোই কর্মী আবাসন হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়।

এই সঙ্গে শ্রী গ্রিফিথ-এর করা আগের কলেজগৃহ নির্মাণের পরিকল্পনায় কিছু পরিবর্তন এনে ১৯২৪-২৫ এর বাজেটে ১,৭৫০০০ টাকা কাজ শুরুর জন্য বরাদ্দ করা হয়। এই সময় পর্বে কলেজের অধ্যাপক হিসাবে আসেন শ্রীকুঞ্জ বিহারী হোড়, শ্রী নগেন্দ্রনাথ ঘোষ যিনি ইংল্যান্ড থেকে ফিজিক্যাল এডুকেশনের ট্রেনিং নিয়ে এসে সরকারের ফিজিক্যাল এডুকেশনের পরামর্শদাতা নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ১৯২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে কলেজে ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে কাজে যোগদান করেন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মধ্য দিয়ে ঢাকা ট্রেনিং কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধির থেকে বেরিয়ে যায় এবং ১৯২২-২৩ নাগাদ ঢাকা ট্রেনিং কলেজ নূতন আধুনিক পাঠ্যক্রম প্রচলন করে। এদিকে ১৯২৪ খ্রিঃ বালিগঞ্জে নতুন কলেজ গৃহ নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং আশা করা হয় যে ১৯২৫-এর অক্টোবর মাস নাগাদ কলেজগৃহটি নির্মিত হয়ে যাবে। আশানুরূপ ভাবে ১৯২৫-২৬-এর শিক্ষাবর্ষে পূজার ছুটির পর কলেজ এবং ছাত্রাবাস নূতন গৃহে স্থানান্তরিত হয়। এই স্থানান্তরের মধ্য দিয়ে বলতে পারা যায় যে এই ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের এক নবজন্ম ঘটে। সেই থেকে অদ্যাবধিকাল ২৫/৩ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড কলেজের স্থায়ী ঠিকানা হয়ে রয়েছে। যদিও মাঝের কিছু পর্বে সাময়িক ভাবে বিশ্বযুদ্ধের সঙ্কটকালীন সময়ে কলেজটিকে অন্যত্র উঠে যেতে হয়েছিল।

১৯২৭ খ্রিঃ জানুয়ারি মাসে কলেজ সংলগ্ন জমিতে ডেমনস্ট্রেশন স্কুলটি নির্মিত হবার আগে পর্যন্ত, হিন্দু স্কুলের একটি বড়ো ঘরে ডেমনস্ট্রেশন লেশন চলত। আর এখন কলেজ ও কলেজসংলগ্ন নূতন স্কুলটি, যুগপৎ ট্রেনিং কলেজের পাঠাদানের নিত্যনূতন পদ্ধতি ও কৌশল নিয়ে নূতন দিগন্ত উন্মোচনের ক্ষেত্রে এক প্রবল উদ্দীপনার সঞ্চার ঘটিয়ে এগিয়ে চলা শুরু করেছিল। এই সময় অন্যান্য আর যেসব স্কুলে প্র্যাকটিস টিচিং চলত সেগুলি হল যথাক্রমে ক্যাথিড্রাল মিশন স্কুল, সাউথ সাবার্বান স্কুল, ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশন, কালীঘাট হাইস্কুল এবং জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশন।

১৯২৫-২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে কলেজের ৬০টি আসনেই বিদ্যার্থীরা ভর্তি হতে থাকেন। প্রতিবছর আবেদনকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫০-র বেশি। তবে এল.টি কোর্সের চাহিদা কমতে থাকে। ১৯২৭-২৮ খ্রিঃ এল.টি. কোর্সটি সম্পূর্ণভাবে তুলে দেওয়া হয়। নূতন স্কেলে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্কুলগুলিতে এখন বিটি কোর্সটিকেই একমাত্র প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে বিবেচনার প্রতিশ্রুতিতেই এটা ঘটে। ১৯২৭ -এর তেসরা জানুয়ারি বাংলার গভর্নর লর্ড লিটন ৩৮/২ বেলতলা রোডে কলেজের নূতন ডেমনস্ট্রেশন স্কুল গৃহের উদ্বোধন করেন। স্বল্প কালের মধ্যেই নূতন স্কুলটি একটি ভালো স্কুলের খ্যাতি অর্জন করে। ১৯২৮-২৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই মডেল স্কুলটি বা ডেমনস্ট্রেশন স্কুলটির প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণার্থী-দের প্র্যাকটিক্যাল কাজকর্মের সুযোগ সুবিধা সাহসাই সহস্রগুণে বর্ধিত হয়।

ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ 'মডেল স্কুল' বা বালিগঞ্জ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রক বা কন্ট্রোলিং অফিসার পদে থাকার কারণে, দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্লাস রুটিন তৈরি সহ নানান প্রাতিষ্ঠানিক প্রশাসনিক কাজকর্ম, যথোপযুক্ত সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে চলা সম্ভবপর হয়েছিল। আর দুটি প্রতিষ্ঠানই এর ফলে সুনামের সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে নিজ নিজ দায়িত্ব ও ভূমিকা গৌরবের সঙ্গে পালন করতে সক্ষম হতে পেরেছিল।

এই সময় পর্বে কলেজে ভর্তি হতে গেলে সমস্ত যোগ্য প্রার্থীকেই একটি লিখিত পরীক্ষা ও একটি মৌখিক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নির্বাচিত হতে হত। এই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতেই স্টাইপেন্ড প্রাপক কারা হবে তাও স্থির করা হত। একমাত্র ৫ জন সরকারী শিক্ষক এই প্রক্রিয়ার বাইরে থাকতেন।

কলেজে শিক্ষাবর্ষের সূচনার দিনটিতে অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বিদ্যার্থীদের স্বাগত জানিয়ে ভাষণ দিতেন, যার মাধ্যমে তুলে ধরতেন কলেজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং কীভাবে বিদ্যার্থীরা কলেজের সুযোগ সুবিধাগুলি চূড়ান্ত এবং কার্যকরীভাবে কাজে লাগাতে পারবে তার হদিশ দিতেন।

১৯১৬ থেকে ১৯২৬ খ্রি. পর্যন্ত নানা সময়ে প্রয়োজনে অধ্যক্ষের কার্যভার পালন করবার পর অধ্যাপক চিন্তহরণ চক্রবর্তী ১৬ই এপ্রিল, ১৯২৮ খ্রি. অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর এই শূন্যপদে বিজ্ঞান বিষয়ক অধ্যাপক নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়। কারণ ১৯৩১ সাল থেকে বিজ্ঞান বিষয়টি বিদ্যালয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার লেকচারার শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী ১৯২৯ সালের জুলাই মাসে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন। কিন্তু তার আগে তিনি বি.টি. ট্রেনিং গ্রহণ করে নিজেকে ট্রেনিং কলেজের উপযুক্ত করে তোলেন। ইতিমধ্যে ১৯২৬ সাল থেকে পুনরায় অধ্যক্ষের পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্রী গ্রিফিথ ১৯২৯-৩০ সালে অবসর গ্রহণের বয়সে উপনীত হন। এমত অবস্থায় ঐ শিক্ষাবর্ষের সমাপ্তিকাল পর্যন্ত তাঁর কাজের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৩০ -এর ২৩শে এপ্রিল শ্রীগ্রিফিথ কলেজ ছেড়ে যান। ঢাকা ট্রেনিং কলেজের উপাধ্যক্ষ শ্রী মনোরঞ্জন মিত্র ১৩ই মে, ১৯৩০ -এ ডেভিড হেয়ারে অধ্যক্ষ হিসাবে কাজে যোগদান করেন।

ইতিমধ্যে ১৯৩০ খ্রিঃ থেকেই কলেজে ভর্তি হবার চাহিদা বাড়ে। তৎকালীন অধ্যক্ষ গভর্নিং-বডির অনুমোদনক্রমে শিক্ষা অধিকর্তার কাছে কলেজে আসন বৃদ্ধির দাবী জানান। উত্তরে অতিরিক্ত কোনো ব্যয় বৃদ্ধি না করার শর্তে বার্ষিক ৮০ জন বিদ্যার্থী ভর্তি করার অনুমতি/সম্মতি সরকারের তরফে পাওয়া যায়। যদিও ১৯৩২-৩৩ শিক্ষাবর্ষে ৬৯ জন ও ১৯৩৩-৩৪ শিক্ষাবর্ষে ৭২ জন পরীক্ষায় বসেন। এরপর ১৯৩৪-৩৫ শিক্ষাবর্ষে ৬০০ আবেদনকারীর মধ্যে প্রায় ১০০ জনকে ভর্তি করা হয়। তবুও দেখা যায় যে স্টাইপেন্ড প্রাপক নয় এমন স্টুডেন্টদের মধ্যে ১৫-১৬ জন, শিক্ষাবর্ষের নানা সময়ে আর্থিক অসুবিধার কারণ দর্শিয়ে কলেজ ছেড়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ কার্যত ৮০ জন বা তার কম সংখ্যক পরীক্ষার্থীই পরীক্ষায় বসছেন।

আবার নূতন বিপদবার্তা ঃ

১৯৩২ সালে গঠিত বেঙ্গল রিট্রেঞ্চমেন্ট কমিটি তাদের রিপোর্টে দ্বিতীয় বারের জন্য বাংলার দুটি ট্রেনিং কলেজের একটি বিলোপ সাধনের প্রস্তাব রাখে। অতঃপর দুটি কলেজের কাছেই এই রিপোর্টটি প্রেরণ করা হয়। আর তাদের বলা হয় যে ন্যূনতম খরচে কীভাবে তারা কলেজ চালাতে সক্ষম—তার পরিকল্পনাও প্রস্তাব তৈরি করতে। এই সঙ্গে সরকারি তরফে বর্তমান বরাদ্দ অর্থের অর্ধেক অর্থে কলেজ চালানো হলে দুটি কলেজকেই রাখা যেতে পারে, এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করা হয়।

এমত অবস্থায় কলেজের কিছু সদস্য শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন ও এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পরিত্রাণের আশ্বাস প্রার্থনা করেন। শ্রীমুখোপাধ্যায় দৃঢ়তার সঙ্গে এই ট্রেনিং কলেজ তুলে দেবার পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন এবং সরকারের পক্ষে এই কাজ বিশ্বাসভঙ্গের সামিল বলে বর্ণনা করেন। বস্তুত পক্ষে তিনি শুধুমাত্র এই কলেজ দুটি রক্ষা করার জন্যই নয়, তিনি আরও ট্রেনিং কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করেন। ট্রেনিং কলেজ উঠিয়ে দেবার বিরুদ্ধে প্রবল জনমত তৈরি হয়। শিক্ষা অধিকর্তার কাছে এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ডেপুটেশন জমা পড়ে। কলেজের প্রাক্তনীরা একটি জনসভার আয়োজন করেন, যেটি অ্যালবার্ট ইনস্টিটিউট হলে আহূত হয় এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের

সুযোগ সংকোচনের এই প্রচেষ্টার নিন্দা ও বিরোধিতা করা হয়। এমনকি তৎকালীন বিধানসভাতেও এই বিলুপ্তি প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয়। অবশেষে সরকার দুটি কলেজকেই রেখে দেবার স্বপক্ষে সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তাদের অর্থবরাদ্দ নির্মমতার সঙ্গে হ্রাস করে দেওয়া হয়। ১৯৩২ খ্রি. ২রা আগস্ট কলেজের পক্ষে একটি অতি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। অধ্যাপক বিনয়ভূষণ সরকার প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণদানরত অবস্থায় কলেজের ভবনে অচৈতন্য হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৯৩৪ খ্রি. কার্যকরী শিক্ষা অধিকর্তার পদ থেকে অব্যাহতি পেয়ে ২৭ শে নভেম্বর তারিখে কলেজের অধ্যক্ষের পদে কাজে যোগদান করলেন ডক্টর ডব্লু.এ.জেনকিনস্। মাত্র একবছর কাল শ্রী জেনকিনস্ অধ্যক্ষ হিসাবে ছিলেন, কিন্তু এই স্বল্প সময়কালে অনেকগুলি শিক্ষাগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ কলেজের উন্নয়নের স্বার্থে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। যথা রিট্রেঞ্চমেন্ট কমিটির সুপারিশমতো প্রফেসর পদ লেকচারার পদে অবনমিত করার বিরুদ্ধে তিনি মত প্রকাশ করেন। এক্সটেনশন লেকচারের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটান। ইনটেলিজেনস্ টেস্ট তৈরি করেন ও প্রশিক্ষণার্থীদের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রয়োগ করেন। ডেমনস্ট্রেশন স্কুলের সঙ্গে বিশেষভাবে ট্রেনিং কলেজের সম্পর্ক উন্নত রাখায় বিশেষ যত্নবান হন। কলেজে Current Events Board বসিয়ে তাতে বিদ্যার্থীদের কাগজের কাটিং এনে নিয়মিত লাগানোর ব্যাপারে উৎসাহিত করেন, যা সমসাময়িক সময়, সমাজ সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের সচেতনতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়। তাছাড়া ক্লাসে সাম্প্রতিক ঘটনাবলির উপর বির্তক করায় ছাত্রদের উৎসাহিত করেন। ক্লাসে ক্লাস চলাকালীন ইচ্ছুক ও আগ্রহী অভিভাবকদের পর্যবেক্ষণের সুবিধা করে দেন। এভাবে এমন বহু বিষয়ের প্রচলন ঘটান যা আজকের দিনেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ও প্রচলন করার দাবী রাখে। ২৮ শে নভেম্বব, ১৯৩৫ খ্রি. শ্রী জেন্‌কিনস্ পুনরায় শিক্ষা অধিকর্তার কাজে ফিরে যান এবং শ্রী গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত পুনরায় অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৩৫ খ্রি. ৭ই ডিসেম্বর তারিখে সহকারী শিক্ষা অধিকর্তা শ্রী অপূর্বকুমার চন্দ কলেজের অধ্যক্ষের পদে কাজে যোগদান করেন। এই অপূর্বকুমার চন্দ ছিলেন সমসাময়িক বাংলার এক খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব। জনশ্রুতি রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের 'অমিত রে' চরিত্রটি যে দু'জন রক্তমাংসের মানুষের আদলে গড়ে উঠেছিল, তারই একজন ছিলেন এই অপূর্বকুমার চন্দ; অপরজন ছিলেন স্বনামধন্য ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রী সুশোভন সরকার।

কলেজের আর একজন অধ্যাপক শ্রী কে.ডি.ঘোষ যিনি ১৯২৬ সালের জুলাই মাসে কলেজে যোগদান করেছিলেন, তিনি এই পর্বে বিদ্যালয় পরিদর্শন বিভাগে বদলি হয়ে যান। সেই জায়গায় শ্রী.এ.আর, আকুঞ্জি কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৩৭ সালের ২২শে জানুয়ারি শ্রী অপূর্ব কুমার চন্দ কেন্দ্রীয় আইনসভায় মনোনীত সদস্য হিসাবে যোগ দেওয়ার জন্য কলেজ ছেড়ে যান। শ্রী জে.এম.সেন কলেজের অধ্যক্ষের পদে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

১৯৩২-৩৭ এই সময়পর্বে ২৭৪ জন বিদ্যার্থী বি.টি.পাস করেন। ২১৫ জন ছিলেন ধর্মে হিন্দু, ৫১জন মুসলমান এবং ৮জন খ্রিস্টান।

১৯৩৬ সালের গ্রীষ্মাবকাশে কলেজের তরফে সরকারি বিদ্যালয় এর বিজ্ঞান শিক্ষকদের জন্য একটি রিফ্রেশার কোর্সের আয়োজন করা হয়। এই কোর্সে ৪০জন শিক্ষক সাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৩৯-৪০ খ্রি. কলেজের এক কৃতী প্রাক্তন ছাত্র শ্রী নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, কলেজের অধ্যাপক হিসাবে কাজে যোগদান করেন। নানা সময়ে শ্রী অপূর্বকুমার চন্দের সাময়িক অনুপস্থিতিতে কলেজের দায়িত্বভার সামলানোর কাজে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন শ্রী জি.দাশগুপ্ত, শ্রী পি.ডি.শাস্ত্রী, শ্রী এস.সি.চক্রবর্তী প্রমুখ।

অধ্যাপক দাশগুপ্ত অবসর নিয়ে ১৯৩৭-এর অক্টোবর মাসে বরোদায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন। দীর্ঘ ১৯ বছরব্যাপী এই কলেজে যোগ্যতার সঙ্গে অধ্যাপনার পর, শ্রী দাশগুপ্তের

অবসর কলেজের শিক্ষা পরিবেশে এক বিরাট শূন্যতার যে সৃষ্টি করেছিল, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ ছিল না। শ্রী এম. এম.সুফিয়ান এই কলেজের একজন প্রাক্তনী অতঃপর ঐ শূন্য পদে কাজে যোগদান করেন।

কলেজের শিক্ষক সংখ্যা বরাবরই প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল। শ্রী অপূর্বকুমার চন্দ, অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিয়েই এটা লক্ষ্য করেন এবং এবিষয়ে কর্তৃপক্ষের বহুবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এমনকি ছাত্র অনুপাতে কলেজের স্থানও যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু বিশেষ কাজ হয়নি। প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। এমত অবস্থায় ১৯৩৮-৩৯ খ্রি. তৎকালীন অধ্যক্ষ তাঁর বার্ষিক রিপোর্টে প্রাদেশিক সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণের কথা তোলেন। অবশেষে সরকারি উদাসীনতায় অনন্যোপায় মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষা অধিকর্তার সম্মতিসাপেক্ষে ১৯৪০-৪১ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রসংখ্যা কমিয়ে ৬০ জন করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সঙ্গে বি.টি. কোর্সেরও সংস্কার করা হয় এবং ঐ শিক্ষাবর্ষেই নূতন বি.টি.কোর্সের সূচনা করা হয়। ১৯৪০-৪২ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিজ্ঞানবিষয়ক পঠন পাঠনের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজ ও ইসলামিয়া কলেজের সহায়তা গ্রহণ করা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগে, কলেজের ভূগোল বিভাগের পঠনপাঠনের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়। একটি শিক্ষাবর্ষে ছাত্রপিছু সরকারি তরফে এই খাতে বিশ্ববিদ্যালয়কে ২৫ টাকা দেওয়া হত। ইতিমধ্যে অধ্যক্ষ হিসাবে শ্রী অপূর্ব কুমার চন্দের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৯৩৯-৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে কার্যকর ধরে ৫০ শতাংশ হারে কলেজের খাতে সরকারি বরাদ্দ বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভবপর হয়।

বিটি কোর্সের সংস্কার সাধনের কাজেও শ্রী অপূর্বকুমার চন্দের অবদান ছিল সর্বাধিক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক এ.এন.বসুর সহায়তাক্রমে মূলত শ্রী চন্দের উদ্যোগেই বিটি কোর্সের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। ১৯৪১ খ্রি. ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রী সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে কার্যভার বুঝিয়ে শ্রী চন্দ শিক্ষকদের জন্য আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি সম্পর্কের বক্তা হিসাবে স্পেশাল অফিসার পদে International Affairs lectures and study center-এ কাজে যোগদান করেন। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে যুদ্ধে জাপানের অংশগ্রহণের সময় এই স্টাডি সেন্টারটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যুদ্ধভীতি ঘনীভূত হয়। নানা দিকে স্কুল কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হতে থাকে। কলিকাতাকে একটি সমর কেন্দ্র (War Base) হিসাবে গণ্য করার ফলে একাধিক ভবনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বালিগঞ্জ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আপৎকালীন প্রয়োজনে মোটরভিকেলস্ দপ্তরটি সম্প্রসারিত করা হয়। ১৯৪২ সালের ৭ই এপ্রিল তারিখে রায়বাহাদুর কে.সি.রায় অধ্যক্ষ হিসাবে কলেজে যোগদান করেন। কিন্তু একমাসের আগেই অবসরের প্রস্তুতি হিসাবে তিনি কলেজ পরিত্যাগ করেন। ১৯৪১-৪২ বর্ষে কলেজ কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। সুরক্ষা প্রাচীর গড়ার বিলম্বজনিত কারণেই এটা ঘটে। ৫৮ জন ছাত্রের মধ্যে ৪৪ জন পরীক্ষায় বসেন। পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের জন্য মাত্র ১০০টি দরখাস্ত পড়ে, তার মধ্যে প্রাথমিক ভাবে ৫০ জনকে বাছাই করা হয়। ১৯৪২-এর জুনের মাঝামাঝি লেডি ব্রাবোর্ন কলেজটি সাময়িক প্রয়োজনে অধিগ্রহণ করা হয়। এই পরিস্থিতিতে ডেভিড হেয়ারে সরকারি আদেশ আসে যে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে যেন কোনো ছাত্র ভর্তি না করা হয়। এরপর খবর আসে লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ, ডেভিড হেয়ার কলেজ প্রাঙ্গণ দখল করে নিতে পারে। আগস্টের প্রথম সপ্তাহেই এই অধিগ্রহণ কর্ম শুরু হয়ে যায়।

এই পরিস্থিতিতে কলেজে ভর্তির জন্য আবেদনকারীদের প্রবেশাধিকার প্রাপ্তির আবেদনপত্রগুলি কিছু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিভাগে, কিছু ঢাকা ট্রেনিং কলেজে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

অধ্যাপক সহ বহু শিক্ষাকর্মীকে অতঃপর নানা দপ্তরে বদলি করে দেওয়া হয়। সহসাই ১৯৪২-এ এসে কলেজটি যেন থমকে দাঁড়ায়। সহকারী শিক্ষা অধিকর্তা খান বাহাদুর এফ. আহমেদ ১৯৪৩ খ্রি. এস. সি. চক্রবর্তীর কাছ থেকে অধ্যক্ষ হিসাবে কলেজের দায়ভার গ্রহণ করেন। সে দায়িত্ব যেন শুধুমাত্র প্রহরার আর দিন গোনার, কোন্ সুদিনে কলেজের বন্ধ দুয়ার আবার খুলবে। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে শিক্ষা অধিকর্তা ডক্টর জেনকিনস্, শ্রী এস. সি. চক্রবর্তীকে বলেন যে তিনি যেন কলিকাতার বাইরে কোথাও ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের জন্য একটি উপযুক্ত স্থান সন্ধান করেন। অল্প সন্ধানের পরই প্রার্থিত স্থান পাওয়া সম্ভব হয়। ছাত্র সংখ্যার হ্রাস ঘটার কারণে গৃহের অনেকটাই সে সময়ে ফাঁকা যাচ্ছিল। হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলকে ডেমনস্ট্রেশন স্কুল হিসাবে নিয়ে, হুগলি ট্রেনিং স্কুলে কলেজ পুনরায় খোলার ব্যবস্থা করা হয়। শ্রী চক্রবর্তী সিভিল সাপ্লাই দপ্তর থেকে আবার কলেজে ফিরে আসেন এবং খান বাহাদুর এফ. আহমেদ-এর কাছ থেকে ৫ই জুন ১৯৪৪ খ্রি. কলেজের কার্যভার গ্রহণ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, হুগলি ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী সি সি নন্দীর বিশেষ-সহায়তাক্রমে হুগলিতে পুনরায় ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ অবশেষে খোলা সম্ভবপর হয়েছিল।

অতঃপর স্থির হল ৪০ জন আবাসিক ছাত্র ও ৩০ জন সাধারণ ছাত্র নিয়ে কলেজ চালানো হবে। পুরোনো অধ্যাপকদের মধ্যে এ. আর. আকুঞ্জী, শ্রী এম. এম. সুফিয়ান, শ্রী এ. কে. সরকার এবং শ্রী এনসি ভট্টাচার্য, শ্রী বি.বি. ভট্টাচার্য-সকলেই একে একে কলেজে যোগদান করেন। হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী পি. সি. গাঙ্গুলি প্র্যাকটিস্ টিচিং পর্বে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কলেজের নতুন করে খোলার দিনটি ছিল এই আগস্ট, ১৯৪৪ খ্রি. ৪৮ জন ছাত্র নিয়ে সূচনা হয়েছিল ঐ শিক্ষাবর্ষের। ১৯৪৬ সালে ঢাকা ট্রেনিং কলেজের শ্রী কে ডি ঘোষ এলেন ডেভিড হেয়ারে অধ্যক্ষ হয়ে আর শ্রী এস. সি. চক্রবর্তী গেলেন ঢাকা ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষের পদে। অন্য দিকে যুদ্ধের অবসানে আমেরিকান সামরিক বাহিনী লেডি ব্রাবোর্ন-এর কলেজগৃহ পরিত্যাগ করে গেলে ১৯৪৬-এর জুন মাসে ঐ কলেজটি ডেভিড-হেয়ার ট্রেনিং কলেজ প্রাঙ্গণ ছেড়ে গেলে, ডেভিড হেয়ার কলেজও তার পুরাতন জায়গায় পুনর্বহাল হয়। যদিও ডেমনস্ট্রেশন স্কুলটি তখনও পুলিশের হেফাজত মুক্ত হয়নি। বকুলবাগান অঞ্চলে একটি অতি প্রতিকূল পরিবেশে স্কুলটি তখন টিকে ছিল মাত্র। এমত অবস্থায় পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে জুলাই মাস থেকে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজকেও প্র্যাকটিস্ টিচিং, ডেমনস্ট্রেশন লেসন এসব সংগঠিত করতে বিশেষ অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছিল।

এক নূতন দিগন্ত ঃ

এই পর্বে এসে আর একটি নূতন ঘটনা ঘটেছিল, যেটি হল কলেজে মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর প্রবেশ। পুরুষ প্রার্থী সংখ্যা ঐ সময়ে যখন হ্রাসের দিকে ছিল, তখন ক্রমান্বয়ে মহিলাদের সংখ্যা বাড়ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিভাগ, লোরেটো হাউস ও স্কটিশ চার্চ কলেজ, সে চাপ সামাল দিতে পারছিল না, এমত অবস্থায় গ্রাজুয়েট মেয়েদের মধ্যে প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কলকাতা ও ঢাকায় দুটি ট্রেনিং কলেজেই মহিলা প্রার্থীদের প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করা হয়। সুতরাং ৭ নম্বর হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিটে মহিলাদের জন্য হস্টেলের ব্যবস্থা করে। ৬০ জন ছাত্র ও ২০ জন ছাত্রী নিয়ে ১৯৪৬-এর শিক্ষাবর্ষে পুরাতন বাড়িতে ডেভিড হেয়ার কলেজ এক নবকলেবরে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই উপলক্ষ্যে ২৬ নম্বর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িটিও কলেজের জন্য ব্যবহার করা শুরু হয়। তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তা শ্রী অপূর্বকুমার চন্দ এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

অন্যদিকে শ্রী কে. ডি. ঘোষের প্রচেষ্টায় কলেজের ডেমনস্ট্রেশন স্কুলটিরও পুরাতন স্থানে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ উদ্যোগ চলতে থাকে এবং অবশেষে তা সফলও হয়। ১৯৪৭ সালের বিটি

পরীক্ষায় ৫২ জন পুরুষ ও ১৬ জন মহিলা প্রশিক্ষাণার্থী বসেন। ১৯১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের পর বন্ধ হয়ে যাওয়া কলেজের পুনর্মিলন উৎসবটিও এই পর্বে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। ১৯৪৭-এর ৮ই ও ৯ই মার্চ তারিখে এই পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আর এই বছর কলেজ ও জাতীয় জীবনে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতার পুণ্য প্রভাত আসে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য শ্রী পি. এন ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে কলেজে এই স্বাধীনতা দিবসটি যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়।

স্বাধীনতা উত্তরকালে কলেজের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে বিশেষ অপ্রতিহত গতিতে। জাতীয় সরকার বিশেষ মর্যাদাসহকারে এই কলেজটির বিকাশে সর্বতোরকম সহায়তা প্রদান করেন। ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাস থেকে এই কলেজে শিক্ষায় এম. এ. ও এম. এস. সি. ক্লাস শুরু হয়। ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে দি ব্যুরো অব্ এডুকেশনাল অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল রিসার্চ তার কাজ শুরু করে। ১৯৫৬ ফেব্রুয়ারিতে এক্সটেনশন সার্ভিস ডিপার্টমেন্টটি খোলা হয়। ১৯৫৭-র এপ্রিলে খোলা হয় ভোকাবুলারি রিসার্চ ইউনিট-টি।

ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অঙ্গচ্ছেদ ঃ ১৯৫৪-৫৫ সাল থেকে আসন সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৪০ জন। তবে ১৯৫৩-৫৪ সালের শিক্ষাবর্ষের শেষ পর্বে কলেজের মহিলা বিভাগটি পৃথক করে মহিলাদের জন্য একটি ট্রেনিং কলেজের জন্ম দেওয়া হয়। ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজটি আবার কেবলমাত্র পুরুষদের কলেজ-এ রূপান্তরিত হয়। আজকে শতবর্ষে পদার্পণ করে মনে হয় সময় এসেছে পুনরায় এই কলেজটি মহিলা পুরুষ সকলের জন্যই উন্মুক্ত করবার।

নূতন মহিলা কলেজ—'ইনস্টিটিউট অব্ এডুকেশন ফর উইমেন' এই নামে আলিপুর হেস্টিংস হাউসে ১৯৫৪ খ্রি. পয়লা জুলাই থেকে এই মহাবিদ্যালয়ের মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র কলেজ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই কলেজের অধ্যক্ষ হন মহিলা বিভাগের উপাধ্যক্ষ শ্রীমতী নলিনী দাশ। এই কলেজের আসন সংখ্যা রাখা হয় একশত। ডেভিড হেয়ারের সমস্ত মহিলা শিক্ষককে ঐ নূতন কলেজে বদলি করা হয়। এই বছরেই হুগলি গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ-এরও সূচনা হয়। ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ থেকে শ্রী এ. কে. সরকার অধ্যক্ষ হিসাবে এবং অপর দুইজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর শ্রী বি. বি. ভট্টাচার্য এবং শ্রী এন. বি. দাশগুপ্ত হুগলি ট্রেনিং কলেজে কাজে যোগদান করেন।

The Bureau of Psychological and Educational Research (দি ব্যুরো অব্ সাইকোলজিক্যাল অ্যান্ড এডকেশনাল রিসার্চ) ইউনিট-টি ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে ১৯৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষে একটি সর্বক্ষণের বিভাগ হিসাবে কাজ করতে শুরু করে। এই উপলক্ষ্যে একজন সহকারি অধ্যাপক, একজন লেক্চারার ও চারজন রিসার্চ স্কলার পদের সৃষ্টি করা হয়। এই রিসার্চ স্কলার চারজনের মধ্যে দুটি পদে দুইজন মহিলা ও অপর দুটি পদে দুই জন পুরুষ নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত হয়।

স্বাধীনতার সময়ে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপক ছিলেন শ্রী কে. ডি ঘোষ, অধ্যক্ষ, শ্রী আবদুর রেজ্জাক আকুঞ্জী, শ্রী মিয়া মহম্মদ সুফিয়ান, শ্রী এ. মোক্তাদার, শ্রী নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রী বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য, শ্রী সফিকুল আমিন, শ্রীমতী সুনীলা গুহ প্রমুখ। মুসলিম অধ্যাপকদের মধ্যে অনেকে পাকিস্তান যাবার সিদ্ধান্ত নিলে সেই সব শূন্যপদে নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হন যথা শ্রী হেমচন্দ্র ব্যানার্জী, শ্রী অশোক কুমার সরকার, শ্রী সত্যানন্দ প্রামাণিক, শ্রী মানিকলাল ব্যানার্জী এদের মধ্যে অনেকেই আবার পূর্ববঙ্গ থেকে চলে এসেছিলেন। শ্রী সমরেন্দ্রনাথ গুহ কলেজে ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর পদে কাজে যোগ দেন। শ্রীমতী মনোরমা বসু ইংল্যান্ড থেকে ফিরে ১৯৪৮ সালের ২রা জানুয়ারি থেকে কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। শ্রীমতী মনোরমা বসু এডুকেশন ডাইরেকটরেট্-এ

বদলি হয়ে যাবার পর শ্রী এস. কে দত্ত ১৯৪৮-এর ডিসেম্বর মাসে কলেজে অধ্যাপক হিসাবে কাজে যোগ দেন। শ্রী ডি. এন. রায় ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের পূর্বতন কর্মী ১৯৪৮ সালেই অধ্যাপক হিসাবে কলেজে যোগ দেন। ঢাকা থেকে শ্রী এস. পি. মুখার্জী বিজ্ঞানের লেকচারার হিসাবে কলেজে যোগ দেন। ভূগোলের অধ্যাপক হিসাবে আসেন শ্রী লোকেশ চন্দ্র চক্রবর্তী। সাইকোলজির অধ্যাপক হিসাবে কলেজে আসেন শ্রী জে. পি. মিত্র। অসেন শ্রীমতী শকুন্তলা কঙ্কন মিত্র। পণ্ডিত ভুবনেশ্বর মিশ্র পূর্ণ সময়ের হিন্দি টিচার হিসাবে কলেজে যোগ দেন। বালিগঞ্জ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রী নলিনীভূষণ দাশগুপ্তের ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে পদোন্নতি ঘটে। ১৯৪৮-৪৯-এ দুটি পোষ্ট গ্রাজুয়েট বেসিক ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। একটি পুরুষদের জন্য অন্যটি মহিলাদের জন্য। প্রথমটি ছিল বাইগাছিতে; পরবর্তী সময়ে যার নাম রাখা হয় বাণীপুর। দ্বিতীয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় হেস্টিংস হাউস, আলিপুরে। পরবর্তী সময়ে সেকেন্ডারি স্কুলের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের যোগান নিশ্চিত করবার জন্য মহিলাদের বেসিক ট্রেনিং কলেজটি বাণীপুরের পুরুষদের কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। দু'জন ছাড়া বাকী শিক্ষকদের ডেভিড হেয়ারে বদলি করে দেওয়া হয় (১৯৫১)। অতঃপর কলেজে দুটি বিভাগ, মহিলা ও পুরুষ বিভাগ যুগপৎ সাবলীলভাবে চালু থাকে। বেথুন কলেজ থেকে শ্রীমতী লতিকা ঘোষ এই কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। ১৯৫২ সালে কলেজের একজন প্রাক্তন ছাত্র শ্রী দিবাকর দাস মহান্ত কলেজে লেকচারার পদে যোগদান করেন। শ্রী কে. ডি. ঘোষ দার্জিলিঙ সরকারি কলেজে বদলি হয়ে যান ৮ই এপ্রিল ১৯৫৩ সালে। শ্রী ডি. এন. ঘোষ উপাধ্যক্ষ হিসেবে ১৯৫৩-র ২৫ আগষ্ট কলেজের কার্যভার গ্রহণ করেন। এই সময়ে কলেজের বিদ্যার্থী সংখ্যা পুরুষ বিভাগে ২৫০ জন আর মহিলা বিভাগে ১০০ জন। কিছু ক্লাস হত কলেজের প্রধান ভবনে, কিছু আলিপুর হেস্টিংস হাউসে আর কিছু ক্লাস হত ২৯/১ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের অন্য একটি ভাড়া বাড়িতে। ১৯৫৮ সালে কলেজের বর্ধিত অংশ নির্মাণের পর ঐ বাড়ি ছেড়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে ১৯৫৪ থেকে মহিলা বিভাগটিও একটি স্বতন্ত্র কলেজ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৫১ থেকেই কলেজের পুরাতন ছাত্রাবাসটিকে সংস্কার ও বর্ধিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে ৬ নম্বর সানি পার্ক-এ একটি বাড়ি ঠিক করা হয়। ১৯৫৩-র আগস্ট মাস থেকে কলেজ হোস্টেল সংস্কার সাধনের কাজ শুরু হয়। ১৮ নভেম্বর তারিখে অধ্যাপক কুলদাপ্রসাদ চৌধুরী, শান্তিনিকেতনের বিনয় ভবনের অধ্যক্ষ পদ ছেড়ে ব্যুরো অব এডুকেশনাল অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল রিসার্চ-এ প্রফেসর পদে যোগদান করেন। ১লা মে ১৯৫৮ সালে কর্মী আবাসন ও অধ্যক্ষের বাসগৃহ নির্মিত হয়ে যায়। পয়লা জুলাই ১৯৫৮ তে নূতন ছাত্রাবাসটিরও নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়।

১৯৪৭-৪৮ খ্রিঃ বহিরাগত ফ্রেশার স্টুডেন্টদের মোট ২০ জনকে প্রদেয় স্টাইপেন্ড ২০ টাকার বদলে বাড়িয়ে ৫০ টাকা করা হয়, এই সঙ্গে প্রাপকের সংখ্যা বাড়িয়ে ৩০ জনে উন্নীত করা হয়। আর ১৯৫০-৫১ খ্রি. এই জেনারেল স্টাইপেন্ড প্রাপকদের সংখ্যা বাড়িয়ে ৪৪ করা হয়। এই সঙ্গে ডেপুটেড টিচারদের ভাতা প্রাপকদের সংখ্যাও (৩৬) বাড়ানো হয়। ১৯৫২-৫৩ সালে স্টাইপেন্ড প্রাপকের সংখ্যা ৫৫ আর ডেপুটেশন ভাতা প্রাপকের সংখ্যা ৪৫ জন করা হয়। ১৯৪৭-৪৮ সাল পর্যন্ত একটি সেকশন হিসাবেই ছাত্রদের পাঠদান করা চলছিল। কিন্তু ছাত্রছাত্রী সংখ্যার বৃদ্ধিবশত (১২৪) ১৯৪৭-৪৮ সালে দুটি সেক্শনে তাদের ভাগ করে পঠন পাঠনের কাজ শুরু করা হয়। প্রথম বারের জন্য একটি কলেজ জার্নাল 'এডুকেশন টুডে' ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংখ্যাটি আত্মপ্রকাশ করে ১৯৫২-৫৩ শিক্ষাবর্ষে। সেই থেকে অদ্যাবধি এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়ে আসছে।

১৯৫৫ সালে মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় সমূহের অধ্যক্ষ সম্মেলনে ডেভিড হেয়ার

ট্রেনিং কলেজকে বেছে নেওয়া হয় বৃহত্তর সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ বর্ধিত পরিসেবা প্রদানের কেন্দ্র হিসাবে। সেই থেকে Extention Service প্রদান এই কলেজের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের সঙ্গে অতিরিক্তভাবে সেকেন্ডারি টিচার্সদের জন্য রিফ্রেশার কোর্স, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, আয়োজন করার মধ্য দিয়ে এই পরিসেবার কাজ চলতে থাকে।

১৯৫৬ সালে ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষদের নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করে টিচার্স ট্রেনিং কোর্সের প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য। ডেভিড হেয়ারের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রী ডি এন. রায় ঐ কমিটির সদস্য হিসাবে কাজ করেন। ১৯৫৭ সালের মে মাসে ব্যাঙ্গালোর-এ একটি সম্মেলনে এ বিষয়ে আলাদা আলোচনা চালানো হয়। এরপর ১৯৫৭ সালে চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরি করে, এবার তা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং ট্রেনিং কলেজে ও এই সঙ্গে প্রাদেশিক শিক্ষাসংক্রান্ত মন্ত্রকের সচিবালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উক্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে বি.টি. কোর্সের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ১০ জন ছাত্র পিছু একজন শিক্ষক এই অনুপাত স্বীকৃতি পায়। যদিও ডেভিড হেয়ারে ঐ সময়ের শিক্ষক সংখ্যা যা ছিল তাতে অনুপাত ছিল কার্যত ১ জন শিক্ষক পিছু ২০ জন ছাত্র। তৎকালীন ছাত্র সংখ্যা ছিল ২৪০ জন। কেবল সিলেবাস পাল্টালেই উন্নত পঠনপাঠনের মান অর্জন করা যায় না। এরজন্য অবশ্যই উপযুক্তসংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী প্রয়োজন। ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ এক্ষেত্রে বরাবরই স্বল্পসংখ্যক শিক্ষকসমস্যায় পীড়িত। তা সত্ত্বেও প্রচেষ্টার বিরাম নেই যে কীভাবে কলেজ, শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি প্রথম সারির কলেজ হিসাবে নিজের স্থান ধরে রাখতে পারে। ১৯৫৮-৫৯ শিক্ষাবর্ষে এই কলেজ তার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করেছে। যে সময়ের এক সোনালি ফসল 'Golden Jubilee Souvenir Volume' যেখানে এই কলেজের জন্মকথা থেকে তার বহু প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাত্রার তথ্যনিষ্ঠ মনোরম বর্ণনা নথিভুক্ত করা আছে, শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তীর কলমে। যা আজও আমাদের প্রেরণা জুগিয়ে চলেছে নিরন্তর সামনের দিকে এগিয়ে চলার। ১৯৬৮ সালে এই কলেজ তার হীরক জয়ন্তী বর্ষও উদ্‌যাপন করে, আজ ২০০৭-২০০৮ শিক্ষাবর্ষে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি শতবর্ষ উদ্‌যাপনের দুয়ার প্রান্তে। যখন অতীতের দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে আমরা বর্তমান সময়ের অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীরা নিদ্বির্ধায় বলতে পারি, সার্থক এই কলেজের জন্ম, সার্থক এই কলেজের শতবর্ষের পথ চলা। আজও এই কলেজ শিক্ষাক্ষেত্রে তার নিজস্বতার স্বাক্ষর রেখে এগিয়ে চলেছে বহু প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে। আশা করতে পারা যায় আগামীতেও এই পথচলা ও উত্তরণ শেষ হবে না। দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বহু সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন নিয়ে এসেছে, নিশ্চিত ভাবে ট্রেনিং কলেজও এর বাইরে থাকতে পারেনি। অনেকের কাছেই শিক্ষক প্রশিক্ষণ একটি অর্থহীন ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে। হয়তো এ ধরনের মূল্যায়নের একটা দায় শেষ পর্যন্ত ট্রেনিং কলেজের শিক্ষকদের উপরেও এসে বর্তায়, তবু শেষ প্রস্তাবে বলার কথা এটাই যে শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিলুপ্তি সাধনে নয় বরং যুগের উপযোগী প্রাসঙ্গিক শিক্ষা দানের মধ্য দিয়েই বোধ হয় শিক্ষা ও শিক্ষকতার উন্নয়ন সম্ভব। আর ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ দক্ষতা ও পারদর্শিতার সঙ্গে সেটা করে দেখাতেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রী ডি. এন. রায় অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর তিনি ব্যুরো অব্ এডুকেশনাল অ্যাণ্ড সাইকোলজিক্যাল রিসার্চ-এ প্রফেসর হিসাবে পুনর্নিয়োগ পান। নতুন অধ্যক্ষ হিসাবে এলেন শ্রী জে. সি. দাশগুপ্ত। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর তারিখে তিনি অধ্যক্ষ হিসাবে তাঁর কার্যভার গ্রহণ করলেন। চাইল্ড গাইডেন্স-এর উপর একটি বিশেষ কোর্স সমাপ্ত করে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব্ এডুকেশন থেকে ফিরে এলেন শ্রী কে. পি. চৌধুরী। ঐ একই বছরের এপ্রিল মাসে কলেজে কাজে যোগদান করেছিলেন শ্রী মদনমোহন ঘোষ।

এই সঙ্গে ১৯৫৭ সালে যে ভোকাবুলারি রিসার্চ ইউনিট-টি খোলা হয়েছিল সেটি তার কার্যকালের মেয়াদ শেষ করে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে বন্ধ হয়ে যায়। এটি যেমন একটি দুঃখজনক ঘটনা ছিল, তেমনই একটি আনন্দের ঘটনাও এই বছরে ঘটেছিল তা হল প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী শ্রী নিমাই চাঁদ বড়াল আমাদের কলেজের সঙ্গীত প্রতিভাবৃন্দকে সঙ্গীতের পাঠদানে সম্মত হয়েছিলেন। তখন তিনটি নূতন ট্রেনিং কলেজ থাকা সত্ত্বেও ডেভিড হেয়ারের উপর থেকে চাপ কমার কোনো লক্ষণ ছিল না। প্রবেশাধিকার প্রার্থনা করে ১৯৫৯-৬০ শিক্ষাবর্ষে ৮০৬ জন আবেদন করেন, বিগত বছরে যা ছিল ৭৮৩ জন। ২৪০ জনকে নেওয়া হয়। যার মধ্যে ১৬৫ জন ছিলেন স্কুল শিক্ষক (Aided School-র মাস্টারমশাই)। আর তিরিশ জন ছিলেন un-aided School-এর শিক্ষক। আর ছিলেন ৪ জন স্পেশাল ক্যাডার (cadre) টিচার ও ৪ জন সরকারী স্কুল শিক্ষক। ফ্রেশার বা বহিরাগত (outsider) ছাত্র মাত্র ৩৪ জন। এই বছরেই কলেজে মহা সমারোহে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস-এর জন্ম শতবর্ষ পালন করা হয়। ১৮ই জানুয়ারী ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের রাশিয়ার একদল শিক্ষাবিদ কলেজ পরিদর্শন করেন। ১৯৬৩-৬৪ শিক্ষাবর্ষ ছিল ছাত্র ভর্ত্তির ক্ষেত্রে একটি বেনজির বছর। ১৯০২ জন এ বছর ভর্ত্তির আবেদনপত্র পেশ করেন। বিগত বছর যা ছিল ৭৭৫ জনে সীমাবদ্ধ। শিক্ষকতায় উচ্চ বেতনের জন্য ট্রেনিংকে আবশ্যিক করার ফলাফল ছিল এই ঘটনা। ২৩১ জনকে ভর্ত্তি করা হয়। অন্য ৯ জনকে সরকারী ভাবে ডেপুটেশনে পাঠানো হয়। মাত্র পঁচিশ জন এই শিক্ষাবর্ষে ছিলেন ফ্রেশার ট্রেনি। জাতীয় জরুরী অবস্থার কারণে এই শিক্ষাবর্ষে বার্ষিক পুনর্মিলন উৎসব হয়নি। ঐ খাতের ৫০০ টাকা জাতীয় প্রতিরক্ষাখাতে দান করা হয়। ১৯৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখে Extension Service Department-এর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা-অধিকর্তা শ্রী ভবতোষ দত্ত সভাপতিত্ব করেন এবং তিনি তাঁর ভাষণে এই বর্ধিত শিক্ষা পরিসেবার অসীম গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। বিশেষত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য যার গুরুত্ব সবিশেষ। এই শিক্ষাবর্ষে কলেজের নৈশস্কুলটি তার অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রেখে পঞ্চম বর্ষে পা রাখে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এই স্কুলে তখন ৭০-এর বেশি। ১৯৬৩-র সেপ্টেম্বর মাসে অধ্যক্ষ শ্রী জে.সি.দাশগুপ্ত ফুলব্রাইট স্কলারশিপ গ্রান্ট নিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অভিমুখে রওনা হয়ে গেলে, শ্রী কুলদাপ্রসাদ চৌধুরী কলেজের অধ্যক্ষ পদে কার্যভার গ্রহণ করেন। এস.পি.মুখার্জীর অবসরপ্রাপ্তির কারণে এক্সটেনশন সার্ভিস দপ্তরের কো-অর্ডিনেটর এর পদে কলেজের অধ্যাপক শ্রী নিত্যলাল বসাক দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

১৯৬৪ সালে ভারত সরকার কর্তৃক আহূত সর্বভারতীয় শিক্ষা কমিশন, যেটি কোঠারি কমিশন নামে সর্বাধিক পরিচিত, সেই কমিশন ১৯৬৬ সালের জুন মাসে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য একটি সার্বিক প্রস্তাবনা পেশ করে। যেখানে ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে প্রথম বারের জন্য শিক্ষাকে জনতার জীবন ও চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কিত করে সংগঠিত করবার প্রস্তাব রাখা হয়। এই সঙ্গে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের, বিকাশের এবং পরিবর্তন সাধনের হাতিয়ার হিসাবে শিক্ষাকে বিবেচনা করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকতা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এক সর্বাত্মক পরিবর্তন বা আমূল গুণগত পরিবর্তন অর্থাৎ 'বিপ্লব' সম্পন্ন করবার আহ্বান রাখা হয়। কমিশনের ভাষায় বলা হয় যে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি ও নবতর মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রচলন করা খুবই প্রয়োজন, যার দ্বারা কৌতুহলের সৃষ্টি, জানার প্রতি আগ্রহ এবং ভালোবাসার সঞ্চার ক্রমে, একটা স্বতঃপ্রণোদিত শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষাচর্চার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যেখানে চিন্তনক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটবে, সমস্যা সমাধান মূলক দৃষ্টিভঙ্গী ও দক্ষতা গড়ে উঠবে ; আর এসবের উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠবে পঠন পাঠন ও মূল্যায়নের এক আদ্যন্ত নূতন বৈপ্লবিক সংগঠন।

এই চিন্তাভাবনার সঙ্গে সাযুজ্য বজায় রেখে আমাদের এই কলেজটি তখন থেকেই নিজেকে আমূল বদলে ফেলে প্রাসঙ্গিক ও যুগোপযোগী ধ্যান ধারনার বিকাশ ঘটানোয় প্রয়াসী হয়ে ওঠে। কলেজে

দুটি নতুন ইউনিট খোলা হয়, একটি মূল্যায়ন ইউনিট আর একটি উড অ্যান্ড ক্রাফ্‌ট ইউনিট। এই পর্বে ভর্তির জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের চাপও আগের বছরের মতো যথেষ্ট বেশির দিকেই ছিল।

১৯৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষে ২১০২ জন ইচ্ছুক প্রার্থীর মধ্য থেকে ২৩০ জনকে বেছে নেওয়া হয়। এছাড়া ডেপুটেড প্রার্থী হিসাবে বিভিন্ন সরকারি বিদ্যালয় থেকে ১৯ জন ও বেসরকারি বিদ্যালয় থেকে আরও ২৪ জন কলেজে ভর্তি হয়। ২৪০ জন পরীক্ষায় বসে এবং ২২৪ জন পরীক্ষায় পাস করে। এর মধ্যে ১৫ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। ১৯৫৮ খ্রিঃ থেকে কলেজের নৈশকালীন স্কুল চালানোর প্রচেষ্টার ষষ্ঠ বর্ষে ১২৫ জন বালক ও বালিকা শিক্ষা লাভ করে। বলা বাহুল্য কলেজের অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে কলেজের ছাত্রদের আন্তরিক যত্নে ও প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই এই প্রয়াসটি বজায় ছিল।

এই শিক্ষাবর্ষে দি ব্যুরো অব এডুকেশনাল অ্যান্ড সাইকোলোজিক্যাল রিসার্চ ইউনিট-এর তরফে রাজ্যের ১০২ টি হায়ার সেকেন্ডারি ও মাল্টিপারপাস স্কুলে, 'স্কুল গাইডেন্স' বিষয়ে টেস্ট মেটিরিয়ালস্ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজপত্র পাঠানো হয়। ব্যুরোর অধীনস্থ The Adolescent Guidance Center টিও আগের মতোই সক্রিয়ভাবে তার কাজকর্ম বহাল রাখতে সক্ষম হয়। ইতিমধ্যে বর্ধমান ও মালদহে সরকারি ট্রেনিং কলেজ খোলা হলে শ্রী কে. পি. চৌধুরী বর্ধমানে ও শ্রী দিবাকর দাস মহান্ত মালদহে অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করার জন্য কলেজ ছেড়ে যান। ১৯৬৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বি.এড পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীর এক সার্বিক পরিবর্তন সাধন করেন। এই নবপ্রবর্তিত পাঠ্যক্রমে বিশেষ জোর দেওয়া হয় সম্প্রদায়গত ঐক্যপূর্ণ জীবনযাপন এবং সহ পাঠক্রমিক বিষয়াদির উপর।

ষাটের দশকের শেষ পাদে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল ট্রেনিং কোর্সের ও ডিগ্রিটির নাম পরিবর্তন। ব্যাচেলার অব্ টিচিং থেকে এখন আরও ব্যাপ্তির লক্ষ্যে কোর্সের ও ডিগ্রির নাম রাখা হয় ব্যাচেলার অব এডুকেশন বা বি.এড.।

১৯৬৫-৬৬ শিক্ষাবর্ষেও কলেজে ছাত্র ভর্তির চাপ প্রায় একই রকম ছিল। ২০০০ প্রার্থীর মধ্যে ২২৮ জনকে মনোনীত করা হয়। ২০ জন শিক্ষক সরকারী স্কুলের থেকে ডেপুটেশনে আসেন। কলেজের নৈশ স্কুলটির সপ্তম বর্ষে ১৬৮ জন ছাত্র-ছাত্রী এই স্কুলে অবৈতনিক ভাবে শিক্ষার সুযোগ লাভ করে। এলাকার দুঃস্থ ও অভাবী শিশু ও বয়স্ক মানুষের শিক্ষার জন্য এই নৈশ স্কুলটি প্রশিক্ষণর্থীদেরই স্বতঃপ্রণোদিত কর্মোদ্যেমে নিরলসভাবে তার কাজ করে চলেছিল। এ বছরেও Extension Service Department-এর উদ্যোগে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য, গ্রন্থাগারিকদের জন্য নানা ধরনের নানা বিষয়ে আলোচনাচক্র, কর্মশালা ইত্যাদির আয়োজন করা হয়েছিল। ব্যুরোর অধীনস্থ Adolescent Guidance Centre-টি সক্রিয় ভাবে তার কাজ করে যাচ্ছিল। নানা জনের ২৪ টি সমস্যা নিরসনে এই গাইডেন্স সেন্টারটির উদ্যোগের অন্ত ছিল না। ডক্টর কল্যাণী প্রামাণিক এই বছর ব্যুরো-তে প্রফেসর-ইন-চার্জ হিসাবে কাজে যোগদান করেন। ১৯৬৬-৬৭ শিক্ষাবর্ষে ২০০০ প্রার্থির মধ্য থেকে যথারীতি ২২৩ জনকে বাছাই করে নেওয়া হয়। বর্ধিত শিক্ষা পরিষেবা হিসাবে এ বছর ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। Intensive School Improvement Programme-এর মাধ্যমে ১০ টি স্কুলকে বেছে নেওয়া হয় এবং উক্ত স্কুলগুলিতে গিয়ে বহু শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যা বিষয়ে সম্মেলন সংগঠিত করা হয়। ১৯৬৬ বর্ষে The Adolescent Guidance Centre-এ আরও ১২ টি নূতন কেস গ্রহণ করা হয়।

আমাদের গিরি স্যার সকলের প্রিয় শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ গিরি অঙ্কের শিক্ষক হিসাবে ১৯৬৬-র জুলাই মাসে কাজে যোগদান করেন। কলেজে ভর্তির আবেদন ১৯৬৭-৬৮ বর্ষে এক শিখর স্পর্শ করে। ২৫০০-এরও বেশি দরখাস্ত জমা পড়ে।

১১৫৩ জনকে সাক্ষাৎকার এর জন্য ডাকা হয়। এর থেকে ২৪০ জনকে বেছে নেওয়া হয়। ১৯৬৭ সালের বি.টি. পরীক্ষায় শ্রী শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য এই কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার

করেন। ১৯৬৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে সরকারী আদেশনামা বলে দি ব্যুরো অব্ এডুকেশনাল অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল রিসার্চ এখন থেকে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। ব্যুরোর প্রথম অধ্যক্ষ হন শ্রীমতী কল্যাণী প্রামাণিক। এই শিক্ষাবর্ষে পালিত হয় কলেজের হীরক জয়ন্তী বর্ষ বা ৬০ বৎসর পূর্তি উৎসব। হীরক জয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার। ১৯৬৮-৬৯ শিক্ষাবর্ষে ২৭০৯ জন প্রার্থীর মধ্য থেকে ১১৯১ জনকে সাক্ষাৎকারে ডাকা হয় এবং ২৪৮ জনকে ভর্ত্তি করা হয়। ১৯৩ জনই এর মধ্যে ডেপুটেড শিক্ষক ছিলেন। আমাদের অগ্রজ ও প্রিয় শিক্ষক শ্রী জ্যোতির্ভূষণ দত্ত ৩.৭.১৯৬৮ তারিখে কলেজে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। ঐ একই বছরে শ্রী গঙ্গারাম মিত্র ১.৭.৬৮ তারিখে ইতিহাস শিক্ষক হিসাবে কলেজে আসেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পোস্ট গ্র্যাজেয়ুট স্টাডিজ ইন এডুকেশন কাউন্সিল এর নির্বাচনে আমাদের কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রী জে. সি. দাশগুপ্ত, শ্রী বি. বি. ভট্টাচার্য এবং শ্রী এন. কে. রায় নির্বাচিত হন। ১৯৬৮-৬৯ শিক্ষাবর্ষে কলেজের Department of Extension Service তার ১৪তম বর্ষ অতিক্রম করে। একই রকম আন্তরিকতা ও উদ্যোগসহকারে এই বিভাগটি মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য বর্ধিত শিক্ষাসংক্রান্ত পরিষেবা সম্ভার নিয়ে হাজির থাকে। অনেকগুলি শাখায় অনেকগুলি রিফ্রেশার কোর্সের আয়োজন করা হয়। ১৯৬৯ সালের বি.টি. পরীক্ষাটিই ছিল শেষ বি.টি. পরীক্ষা। এরপর থেকে পরীক্ষা তথা ডিগ্রীটির নাম হয় বি.এড.পরীক্ষা তথা ডিগ্রী। কলেজে এই বছর থেকে চালু করা হয় একটি কনডেন্সড বি.এড.কোর্স, ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫০ জন। ১৯৭০-৭১ শিক্ষাবর্ষে ২৫০০-এর অধিক প্রার্থীর মধ্য থেকে ২৪০ জনকে বাছাই করা হয়। এই বছর অধ্যাপক নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, অধ্যাপক লোকেশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং অধ্যাপক পশুপতি চ্যাটার্জী অবসর গ্রহণ করেন। এবছরও ঐ Condensed B.Ed. Course-টি চালু থাকে। বিগত বছরে ৪১ জন এতে অংশগ্রহণ করেন। কলেজের নৈশ স্কুলটি ৩রা আগস্ট ১৯৭০ সাল থেকে এই শিক্ষাবর্ষের জন্য চালু হয়। ৭৫ জন বিদ্যার্থী এই স্কুলে ভর্ত্তি হন। এই বছর (১৯৭০-মে) ৪১ জন বি.এড. পরীক্ষার্থী সহ ২৯১ জন মোট পরীক্ষার্থী বি.এড. ফাইনাল পরীক্ষায় বসেন। এই বছরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল এই যে "All Bengal Teachers Trainess' Councils Organising Committee-র গঠন। যা প্রশিক্ষণার্থীদের সারা বাংলা মুখপত্র হিসাবে কার্যকরী হয়। ১৯৭১-৭২ শিক্ষাবর্ষটি ছিল নানা কারণে স্মরণীয়। কারণ এবছর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। অধ্যক্ষ ডক্টর জে. সি. দাশগুপ্ত অবসর গ্রহণ করেন এবং শ্রী দিবাকর দাস মহান্ত তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯৭২-৭৩ শিক্ষাবর্ষে শ্রী প্রমথ পাত্র এবং শ্রী দীপ্তেন সেন আমাদের কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে কাজে যোগদান করেন। পরবর্তী শিক্ষাবর্ষগুলিতে পশ্চিমবঙ্গে ও সারা দেশ জুড়ে ঐ সময় যে কালো দিন ঘনিয়ে এসেছিল তার ছায়া পড়ে। এর ফলে সঠিক সময়ে বি.এড. পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। ছাত্ররা অতঃপর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ডেপুটেশন জমা দিয়ে '৭৫ ও '৭৬ সালের পরীক্ষা একই সঙ্গে নেবার আবেদন জানায়। এই সঙ্গে ছাত্ররা বি.এড.-এর শিক্ষাসূচী ও সময়সীমা পরিবর্তনেরও দাবী জানায়। ফ্রেশারদের জন্য প্রদেয় ভাতা/স্টাইপেণ্ড ১০ টাকার স্থলে ১০০ টাকা করবার দাবী জানায়। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো শিক্ষক-প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়েও যুগের হাওয়া সঙ্গে নিয়ে ছাত্র আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং উপস্থিতি ঘোষণা করে। ১৯৭৬ সালে দিবাকর দাস মহান্ত অবসর গ্রহণ করার পর ব্যুরোর অধ্যক্ষ পদ থেকে শ্রীরমেশ দাস কলেজের অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন।

১৯৭৭-৭৮ শিক্ষাবর্ষে অধ্যাপক শ্রী জীবেন্দ্র কুমার সেন পরলোকগত হন। মধ্যশিক্ষা পর্যদের প্রশাসক লব্ধপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষাবিদ্ শ্রী সত্যপ্রিয় রায় লোকান্তরিত হন। অধ্যাপক শ্রী দিলীপ কুমার চক্রবর্তী হুগলী

ট্রেনিং কলেজ থেকে এই কলেজে বদলি হয়ে আসেন। NCERT কর্তৃক এই কলেজে 'Preparation of self learning institutional materials' নামে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে কলেজের অধ্যাপক শ্রী সূর্যশঙ্কর রায় ও মহম্মদ রেফাতুল্লাহ বক্তব্য পেশ করেন। কলেজের বর্ধিত পরিসেবা দপ্তরের উদ্যোগে চারদিনব্যাপী তিনটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় ও কলকাতার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকেরা এতে অংশগ্রহণ করেন। অধ্যাপক অমল কুমার চট্টোপাধ্যায় 'Life Science syllabuses–its tone, extent of topics and model questions' এই বিষয়ে সেমিনারটি পরিচালনা করেন। অন্য দুই জন অধ্যাপক যাঁরা সেমিনারে আরো দু'টি বিষয়ে নেতৃত্ব দেন তাঁরা ছিলেন শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ গিরি এবং শ্রী অশোক দত্ত মহাশয়। UNICEF-এর সহযোগিতায় ৯-২৩ মার্চ ১৯৭৮-এ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে অধ্যক্ষ রমেশ দাশের পরিচালনায় প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একটি Science Education Orientation Course আমাদের কলেজে আয়োজিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় B.Ed. Course-এর পুনর্বিন্যাসের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং আমাদের কলেজের শিক্ষকদের কাছে সুপারিশ চাওয়া হয়। কলেজের শিক্ষকেরাও এই ডাকে সাড়া দিয়ে তাদের মূল্যাবান সুপারিশ পাঠান। ১৯৮০ সালে কলেজ গৃহের তিন তলায় প্রতিষ্ঠিত হয় রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্যদ বা SCERT।

১৯৮২-৮৩ শিক্ষাবর্ষে মহাবিদ্যালয়ে (৭৫ বৎসর) প্লাটিনাম জুবিলি পালন করা হয়। ১৯৮৩ সালটি ছিল ৭৫তম বৎসর।

১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষে অধ্যক্ষ শ্রী রমেশ দাস বিদায় নিলেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন শ্রী মদনমোহন ঘোষ মহাশয়। সত্তরের দশকের শেষ ও আশির দশক থেকেই কলেজে বর্ধিত পরিসেবার কার্যক্রম প্রায় নেই। আশির দশকে দি ব্যুরো অব সাইকোলজিক্যাল অ্যাণ্ড এডুকেশনাল রিসার্চ প্রতিষ্ঠান আর নেই। সরকারী আদেশনামা (712 (cs) dated 21.5.1980) বলে সাতটি প্রতিষ্ঠানকে একত্রিত করে আশি সালের জুন মাসে আত্মপ্রকাশ করে রাজ্য শিক্ষাসংক্রান্ত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্যদ (SCERT)। যে প্রতিষ্ঠানগুলিকে একত্রিত করা হয় সেগুলি ছিল (১) দি স্টেট্ ইনস্টিটিউট অব্ এডুকেশন, বাণীপুর (১৯৬৪) (২) দি ব্যুরো অব্ এডুকেশনাল অ্যান্ড সাইকোলোজিক্যাল রিসার্চ, কলিকাতা (১৯৫১) (৩) দি ইভাল্যুয়েশন ইউনিট অফ্ দি ব্যুরো (১৯৬৩) (৪) দি ইভিনিং বি.এড সেল (১৯৭২) (৫) দি ইউনিসেফ্—অ্যাসিস্টেড সায়েন্স এডুকেশন প্রোগ্রাম সেক্শন (১৯৭২) (৬) দি এক্সটেনশন সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্টস্ অব্ থ্রি ট্রেনিং কলেজেস্ (১৯৫৬) (৭) দি এডুকেশনাল টেকনোলজি সেল (১৯৭৮) *(বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখিত সালগুলি উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিষ্ঠাবর্ষ)।* অবশ্য ছাত্রসংখ্যা সেই ২৪০ জন আর ABC তিনটি Section করে চলেছে পঠন-পাঠন। সেমিনার, কর্মশালা এ সব কিছুই চলেছে আগের মতোই। প্রকাশিত হচ্ছে বার্ষিক কলেজ পত্রিকা 'Education Today' কিন্তু কোথায় যে ভাটার টান। ট্রেনিং-এর প্রতি আগ্রহ, ট্রেনিং -এর গুরুত্ব সবই যেন কেমন কমের দিকে। শিক্ষকরা যারা আসেন, তাঁরা আসেন যেন নিতান্ত দায়ে পড়ে। আর ফ্রেশার-রা আসে কোনো কিছু না করতে পেরে বি.এড. করাই ভালো—এই মানসিকতা নিয়ে। ট্রেনিং থেকে যেন কিছুই নেবার নেই। বাস্তব ক্ষেত্রে হয়তো ট্রেনিং-এর প্রয়োগযোগ্যতা কিছুটা কমে থাকতে পারে। কিন্তু ট্রেনিং-এর সেদিকটা হল দক্ষতার দিক। ট্রেনিং-এর অন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আঙ্গিকের এবং মনোভাবের। সেদিকটাতে ঘাটতি আসার কোনো বাস্তব কারণ না থাকলেও, ঘাটতি কিন্তু চোখে পড়ছিল সেদিনেও। এমনি করে গতানুগতিকভাবে আশির দশক পার হয়ে নব্বই-এর দশক এসে গেল। অধ্যক্ষের পদে ১৯৯৪ সালে কর্মভার গ্রহণ করলেন ডক্টর শ্রী দিলীপ কুমার চক্রবর্তী। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলতে একটি ঘটনা হল এই যে, ১৯৯০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বি.এড.-এর পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন সাধন করেন। ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষ থেকে নূতন পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীর প্রচলন করা হয়। কিন্তু তাতেও যে বাস্তব

ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের উপযোগিতা কিছু বর্ধিত হয়েছিল এমন নয়। তবু ট্রেনিং কলেজের পক্ষ থেকে প্রচেষ্টায় সার্বিক ঘাটতি দেখা দিয়েছিল এমন নয়। বরং বহু ঘটনাই ছিল ট্রেনিং কলেজের আয়ত্তের বাইরে। যেমন বিদ্যালয়ে শ্রেণিতে প্রচুর ছাত্র অথচ শিক্ষক মহাশয় কম। এমত অবস্থায় বক্তৃতা পদ্ধতি ভিন্ন অন্য পদ্ধতি কাজে লাগানো কঠিন। তবে কথা হল সর্বত্র সব শিক্ষক মহাশয় কী এই বক্তৃতাটুকুও আন্তরিকতাভরে নিষ্ঠার সঙ্গে দেবার চেষ্টা করেছেন? এই সঙ্গে এক সময় ট্রেনিং কলেজের শিক্ষাবর্ষ আর বিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষের মধ্যে সাযুজ্য নষ্ট হয়েছে। তখন প্রশিক্ষাণার্থিদের প্র্যাকটিস টিচিং-এ বিদ্যালয়ে যাওয়া এবং ক্লাস নেবার ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে সমস্যা। তবু ১৯৯১ সাল থেকে ট্রেনিং কলেজে শিক্ষকতা করবার পর, বহু ছাত্রকেই পাশ করে কলেজ ছেড়ে যাবার পর বলতে দেখেছি, যে স্যার আর কিছু না হোক, ট্রেনিং কলেজ বদলে দিয়েছে মানসিকতার অনেকখানি। ট্রেনিং কলেজের পদ্ধতি সর্বাত্মকভাবে প্রয়োগ করতে না পারলেও ছাত্রদের প্রতি, পেশার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর জন্য ট্রেনিং কলেজের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

নূতন মর্যাদা নূতন দায়িত্ব ঃ

এরপর ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে এই মহাবিদ্যালয় 'ইনস্টিটিউট অব্ অ্যাডভান্সড্ স্টাডিজ ইন এডুকেশন'-এর মর্যাদা লাভ করে। ঐ সময়ে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগও সমমর্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারী সিদ্ধান্ত ছিল যে, প্রতি ২০টি জেলা পিছু, প্রতিটি রাজ্যে একটি করে IASE-কে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। এমত অবস্থায় বহু উৎকণ্ঠা উদ্বেগের অবসান ঘটিয়ে ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে সরকারী তরফে পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র IASE হিসাবে আমাদের এই মহাবিদ্যালয়ই স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই IASE-র কাজ প্রধানত শিক্ষক প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন করা। যে বর্ধিত পরিসেবা দানের কাজ এই মহাবিদ্যালয়ে Extension Service Programme-এর মাধ্যমে একদা সাড়ম্বরে সূচিত হয়েছিল এবং বহুকাল কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পাদিত হয়ে এসেছিল, বলতে পারা যায়—এ যেন সেই সব কাজকর্মেরই পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস। একাদিক্রমে শিক্ষক প্রশিক্ষকদের শিক্ষাগত ও চিন্তা-ভাবনাগত ক্ষেত্রে পেশাদারী দক্ষতা ও মনোভাবের বিকাশ সাধন ও অন্যদিকে মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের কর্মরত শিক্ষকদের পাঠদানের মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে বহুবিধ কর্মকাণ্ড সম্পাদন করাই এই IASE-র কাজ। ২০০০ সালে মহাবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এই উদ্দেশ্যে IASE-র নূতন ভবন নির্মাণের কাজও কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে শুরু করা হয়। তদানীন্তন রাজ্য উচ্চ-শিক্ষামন্ত্রী শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী মহোদয় ২৮শে জুন ২০০২ তারিখে প্রস্তাবিত নূতন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

এই IASE-র অন্তর্গত কর্মকাণ্ডের অংশ হিসাবে এই কলেজে প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর কোর্স খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। রাজ্য সরকারের সহায়তা ও উদ্যোগক্রমে এ বিষয়েও বিশেষ সফলতা অর্জিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজকে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর কোর্স পরিচালনার জন্য অনুমতি দেওয়া হয় (২০০০-০১ শিক্ষাবর্ষে)। সাম্প্রতিককালে দেশব্যাপী শিক্ষক প্রশিক্ষণের মধ্যে একটা সাযুজ্য, ভারসাম্য আনার লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ পর্ষদ বা ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার্স ট্রেনিং সংক্ষেপে NCTE ২০০১-০২ শিক্ষাবর্ষে এই কলেজকে এম.এড. কোর্স পরিচালনার ছাড়পত্র দেয়।

এই প্রসঙ্গে বলা ভালো জাতীয় আইনসভায় আইন বলে স্ট্যাটুটরী বডি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত এই এন.সি.টি.ই.-ই ১৯৯৫ সালের ১৯শে আগস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। আইন বলে এও স্বীকৃত হয় যে, এখন থেকে দেশব্যাপী সমস্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে এই সংস্থার থেকে অনুমোদন নিতে হবে। অর্থাৎ এই প্রতিষ্ঠানের জন্মের পর, রাজ্য সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এন.সি.টি.ই.-ই

সর্বপ্রধান নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ট্রেনিং কলেজগুলির অন্য সকল প্রকার স্বীকৃতি অর্থহীন হয়ে পড়ে। এমত অবস্থায় ঐ সমস্ত অনুমোদনহীন কলেজের লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীর প্রশিক্ষণও অর্থহীন হয়ে যায়। একপ্রকার বাধ্য হয়েই সমস্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলিকে এন.সি.টি.ই.-র অনুমোদনের জন্য প্রার্থনা জানাতে হয়। শিক্ষক প্রশিক্ষণের সার্বিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই নিয়ন্ত্রণ কাম্য ও প্রয়োজনীয় বলা হলেও কার্যত এই নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বা পর্যদ যে সমস্ত শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন যোগ্যতা অর্জনের কথা বলে, তার ব্যবস্থা করা আর্থিকভাবে বহু ক্ষেত্রেই খুবই দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম পর্বে ১০ জন ছাত্রছাত্রী পিছু একজন শিক্ষক এই অনুপাত, এক লহমায় ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের ছাত্রসংখ্যা ২৪০ থেকে ১০০-১১০-এ নামিয়ে আনে। রাজ্যের প্রশিক্ষণপ্রার্থী বহু শত হাজার শিক্ষক ও সদ্য গ্র্যাজুয়েটের পক্ষে যে সংবাদ একটুও সুখকর ছিল না। বরং তাদের কাছে এই প্রয়াস উৎকর্ষতা সৃষ্টির ফিকিরে শিক্ষা সংকোচন প্রয়াস বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু সার্বিকভাবে নিরুপায় রাজ্য সরকার ও শিক্ষামন্ত্রক এন.সি.টি.ই.-র অনুমোদন অর্জনের জন্য কলেজগুলিকে পরামর্শ দিতে এক প্রকার বাধ্য হয়। আমাদের কলেজ ২০০০ খ্রিস্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি এন.সি.টি.ই.-র অনুমোদন পায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সারা দেশ জুড়ে ১৯৯৫ সাল থেকেই সমস্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন থাকাটা বাধ্যতামূলক হয়। ন্যায়ালয়ে জনস্বার্থ মামলার রেশ ধরেই এই বিষয়টি জনসমক্ষে আসে। অতএব পুনরায় রাজ্যের সমস্ত কলেজের জন্য ১০০ জনের এন.সি.টি.ই টীম ২০০৬-০৭ সালে পরিদর্শনে আসে। আমাদের কলেজও বাদ যায়নি। এই পরিদর্শনের পর ১৯৯৫ সাল থেকেই এই কলেজটি অনুমোদিত কলেজের স্বীকৃতি লাভ করে। আর আমাদের প্রশিক্ষণপ্রার্থীরা দেশের সর্বত্র শিক্ষকতার কাজে যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয়। অতঃপর ২০০২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতিক্রমে ও এন.সি.টি.ই.-র অনুমোদনসাপেক্ষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ও উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের আগ্রহে ডেভিড হেয়ারে চালু হল শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়ে এক বছরের এম.এড.কোর্স। তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রী দিলীপ কুমার চক্রবর্তী মহাশয় এই এম.এড়.-এর কোঅর্ডিনেটর হিসবে কলেজের বর্ষীয়ান অধ্যাপক শ্রী কমলকৃষ্ণ দে-র উপর দায়িত্ব দিলেন। ঐ সময়ে শ্রী কমলকৃষ্ণ দে মহাশয় ছিলেন একজন এম.এড. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক। আর আমাদের মধ্যে ঐ সময়ে এম.এড. ছিল অধ্যাপক শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্যের।

২০০২-০৩ ছিল এম.এড. কোর্সের প্রথম শিক্ষাবর্ষ। মোট ২০টি আসন নিয়ে শুরু হয় এই যাত্রা। এন.সি.টি.ই.-র নির্দেশনামায় ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়ে কাজে যোগদান করা সমস্ত অধ্যাপকের জন্য এখন এম.এড. করাটা বাধ্যতামূলক হয়। ফলত শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলি থেকে অধ্যাপক অধ্যাপিকারা ডেপুটেশনে এই শিক্ষা কোর্সে যোগদান করেন। ১০ জন ডেপুটেড ও ১০ জন ফ্রেশার ট্রেনির সমন্বয়ে প্রথম শিক্ষাবর্ষে ক্লাস শুরু হয়। প্রথম শিক্ষাবর্ষেই এম.এড. পরীক্ষায় আমাদের কলেজ সাফল্যের মুখ দেখে। একই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগের চালু হওয়া এম.এড়. কোর্সের ছাত্রছাত্রী এবং আমাদের ছাত্রছাত্রী সকলের মধ্যে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্থান অর্জন করেন। প্রথম হন শ্রীমতী শুভশ্রী দাশগুপ্ত, দ্বিতীয় শ্রীমতী বিচিত্রা দেব। আর চতুর্থ হন শ্রীমতী ইন্দ্রাণী ঘোষ। অন্যান্য যাঁরা পরীক্ষা দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রী তুহিন সামন্ত, শ্রী রাজীব মুখোপাধ্যায়, শ্রী সুজন সামন্ত, শ্রীমতী যশোধরা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী তৃষা দাস, শ্রী শ্রীজীব পাত্র, শ্রী স্নেহাংশু শেখর দাস, শ্রীমতী আই. ভি. দে, শ্রীমতী শ্রাবণী মোদক, শ্রীমতী মঞ্জিরা মণ্ডল, শ্রী অরুণ ভড়, শ্রীমতী শোভনা শী, শ্রী অরূপ কুমার দাস, শ্রীমতী পারমিতা পোদ্দার প্রমুখ। দ্বিতীয় শিক্ষাবর্ষে ২০০৩-০৪-এও M.ED.-এ ভালো ফলের ধারা অব্যাহত থাকে। তৃতীয় শিক্ষাবর্ষে

২০০৪-০৫-এ আমাদের কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীমতী জয়শ্রী ব্যানার্জী এম.এড. পরীক্ষা দেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ২০০৫-০৬ এবং ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষেও ফলাফল ভালো ছিল। বর্তমানে ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষের ক্লাস সদ্য শেষ হয়েছে, প্রশিক্ষণার্থীরা পরীক্ষায় বসার অপেক্ষায়। আশা করা যায়, এবারেও ফলাফল ভালো হবে।

অন্যদিকে আবার বি.এড. পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী বদলের একটা প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে থাকে। এন.সি.টি.ই-র তরফেও এ বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। এমত অবস্থায় ১৪-১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০০০ তারিখে এই মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতি ও কলেজের যৌথ উদ্যোগে বি.এড. পাঠ্যক্রমের পুনর্গঠন সংক্রান্ত তিনদিনের একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ থেকে অধ্যাপক অধ্যাপিকাগণ এই কর্মশালায় যোগদান করেন এবং তাদের মূল্যবান পরামর্শক্রমে একটি খসড়া সিলেবাস প্রস্তুত করা হয় ও সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে সেটি প্রেরণ করা হয়। অবশেষে ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নূতন বি.এড. পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রবর্তন করে। বর্তমানে সেই সিলেবাস অনুসারেই পঠন-পাঠন চলছে।

২০০২ সালের ১২ই জানুয়ারী অধ্যক্ষ শ্রী দিলীপ কুমার চক্রবর্তী-র উদ্যোগে প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রী ক্ষেত্রগোপাল দাস ঘোষ মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কলেজে ডঃ কে. ডি. ঘোষ স্মারক বক্তৃতা প্রচলন করা হয়। প্রথম বক্তৃতাটি দেন শ্রী পবিত্র সরকার। গত ২০০৫ সালে অধ্যক্ষ শ্রী দিলীপ চক্রবর্তী অবসর গ্রহণ করেন। কলেজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন বর্ষীয়ান শিক্ষক শ্রী কমল কুমার দে। ২০০৬-এর ডিসেম্বর মাস থেকে অধ্যক্ষ হিসাবে পুনরায় দায়িত্ব পালন করবার পর জানুয়ারী ২০০৭ থেকে তিনি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হিসাবে কাজে যোগদান করেন। কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে সহকারী শিক্ষা অধিকর্তা শ্রী প্রণবকৃষ্ণ চৌধুরী দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

শেষের কথা ঃ

সেই ১৯৮৩ সালে প্ল্যাটিনাম জুবিলী পালন করার পর আরও পঁচিশ বছর অতিবাহিত করে আজ আমরা এসেছি শতবর্ষ পালনের বৎসরে। কত নূতন অধ্যাপক এসেছেন। কত পুরাতন অধ্যাপক বিদায় নিয়েছেন। বর্ষে বর্ষে দলে দলে এসেছে গেছে শত শত বিদ্যার্থীরা। ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ এই বহমান কালস্রোতে আজ চলেছে পূর্ণ করতে একশটি বছরের একটি গৌরবময় অধ্যায়। এ পর্যন্ত যা লিখেছি, তা সাল দিনের সংখ্যা বসানো সালতামামি। তার প্রথম ৫০ বছর অনুলিখনের কাজ খুব সহজে হয়েছে, তার কারণ হাতের সামনে ইংরেজীতে লেখা শ্রী সুরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের 'History of the College' রচনাটির উপস্থিতি, যা প্রকাশিত হয়েছিল সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক পুস্তিকায়। তার পরের ৫০ বছর কয়েকটি Education Today-র সংখ্যা হাতড়ে একটা কিছু বানিয়ে তোলার প্রচেষ্টা। তার অনেকটাই ছেঁড়া ছেঁড়া কোলাজের মত। তবে ভরসার কথা এই যে সাল তারিখের ভিড়ে ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে লুকিয়ে থাকে না মোটেই। একটা কলেজের ইতিহাস লেখা থাকে তার ছাত্রছাত্রীদের স্মৃতির মণিকোঠায়। একজন ইতিহাসের ছাত্র-শিক্ষক হিসাবে এমনটাই বুঝেছি। আর এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র (১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষ) হিসাবে গর্ব অনুভব করছি একশ' বছরের এই কলেজের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক আছে প্রথমে ছাত্র ও পরে শিক্ষক হিসাবে এটা কবুল করে। আর একটা অতি ব্যক্তিগত কথা শুনিয়ে এই ঐতিহ্যের পরম্পরার কথায় একটা পাকা গাঁথুনি তোলার লক্ষ্যে, এই স্মৃতি-বিস্মৃতির উপাখ্যান শেষ করবো, সেটা হল আমার পিতা ঠাকুর শ্রী দেবব্রত ভরদ্বাজও (১৯৫০ খ্রিঃ) ছিলেন একদা এই প্রতিষ্ঠানেরই ছাত্র।



তবর্ষ উপলক্ষ্যে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য শ্রী আশিস কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গে মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী শ্রী সুদর্শন রায়চৌধুরী, মাননীয় পূর্তমন্ত্রী শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য শ্রী শ্যামলকান্তি সান্যাল।

ভারতে শিক্ষক-শিক্ষণের প্রেক্ষাপট এবং ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের আদিপর্ব

—ভবেশ মৈত্র

১৯০৮ সালের ১লা জুলাই সরকারি উদ্যোগে কলকাতার ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। পূর্বভারতে এইটিই এ ধরনের প্রথম শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ।

এই কলেজের ভারতবন্ধু ডেভিড হেয়ারের স্মৃতিতে উৎসর্গ করার প্রস্তাব কোন্ ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছিল তা আমার জানা ছিল না। যেহেতু প্রতিষ্ঠানটি সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে মনে করাই যেতে পারে যে সে সময়ের কোনো বরিষ্ঠ সরকারী অফিসারই প্রস্তাব করেছিলেন। তবে যেই প্রস্তাব করুন, কাজটি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ও যথাযথ হয়েছিল।

মহামতি ডেভিড হেয়ার স্কটল্যাণ্ড থেকে কলকাতায় এসেছিলেন ভাগ্যান্বেষণে। এদেশে এসে তিনি ব্যবসা শুরু করেন। ১৮০০ সালে কলকাতায় বড়ির ব্যবসা শুরু করে ১৬ বছরের মধ্যে প্রভূত অর্থ উপার্জন করে তিনি ১৮১৬ সালে ব্যবসা থেকে অবসর নিয়ে আধুনিক শিক্ষার প্রচলনসহ বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনসহ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ এবং হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা ও সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন।

ব্রিটিশ শাসকদের কেন্দ্রিয় শাসন কলকাতা থেকে পরিচালিত হলেও কলকাতার অনেক আগেই ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাজ প্রদেশে ১৮৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত নরম্যাল স্কুলটি ১৮৮৬ সালে গ্রাজুয়েট ট্রেনিং কলেজ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পায়। পরবর্তীসময়ে এই কলেজটির নাম দেওয়া হল 'টিচার্স কলেজ' সায়দাপেট। ১৯০৭ সালের সায়দাপেট সহ লাহোর, এলাহাবাদ, জব্বলপুর ও বম্বে শহরে শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

উডস্ ডেসপ্যাচের সুপারিশ অনুযায়ী কলকাতা সংস্কৃত কলেজে 'কলকাতা নর্মাল স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল বাংলা মডেল স্কুলের জন্য উন্নতমানের শিক্ষক তৈরী করা। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে এই শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৬ সালের ১৭ই জুলাই। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত এবং অপর শিক্ষক নিযুক্ত হন পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতি। প্রধান শিক্ষকের বেতন নির্ধারিত হয়েছিল মাসিক ১৫০ টাকা এবং অপরশিক্ষকের বেতন ছিল মাসিক ৫০ টাকা। আরও উন্নত স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য চুঁচুড়া শহরের পশ্চিমদিকে জিটি রোডের উপর বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক মিঃ প্রাট ১৮৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক নিযুক্ত হন শ্রীযুক্ত ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বেতন নির্ধারিত হয় মাসিক ৩০০ (তিনশত) টাকা। তখনকার সময়ে সরকারী কলেজের অধ্যক্ষের মাসিক বেতন ছিল ৩০০ (তিনশত) টাকা। তৃতীয় নর্মাল স্কুলটি সার্কেলের ইনস্পেকটর অব স্কুলস্ মিঃ হেনরি উডরো স্থাপন করেন ঢাকা শহরে ১৮৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে, এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিযুক্ত হয়েছিলেন জনৈক ইউরোপীয়, মাসিক বেতন ৩০০ (তিনশত) টাকা। মাদ্রাজে নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, পাটনায় ১৮৬৩ সালের অক্টোবর মাসে। ক্যালকাটা নর্মাল স্কুল ছিল দেশের মধ্যে প্রথম নরম্যাল স্কুল।

কয়েকবছরের মধ্যে নর্মাল স্কুলের পঠন-পঠনের মান উন্নত ও প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে তিনবছরের শিক্ষাক্রম চালু হয়। প্রতিটি নর্মাল স্কুলের সঙ্গে যুক্ত ছিল একটি করে 'মডেল স্কুল' । বিষয়ের জ্ঞান

ছাড়াও শিক্ষণ-প্রকৌশলের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। নর্মালস্কুলের যেসব বিষয়চর্চা হতো তা হল—সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণ, বাঙলা সাহিত্য ও রচনা, ভারত ও ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস, পলিটিক্যাল ইকনমি, ভূগোল, ইউক্লিডের জ্যামিতি, পাটিগণিত, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, মেনসবেসন ও জরিপ, ন্যাশনাল ফিলজফি—(এই বিষয়ের মধ্যে মেকানিকস্‌ও পড়ানো হত), জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (এইবিষয়ের মধ্যে শারীরবিদ্যাও পড়ানো হত)। এইসব বিষয় ছাড়াও ছিল শিক্ষণ-কলা। এই তিনবছরের কোর্সের নাম ছিল সে সময়ের প্রচলিত ফার্স্ট আর্টস্‌-এর সমতুল।

এথেকে সহজেই অনুমান করতে পারি যে নরম্যাল স্কুলের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষণের উদ্যোগে নেওয়া হয়েছিল, তা কতটা উন্নতমানের ছিল। প্রতিটি নরম্যালস্কুলের সাথে ছিল অনুশীলনের জন্য একটি করে 'মডেলস্কুল'।

প্রথম নরম্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নেতৃত্বে। বাঙ্গালাদেশে উপযুক্তমানের শিক্ষক তৈরী করার প্রয়োজন অনুভব করে ১৮৫৩ সালে শিক্ষা কাউন্সিলের কাছে লিখিত চিঠিতে তিনি বলেছিলেন, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার আমাদের প্রথম প্রয়োজন। আমাদের কতগুলি বাংলাস্কুল স্থাপন করতে হবে। এইসব স্কুলের প্রয়োজনীয় ও শিক্ষণীয় বিষয়ে কতগুলি পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে। **শিক্ষকদের গুরুদায়িত্ব পালন করতে পারে এমন একদল মানুষ গড়ে তুলতে হবে। যাঁরা মাতৃভাষায় পারদর্শী হবেন। বিভিন্ন বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করবেন এবং সবরকমের কুসংস্কার থেকে তাঁরা মুক্ত থাকবেন।** শিক্ষকদের এই গুণগুলি থাকবে। এধরনের একশ্রেণীর শিক্ষক গড়ে তোলাই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য।

তিনি উপযুক্ত আদর্শ শিক্ষক তৈরীর জন্য যে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন বাস্তবায়িত করার জন্য 'নরম্যাল স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, একথা বললে অত্যুক্তি করা হয় না। এই প্রসঙ্গে আরও একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। চিঠিটি ১৮৫৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী মিঃ হ্যাবলিডের উদ্দেশ্যে লেখা। "দেশের জনসাধারণের কল্যাণের জন্য বাংলাশিক্ষার বিস্তার ও প্রসারের সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এবং শুধু লিখন-গঠন ও গণিত বা সহজ-সরল অঙ্ক শেখানোর মধ্যে বাংলাশিক্ষাকে সীমাবদ্ধ রাখা চলবেনা। যতদূরসম্ভব বাংলাভাষাতেই সম্পূর্ণ শিক্ষা দিতে হবে এবং তারজন্য ভূগোল, ইতিহাস, জীবনচরিত, পাটিগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।"

অনেকের মনেই তো প্রশ্ন আছে যে—শিক্ষক কি তৈরী করা যায়। যিনি ভাল শিক্ষক হবেন, তিনি জন্মসূত্রেই সম্ভাবনাময় শিক্ষক হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। একথা স্বীকার করেও বলা চলে যে শিক্ষক হতে হলে শিখতে হবে। বিশেষবৃত্তির জন্য বিশেষজ্ঞান, দক্ষতা ও প্রয়োগকৌশল আরত্ত করা দরকার। নর্মালস্কুলে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা যে উন্নতমানের শিক্ষক ছিলেন তা সে সময়ের পরিদর্শকদের বিবরণ থেকে জানা যায়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিজে যে প্রতিবেদন পেশ করেন তা থেকেও একথা জানা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও প্রবেশিকা পরীক্ষা চালু হওয়ার পর শিক্ষাক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটে তাতে "ভার্নাকুলার মডেল স্কুল" এবং শিক্ষক-প্রশিক্ষণের জন্য 'নর্মালস্কুল' এর গুরুত্ব কমতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট-এর চাহিদা বাড়ে। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও স্নাতকস্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হত শুরু করে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপরের চারটি শ্রেণীতে এবং কলেজে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান চালু হয়। একটি প্রতিবেদনে বলা হয়—

The dominance of English on the secondary course continued to grow and in the begining of the present century (i.e. 20th cent.) is struck the root into the system of education. The teaching of English came to be regarded prime object of secondary schools.

ইংরাজী ভাষায় অতি সাধারণজ্ঞান থাকলেই সরকারী অফিসে, বিদেশী সওদাগরী অফিসে এবং এধরনের বিভিন্ন কাজে চাকরি পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় ইংরাজী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা ভিড় করতে শুরু করে। বাংলাভাষায় উন্নততর জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করা সত্ত্বেও তাদের সামনে চাকরির সুযোগ রইল না। নিয়োগবাজারে এই অসম অবস্থা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সীমাবদ্ধ করে ফেলে, যার জের আজও চলছে।

ইংরাজী মাধ্যম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দ্রুত প্রসারের ফলে ইংরাজী ভাষায় জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষকের চাহিদা যেমন বাড়তে লাগল। তেমনি কলেজগুলিতে ভিড়ও বাড়তে লাগল। স্নাতকস্তরের পাঠ্যক্রম শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সার্টিফিকেট অর্জন করার আগ্রহ বাড়তে লাগল। ইচ্ছা থাকলেও ইংরাজী ভাষার দক্ষতা অর্জন সকলের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইংরাজী ভাষাশিক্ষার জন্য উন্নতমানের শিক্ষক তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং শিক্ষকপ্রশিক্ষণের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়।

ইতিমধ্যে ইউরোপে বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে ধারণার অনেক পরিবর্তন ঘটে। এইসময়ের অন্যান্য পাশ্চাত্যদেশেও চিন্তাভাবনার জগতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। তারমধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য কার্লমার্কস-এর 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ'-এর দর্শন এবং ইতিহাসের বস্তুবাদী বিশ্লেষণ। তার আগেই প্রকাশিত হয়েছে টম পেইনের "Right of Man" এবং "Age of Reason" এবং ইউরোপের যুক্তিবাদী দার্শনিকদের যুগান্তকারী তত্ত্ব। ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হলো চার্লস ডারউইন-এর The Origin of species by Mans of Natural selection, on the Preservation of Favoured Races in the struggle of Life. এসবের ফলে মানবজাতি, সমাজ ও প্রচলিত সংস্কার সম্পর্কে মানুষের ধ্যান-ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটে। শিক্ষার মতো একটি সামাজিক প্রক্রিয়া এসবের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না।

মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ ক্রমশ মানবমুখী হতে থাকে। ব্যক্তি-পরিবার ও সমাজসম্পর্কে সম্যক জ্ঞান এবং প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সে সম্পর্কে প্রাথমিকজ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের বিষয়টিও গুরুত্ব পেতে থাকে। এককথায় শিক্ষার্থীর সঠিক বিকাশ এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজের যোগ্য নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার সক্ষমতা অর্জনই শিক্ষার লক্ষ্য বলে নির্ধারিত হয়। কতগুলি প্রাচীন তত্ত্ব ও তথ্য আহরণের মধ্যে শিক্ষাকর্মসূচীকে আর ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না।

ভারতবর্ষ তখন ব্রিটিশ উপনিবেশ। ইংল্যাণ্ডের মূল ভূ-খণ্ডের প্রাগ্রসর চিন্তাভাবনা এদেশে এসে পৌছালেও তা কার্যকর রূপ পাওয়ার পথে ছিল বিপুল বাধা। সর্বজনীন শিক্ষার ধারণাও তখন ভারতবর্ষে তেমন স্বীকৃতি পায়নি। তবুও প্রাচীন অনেককিছু যে অচল অনেকের মনেই উঁকি মারছিল। এ সময়কালে মনোবিজ্ঞানের নতুন নতুন তত্ত্ব ও প্রয়োগের যাথার্থ্যও অনুভূত হতে তাকে। ধীরে ধীরে "শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান" একটি শাস্ত্র (discipline) হিসাবে স্বীকৃতি পায়। ভারতবর্ষের দুই পৃথিবীবিখ্যাত মনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করেন। এইসময়ে অর্থাৎ ১৮৯৮-৯৯ সালে বাঙ্গালা প্রদেশের সরকার জনশিক্ষার প্রকাশ করে এবং বিষয়টি বিদ্যালয় পরিদর্শকদের একটি সভায় আলোচনার পর কয়েকটি সিদ্ধান্ত হয়। এই সম্মেলনে শ্রী এ. পেডলার, ডি. পি. আই. সভাপতিত্ব করেন। তাতে বলা হয়—The training of teachers of English schools, the plan already adopted having proved a failure and the training of vernacular teachers which was being carried on with moderate success : The following were the main recommendations :–

(i) teachers of training institutions of both the categories should be trained men themselves.

(ii) At last three English teachers training colleges with Englishmen of superior qualifications as their heads should be established.

(iii) The courses of training should be for one year and mainly pedagogical for two classes of English teachers : (a) Junior English teachers who must passed Entrance or F.A. (b) Senior English teachers who have passed B.A.

(iv) The courses of Vernacular teachers should be reduced from three years to one year accelarate the rate of production of the training schools. The course of studies in general education should be reduced and that in the Art of Teaching inereased.

উপরের সুপারিশগুলির ভিত্তিতে সে সময়ের ভি.পি.আই, সি.এ. পেডলার বাংলাপ্রদেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য একটি স্কীম তৈরী করে তা বাস্তবায়িত করার উদ্যেগ নেন। এরপর লর্ড কার্জনের যুগ। ১৯০২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতসরকার এ বিষয়ে কিছু সুপারিশ করে। তার ভিত্তিতে মি. পেডলার তাঁর রচিত পরিকল্পনার পরিবর্তন করেন। এর আগে ১৯০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লর্ড কার্জনের উদ্যোগে সিমলায় একটি সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলন হয়। লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতির মূল কথা ছিল "শিক্ষার মানোন্নয়ন" ও "সরকারী নিয়ন্ত্রণ"। যাইহোক যে গতিতে কাজটি এগোচ্ছিল নানাকারণে তা বিলম্বিত হতে থাকল।

বিশাল আয়োজন—ইংল্যাণ্ডে অবস্থিত "বোর্ড অব্ এডুকেশন" প্রশিক্ষণ কলেজের জন্য অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের নির্বাচন করা। মি.আর.এস, ভেরেলিকে অধ্যক্ষের পদে নির্বাচিত করে 'ইণ্ডিয়ান এডুকেশান সার্ভিস'এর মর্যাদা দেওয়া হয়। তারপর ইংল্যাণ্ডেই তাঁকে পদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। মি.ভেরেলি ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর ডি.পি.আই-এর কাজে যোগ দেন। তাঁর কারণ যে কলেজের জন্য তাঁকে পরিবেশের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য লাহোরে বিশেষ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। এরপর দুইজন 'মেথড্টিচার' এবং 'প্র্যাকটিশিং স্কুল'-এর জন্য তিনজন প্রধান শিক্ষকও নির্বাচিত হয়ে আসেন ১৯০৬ সালের ১০ই নভেম্বর। এদের দেওয়া হল পি.ই.এস.-এর মর্যাদা।

এখানেই শেষ নয়—এরমধ্যে বঙ্গদেশ বিভাজিত হল। অপর প্রদেশের প্রশাসনিক কেন্দ্র হল ঢাকা। মি. ভেরেলি হুগলী পরিদর্শন কর এসে সেখানকার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অনুপযুক্ত ঘর-দুয়ার এবং শিক্ষণ অনুশীলনের জন্য পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত বিদ্যালয়ের অভাবের কারণে প্রশিক্ষণ কলেজ স্থাপনের জন্য পূর্বনির্ধারিত স্থান হুগলীকে অনুপযুক্ত বলে মত প্রকাশ করলেন।

কলেজ নাই, শিক্ষকনিয়োগ হয়ে গিয়েছে। তাঁরা বিলেত থেকে ভারতবর্ষে পৌছেও গেছেন। কিন্তু তাঁরা কোথায় কাজে যোগ দেবে তা ঠিক হয়নি। অবশেষে মি. ভার্লেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের কাজ এবং প্রস্তাবিত ইংরাজী শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হল। এবং মি. গ্রিফিথ ও মি. আর্মিস্ট্রাটকে প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে যুক্ত করে হেয়ার ও হিন্দুস্কুলের উন্নয়নের দায়িত্ব দেওয়া হল। তাঁরা ১৯০৭ সালের ২১ জানুয়ারী কাজে যোগ দিলেন। টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রস্তাব বিবেচনাধীন রইল। ইতোমধ্যে ১৯০৪ সালে টিচার্স ট্রেনিং সম্পর্কে রেগুলেশন রচনা করলে ১৯০৬ সালে ভারতসরকার এই রেগুলেশন অনুমোদন করে। আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতার এ এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। মি. ভার্লে কলেজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর হতাশা প্রকাশ করেন।

এবার এলেন কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজর অধ্যক্ষ মি. এইচ. আর, জেমস্। যাঁর বাংলার বিদ্যালয় সম্পর্কে সম্যকজ্ঞান ছিল। তিনি একটি অন্তর্বর্তীকালীন কর্মসূচী রচনা করছিলেন, যে সেখানে উল্লেখ করা হয়েছিলেন যে, (১) প্রদেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে শিখন পদ্ধতি সম্পর্কে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হোক,

(২) অস্থায়ীভাবে একটি স্থান নির্বাচন করে ট্রেনিং কলেজ চালু করা হোক, (৩) তারমধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ ট্রেনিং কলেজ স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হোক।

এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়র তদানীন্তন উপাচার্য্য ডঃ আশুতোষ মুখার্জীসহ মোট এগারজনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি ১৯০৮ সালের ২১শে জানুয়ারী সভায় মিঃ জেমস-এর প্রস্তাবগুলির পাঠ হয় এবং অন্যান্য সিদ্ধান্তের মধ্যে অন্যতম সিদ্ধান্ত ছিল চার বা পাঁচ কক্ষের একটি ভাড়া বাড়ীতে ১৯০৮ সালের ১লা জুলাই থেকে ইংরাজী শিক্ষকদের জন্য একটি স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হোক। প্রস্তাবিত বাড়ীটি হেয়ার ও হিন্দু স্কুলের কাছাকাছি কোন জায়গায় হলে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশ পরিচালনের কাজ সুবিধাজনক হবে বলে কমিটি মনে করেছিল। এছাড়াও স্থায়ীভবন নির্মাণের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজের আশপাশে একখণ্ড জমি সংগ্রহের কথাও বলা হয়েছিল উক্ত প্রস্তাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শর্ত অনুযায়ী প্রস্তাবিত স্বল্পকালীন শিক্ষণকেন্দ্রকে পূর্ণাঙ্গ একটি কলেজ বলে ঘোষণা এবং প্রখ্যাত স্কচ শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবী ডেভিড হেয়ারের নামে কলেজটিকে উৎসর্গ করার ও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। (জিও নম্বর 3814 তারিখ 15.08.1908)

উপযুক্ত সরকারী আদেশনামায় বলা হয় ডি.পি.আই-এর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে এই কলেজ। কলেজের অধ্যাপকদের নাম এবং পঠন পাঠনের বিষয়বস্তু সমূহ ঘোষিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদনে।

১৯০৮ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত ডেভিড হেয়ার কলেজের পঠনপাঠনের কাজ সম্পন্ন হয় প্রেসিডেন্সি কলেজ এলাকায় অবস্থিত "এলবার্ট কলেজ বিল্ডিং"-এ এবং প্রথম বিটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১৯০৯ সালে।

১৯১২ সালে বিহার ও উড়িষ্যা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ায় ডেভিড হেয়ার কলেজের ৬টি আসন বিহারের প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। প্রথমে বি.টি.র জন্য মোট আসন ছিল ২৪টি। এই সময়ে এলবার্ট কলেজের বিল্ডিং এর আরো ঘর কলেজের জন্য নেওয়া হয়। এলবার্ট কলেজের লীজের সময় সীমা পার হয়ে যাওয়ায় ১৯২০-২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে ৪৫নং বেনিয়াটোলা লেনে ভাড়াবাড়ীতে কলেজ স্থানান্তরিত হয়। ১৯২৫ সালের পূজাবকাশের আগে পর্যন্ত কলেজ বেনিয়াটোলা লেনের বাড়ীতেই চলে। ছাত্রাবাস সহ পূজাবকাশের ১৯২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ তার নিজস্ব ভবনে (২৫/৩ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড) স্থানান্তরিত হয়।

ডেভিড হয়ার ট্রেনিং কলেজের নিজস্ব ভবন তৈরীর ইতিহাস অতিদীর্ঘ। এই প্রবন্ধে তার বিশদ বিবরণ দেওয়া ঠিক হবে না। তবে দু-চারটি কথা না বললেই নয়।

কলেজের জন্য একটার পর একটা জায়গায় প্রস্তাব নাকচ হওয়ার পর মিঃ গ্রিকিথ এর প্রচেষ্টায় বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড সংলগ্ন অঞ্চলে অধ্যাপক আবাসনের জন্য ৩$\frac{১}{২}$ বিঘা, সার্কুলার রোডের উপর ছাত্রবাস সহ কলেজের ভবনের জন্য ৫$\frac{১}{২}$ বিঘা এবং তার জন্য পশ্চিমে খেলার মাঠ সহ একটি বিদ্যালয়ের জন্য ১০ বিঘা, মোট ১৯ বিঘা জমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই প্রস্তাবের সরকারী অনুমোদন ও পাওয়া যায়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হবার পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ডেভিড ট্রেনিং কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় কলেজ হিসাবে গণ্য করার প্রস্তাব বিবেচনার মধ্যে আসে, ফলে নতুন ভবনের প্রস্তাব স্থাগিত হয়ে যায়। অধিগৃহীত জমি শিক্ষা বিভাগের হাত থেকে রাজস্ব বিভাগের হাতে চল যায়। আশ্চর্যের ব্যাপার হল বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেঙ্গল গভর্নমেন্টের কোনো চূড়ান্ত

সিদ্ধান্ত না হওয়া সত্ত্বেও এবং ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ সম্পর্কে কমিশনের সুস্পষ্ট সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও কলেজের ভবন নির্মাণের জন্য অধিগৃহীত জমি হস্তান্তরিত হয়ে যায় এবং কলেজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

১৯২১ সালে আবার একটু আশার আলো দেখা যায়। ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করার পর, কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি কলেজের গৃহসমস্যার কথা জানতে পারেন। কলেজের জন্য অধিগৃহীত জমি যে হস্তান্তরিত হয়ে গিয়েছে তাও তিনি জানতে পারেন। তিনি সমস্যা বোঝার জন্য স্বয়ং কলেজ পরিদর্শনে যান। সঙ্গে ছিলেন পরিচালন সমিতির সদস্য বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক, প্রেসিডেন্সি ডিভিসন এবং স্পেশাল অফিসার মিঃ এভান বিস্। ইতোমধ্যে অধিগৃহীত জমি, যা রেভিনিউ বিভাগে চলে গিয়েছিল, তা পুলিশ বিভাগকে একটি থানা এবং মোটর ভেইকেলস্ এর অফিস নির্মাণের জন্য হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত হয়। এই অবস্থায় শ্রীযুক্ত মিত্রের সক্রিয় হস্তক্ষেপে এবং গভর্নর-ইন কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে সম্পূর্ণ জমি ১৯২২ সালের মার্চ মাসে শিক্ষাবিভাগের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

সমস্যা সমাধানের পথে আশার আলো দেখা গেলেও, আবার এক নতুন সমস্যা দেখা দিল। সরকারী কোষে ব্যাপক ঘাটতি দেখা দেওয়ায় বিভিন্ন বিভাগের ব্যয় বরাদ্দ ছাঁটাই শুরু হলে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের উপর খড়্গ নেমে আসে। ঢাকা ও কলকাতার দুটি ট্রেনিং কলেজের বদলে একটি কলেজের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া শ্রেয় বলে সরকারী মহল থেকে মত প্রকাশ করা হয় এবং ঢাকার কলেজটিকেই অগ্রাধিকার দেওয়ার কথাও উল্লেখ করা হয়। আরও দুঃখের কথা হল এই যে বরাদ্দ ছাঁটাই সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য যে কমিটি গঠিত হয়েছিল সেই কমিটি শিক্ষক-শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বকে অত্যন্ত লঘু করে দেখে এবং মন্তব্য করে যে—এমন বহুশিক্ষক দেখা যায় যে প্রশিক্ষণ না পেয়েও তাঁরা উন্নতমানের পাঠদান করে থাকেন। প্রশিক্ষণ পেলেই যে একজন শিক্ষক উন্নতমানের শিক্ষক হবেন এমন কথা বলা যায় না।

ট্রেনিং কলেজের মাথার উপর যখন এই ধরনের আঘাত আসার উপক্রম হয়েছে, তখন কলেজের কয়েকজন প্রাক্তনী সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গীর তীব্র প্রতিবাদ করেন। কলকাতার ইউনিভারসিটি ইনসটিটিউট হলে একটি প্রতিবাদ সভা হয়। ১৯২৩ সালের মে মাসে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশান দেওয়া হয়। কলকাতার শিক্ষার সুযোগকে সংকুচিত করার প্রয়াসে নগরবাসী খুবই বিক্ষুব্ধ হন।

এবারও শিক্ষামন্ত্রী শ্রী প্রভাস চন্দ্র মিত্র ত্রাণকর্তা হিসাবে এগিয়ে আসেন। অর্থবিভাগ কলকাতার ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। কলেজের কার্যাবলীর সম্প্রসারণ ও ভবন নির্মাণের বিষয়টি তখন প্রায় ভাবনার বাইরে চলে যায়। তবে শেষ রক্ষা করেন শ্রী মিত্র। বিষয়টি ক্যাবিনেটে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজকে আরও সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী করা হবে এবং প্রস্তাবিত কলেজ ভবনও নির্মিত হবে।

প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের জন্য সংগৃহীত ১০ বিঘা জমির কিছু অংশ পুলিশ বিভাগকে একটি থানা ও মোটর ভেহিকেল্স এর অফিস করার জন্য দেওয়া যেতে পারে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

ট্রেনিং কলেজের বাড়ীর জন্য ১৯২৪-২৫ আর্থিক বছরে বাজেটে ১,৭৫,০০০.০০ টাকা বরাদ্দ ও করা হয়। এক বছরের মধ্যে কলেজ ভবন নির্মিত হয় এবং ১৯২৫ সালের পূজাবকাশের পর ছাত্রাবাস সহ কলেজ ২৫/৩ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে নিজ স্থায়ী—গৃহ পায়।

ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের আদিপর্বে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে কয়েকটি কথা না বললে লেখাটি খাপছাড়া বা অসম্পূর্ণ মনে হওয়া স্বাভাবিক। তাই কয়েকটি কথা উল্লেখ করতেই হয়—

ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষা ভারতবর্ষে মূখ্যত কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইকেন্দ্রিক ছিল। ১৮৯৯-১৯০০ সালের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় মোট বিদ্যালয় ও ছাত্র সংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ বাংলাদেশে অবস্থিত ছিল। শিক্ষাবিভাগ "ইংরেজি শিক্ষক"দের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। "ভার্নাকুলার টিচার" এবং "ইংলিশ টিচার" উভয়েরই প্রশিক্ষণ প্রয়োজন মনে করে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা প্রাথমিকভাবে চিন্তা করা হয়। সে সময়ের ডি.পি.আই মি. পেডলার একটি পরিকল্পনাও রচনা করেন। এন্ট্রান্স ও এফ.এ. পাশ শিক্ষকদের জন্য দুই বছরের প্রশিক্ষণ এবং স্নাতকদের জন্য এক বছরের কোর্স। লর্ড কার্জনের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সিমলা সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলন (১৯০১) থেকে সুপারিশ করা হয় যে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় বি.এ. পাশ প্রার্থীদের জন্য লাইসেন্সিয়েট কোর্স চালু করবে। অনেক চিঠি চালাচলির পর ইংলিশ টিচারস্ ট্রেনিং কলেজের জন্য একজন I.E.S. সুপারিনটেন্ডেন্ট সহ দুজন মেথড টিচার এবং তিনটি প্র্যাকটিসিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ সরকার অনুমোদন করে। ১৯০৬ সালের ১০ই নভেম্বর মেথড টিচার হিসাবে নিযুক্ত হন—মিঃ ভেরেলি ই-গ্রিফিথ, মিঃ কর্নাক এবং মিঃ অ্যার্মাটেস্টেড, মিঃ ডারলিউ বেলারি এবং মিঃ জে.ই. হুইটটেকার। বিদেশ থেকে শিক্ষকমণ্ডলী এসে পৌঁছালেও কলেজের জন্য স্থান নির্ধারণ নিয়ে বির্তক চলছিলই।

১৯০২ সালে প্রথম এবং ১৯০৪ সালে চূড়ান্তভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ.এল.টি. ও বি.টি.—এই দুটি কোর্সের রেগুলেশান রচনা করেন। ট্রেনিং কলেজের একটি জুনিয়ার সেক্সান (সর্বনিম্ন যোগ্যতা এফ.এ. পাশ এবং অপরটি সিনিয়ার সেক্সান (সর্বনিম্ন যোগ্যতা বি.এ. অথবা বি.এস.সি. পাশ) খোলার সিদ্ধান্ত হয়।

এল.টি. পরীক্ষার জন্য নীচের বিষয়গুলি নির্ধারিত হয় ঃ—

1. Theory and parctice of Teaching in relation to Mental and Moral Science.
2. Method of Teaching specific subjects and school management.
3. Selected Educational Classics
4. A School Course in Modern English prose and poetry (upto the standard of B.A. Degree)

উপরের চারটি বিষয়ের উপরলিখিত পরীক্ষা হবে এবং এছাড়া শিক্ষণ দক্ষতা পরীক্ষার জন্য শ্রেণীকক্ষে পাঠদানকালীন মূল্যায়ন করা হবে বলে স্থির হয়। পাঠদানকালীন মূল্যায়ন এর জন্য নীচের বিষয়গুলি নির্ধারিত হয় (যে কোন তিনটি) ঃ—

(i) English (ii) A classical language (iii) History (iv) Mathematics (v) Geography (vi) Elementary Physics and Chemistry, (vii) Elementary Mechanics (viii) Kindergarten and object lessons.

বি.টি. কোর্সের জন্য স্থির হয়—এল.টি. কোর্সের প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র এবং (3) History of Educational Ideas and Methods ও (4) Selected Educational Classics.

এল. টি. পরীক্ষার অনুরূপ লিখিত ও ব্যবহারিক উভয় পরীক্ষাই নেওয়া হবে। লিখিত পরীক্ষা ৪০০ নম্বরের ও ব্যবহারিক পরীক্ষা ৩০০ নম্বরের হবে বলে স্থির হয়।

১৯০৪ সালের ১৭ই জুলাই মি. এইচ. আর. জেমস্ কলেজ পরিদর্শন করে অনুমোদন এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করেন। সে সময়ে অস্থায়ী অধ্যক্ষ ছিলেন মি. ডাবলিউ ই. গ্রিফিথ্, ইনি ছাড়া মিঃ থিকেট ও মিঃ এইচ আর্মিষ্টিড ছিলেন দুজন অধ্যাপক। কলেজের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশ সুসম্পন্ন করতে হেয়ার ও হিন্দু স্কুলের দুজন সুবিখ্যাত প্রধান শিক্ষক স্যার ঈশান চন্দ্র ঘোষ ও রায়বাহাদুর রসময় মিত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

১৯০৯ সালে প্রথম পরীক্ষা হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে বোর্ড অফ পেপার সেটার গঠিত হয়েছিল। (১) মিঃ এইচ. আর জেমস, (২) মিঃ ডাবলিউ. ই. গ্রিফিথ্ (৩) মিঃ এইচ. আর্মিষ্টিড (৪) মিঃ জে. এইচ, থিকেট (৫) ডঃ ব্রজেন্দ্রলাল শীল এবং (৬) মিঃ ডাবলিউ. জি. ওয়েভারস্পুন।

২০জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১জন পাঠরত অবস্থায় মারা যান। বাকী ১৯জনের মধ্যে ১৬জন পরীক্ষায় বসেন। তারমধ্যে ১৪ জনই কৃতকার্য হন ও ৪ জন প্রথম বিভাগে পাশ করেন।

যাঁরা প্রথম বিভাগে পাশ করেন তাঁরা হলেন ঃ—

১। মনোরঞ্জন মিত্র, ২। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, ৩। বিনয় ভূষণ সরকার, ৪। বনবিলাস রায়।

এইসময়ে কলেজ পরিদর্শন করেন

১। মিঃ এইচ. আর. জেমস, ২। স্যার গুরুদাস ব্যানার্জী—কে.টি. ৩। মিঃ জাষ্টিস্ সারদাচরণ মিত্র, ৪। মিঃ ডাবলিউ, জি. ওয়েডারস্পুন (ডি.পি. আই বার্মা) ৫। রেভঃ জি. ব্রকওয়ে, ৬। রেভঃ এফ ত্রয়াল্যাণ্ড।

এই কলেজে অনেক কৃতী অধ্যাপক বিভিন্ন সময়ে অধ্যাপনা করেছেন। এঁদের ছাত্র-ছাত্রীরা সারা ভারতে তো বটেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন। অধ্যাপকদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা খুবই কঠিন এবং সম্ভবত অনুচিত। তবুও আদিপর্বে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলাম।

১। প্রঃ চিন্তাহরণ চক্রবর্তী	৫। প্রঃ গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত
২। প্রঃ বনবিলাস রায়	৬। প্রঃ সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত
৩। প্রঃ বিনয়ভূষণ সরকার	৭। প্রঃ কুঞ্জবিহারী ঘোষ
৪। প্রঃ বসন্ত কুমার ঘোষ	৮। প্রঃ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ

৯। পূর্ণচন্দ্র ঘোষ

পরবর্তী সময়ে যারা এসেছেন তাঁদের নাম ও পরিচয় এযুগের অনেকেই জানেন। তাঁরা অনেকেই ছিলেন বিশেষভাবে খ্যাত।

এদেশে শিক্ষক-প্রশিক্ষণের সূচনা উনবিংশ শতাব্দীতে খ্রিস্টান মিশনারীদের হাতে; যা পরিশীলিত ও জাতীয়রূপ পেয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াসে, তারপর পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রভাব ও প্রয়োজনে বিবর্তিত হতে হতে বর্তমান রূপ পেয়েছে। অনেক ট্রেনিং কলেজ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় স্তরে ন্যাশানাল কাউন্সিল অফ টিচার এডুকেশান গঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়, রাজ্যসরকার ও স্বয়ংশাসিত শিক্ষা পর্ষদ সমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা তথা দূরবর্তী শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেও শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদর্শ হয়ত অনেকেই এখন আর স্মরণ করেন না, এমনকি আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষাচিন্তায় প্রাণিত যে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বিগত শতকের প্রথম দশকে প্রবর্তিত হয়েছিল তার রেশ কোথাও কোথাও কিছু কিছু পাওয়া গেলেও যেতে পারে।



কলেজের শতবর্ষ অনুষ্ঠানে ভাষণরত—শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রী বিষ্ণুপদ বেরা।

DAVID HARE TRAINING COLLEGE FOR THE BETTERMENT OF EDUCATION

—Kamal Krishna De

While serving in the teachers' training college for nearly four decades I had the occasion to meet many persons from different spheres of the society expressing their confusion over the process of training, teacher-educators, curriculum, application of training in the secondary schools. Utility of the 'teacher training degree' in the job-market etc. In comparison to other professional courses, secondary teacher education has to face innumerable criticisms. In fact the criticisms are not always unfounded. But I have never seen any person to make any caustic comment about the David Hare Training College (DHTC). Student of this college have always given costructive suggestions about curriculum transaction in the college. In the domain of school education and teachers' training D H T C has gained laureis from all concerned in the state, outside the state and even outside the country. DHTC has not confined its sphere of activity tot he college itself, it has rather extended its net work to serve the society at large in respect of the following :

- Popularization of science among the school students.
- Popularization of mathematics among the school students.
- In-service training of the teachers on behalf of the Govt. Boards, SCERT, NCERT etc.
- Guest lectures to state Universities, state-run colleges.
- Framing Curriculum for elementary to higher Education.
- Writing manual for the teachers.
- Writing text books for the students of different levels of education.
- Selection of school teachers / college teachers / university teachers.
- Inspection of different training colleges in or outside WB.
- Deputation to different Govt. Deptts. Education Boards.
- Acting as members of different boards or commissions or board of studies.
- Coordinating different school-based projects.
- Guiding students for Ph.D. Education.
- Guiding exceptional students for different projects / Jt. Entrance Examinations.

- Attending or organizing different seminars (state or national levels).
- Advising new training colleges or their development.
- Cooperating examination system at all levels right from elementary to PG.
- Participation as Govt. nominees / members in the managing committees.
- Participation of the college with its staff in print and electronic media.

The written testimonies of the above functions of the college or its nominated faculty members are not readily available from the college records. Annual manazines are not adequately available or sufficiently informative for the purpose. The plantinum jubilee volume is too little to throw any light on the theme under discussion. For exposing the role of the college the author has, therefore, to depend on the oral testimonies collected from the colleagues with whom he has worked at DHTC, statements from the alumni of the college, some stray records and personal experience of himself during his long stay in the college (1984-2007) while working in different capacities. So this article has some natural limitations.

Academic relation with university departments :

- Post Graduate students of the Education Deptt of the C.U., used to come to this college to attend lectures in special papers during the decades of the fifties and the sixties of the last century.
- The college had always a representation in the Board of Studies in the Deptt. of Education, CU.
- At least one head examiner used to be appointed from the faculty of the Jyotirbhushan college every year for B.Ed. examination.
- Some teachers have decorated the chairs of Deputy Registrars and other posts of the university. Prof Jyoti Dutta is a glaring example of this.
- DHTC with its IASE has sponsored the M.Phil. Program of NSOU (Netaji Subhas Open University) in education at this college study center from 2004. The teaching and non teaching staff of this college have shown a missionary zeal to make the 'program a success'. A large number of school and college teachers, freshers and adminsitrators of WB, Tripura, Sikkim, Assam etc enrich themselves with this degree and prepare-themselves for the Ph.D. programme. This is the only course of M.Phil degree in education through an open university in WB. The co-ordinator, Prof. Samir Chakraborty (Librarian) nurtures this study center as a substitute for his deceased daughter.
- The college hosted a study center of Indira Gandhi National Open University from1991 and a number of students obtained bachelor degrees and P. G. diplomas in non traditional subjects useful in job markets.
- The teachers of DHTC have been invited by different universities of WB and outside to be the experts or resource persons in curriculum revisions, examinations, adjudicators of Ph.D thesis, expert in selection committees etc.

· DHTC represented itself in Saddler Commission (better known as Calcutta University Commission, 1919).

Relations with Boards of Education of WB

· Most of the teaching staff of the college were appointed as the head examiners of the examinations conducted by the Boards or Councils. As a result David Hare Trg College staff quarters, as if, turned itno assembly of examiners and scrutinizers after the different final examinations of boards or councils were over. Some of the teachers of the college were associated with other functions in connection with those examinations.

· Teachers of this college have been appointed as members, secretaries and president of the boards. Prof. A. K. Chanda (Pr. WBBSE), Prof. Refatullah (Sec, WBBME), Prof. S. Sarkar (Sec, WBBPE and WBBSE), Prof. J. Dutta (Dy. Sec, WBBSE) are some remarkable persons who immedately come to mind.

· Some of our teachers have taken leading parts in syllabus revision, text book writing and examinations held by the boards (Primary, Secondary and Madrasah) e.g. S. N. Giri, D. K. Chakraborty, A. K. Chatterjee, S. K. Ghosh, R. N. De and the present author etc.

· Some of our teachers were the members of primary and secondary boards e.g. S. N. Giri, S. K. Ghosh, M. K. Ray etc.

· A large no. of our teaching and non teaching staff joined WBBPE after their retirement from the service from our college.

· In the PMOST (Programme of Mass Orientation for the School Teachers) A. K. Chatterjee, S. K. Ghosh and S. N. Giri served as resource persons under Secondary Board and the present author under the Madrasah Education Board.

· A. K. Chatterjee acted as the Director of Rabindra Mukta Vidyalaya after his superannuation from this college.

· J. B. Dutta and S. K. Ghosh acted as officers of Sishu Siksha Mission under Sarba Siksha Mission, launched by the Govt. of India, J. B. Dutta is a think tank and popular lecturer on educational topics.

Participation in Different Media

· Radio, TV, News papers and different journals have at different times, invited participation of different teachers (acting / superannuated) of this college. But the most noteworthy participant among them perhaps is Shyamal Ghosh (Geography) who after retirement from the college activity participated in the programms of different Bengali TV channels.

· Many contemporary issues of education of the state and nation have been discussed by our teachers over the Akash Bani and the Doordarshan.

Administrative posts under Govt. of WB.

· R. N. De of this college joined the very conveted post of Director of State Council of Educational Research and Training (SCERT), WB at a relatively early age.

· D.K. Chakraborty, Asst. Prof. Vice Principal and then Principal of this college acted as Joint Secretary, Govt. of WB, Addl. DPI of WB, Governor's Nominee in the WB College Service Commission and Member of Eastern Regional Council of National Council of Teacher Educaion, Bhubaneswar, Advisor of DPEP (District Primary Education Programme) in WB etc.

· K. Hajra acted as nodal officer of DPEP after his retirement from the services at this college.

· The present author joined as a Member of Public Service Commission, WB a few months before his retirement as a Principal of this college.

· The existing Principal Dr. P. K. Choudhuri, is also acting now as a member of the ERC of NCTE, Bhubaneswar in addition to his duties as a Principal. He gave his uncomprising leadership in countering the move of disapproval of the secondary teachers' training colleges of WB by NCTE, Delhi, when he was the Additional DPI (WB).

Popularisation of Science and Mathematics :

· All the teachers of science, mathematics and the geography departments of this college acted as resource persons in different programs of BITM (Birla Industrial and Technological Museum), Kolkata. Our students also participated in all those programs. BITM in its heydays depended heavily on the staff of this college.

· The Office of the (erstwhile) Field Advisor of NCERT launched different programs with the help of the teaching staff of this college.

· Dr. S. N. Giri with his colleagues and other associates opened the branch of All India Science Teachers' Association (AISTA) in Calcutta in 1976 and Centre for Pedagogical Studies in Mathematics (CPSM) in 1991. These two associations are still serving the best interest of Science and Mathematics Education of schools in WB and outside.

· Science teachers of this College acted as resource persons in different NGOs like Science Communicators' Forum (SCF), Jagadish Bose National Science Talent Search Scheme (JBNSTS), Indian Association of Physics Teachers (IAPT) and different Science Clubs of WB.

· IAPT, AISTA, BITM organized science activities under the patronage

of our college and our NSOU study center. The science students of our college have liberally attended all these programs and have been immensely benefited.

· M. K. Ray (student, 1954-55 and Asst. Prof. of this college, 1965-70 and Principal of Govt. T. T. College, Malda, 1970-75 and Govt. Training College, Hooghly, 1975-86) encouraged not only the students but also the science colleagues of his time.

Relation with SCERT, WB

· The predecessors of SCERT i.e. the Bureau of Educational and Psychological Research and the Extension Department were attached to this College prior to 1980. The collge always maintains cordial relations with SCERT which is housed in the same building. The present Director of SCERT, Dr. R. N. De, was in the college faculty for 14 years. The director immediately preceding him was Prof. Refatullah, a student as also a teacher of this college. When SCERT was under Higher Education Deptt. Govt. of WB, a no. of teachers of our college used to serve SCERT on a full time basis. SCERT always chooses resource persons primarily from our college for its different programmes / activities as outlined below :

- Population Education project
- SOPT (Special Orientation for Primary Teachers)
- Writing Radio Scripts
- Developing Teaching Learning Materials
- Orienting school Inspections
- Action Research
- Methods of Teaching Environmental Education
- Writing Manual for the Teachers
- Orientation of Primary Teacher Educators
- Different Workshops

Relation with School Education Deptt., Govt. of WB

· The existingt relation of DHTC (under the Higher Education deptt.) with the School Education Directore / Department is nominal. But before the sixties the bond between the two was highly strong. The teaching posts in this college and the post of Dy. Chief Inspector of schools were interchangeable. Both this college and the state schools were immensely benefited by this arrangement.

· The first Principal of this College Prof. William Griffith served the college for the second term. During the gap between the two terms, he served as Deputy Chief Inspector of Schools of Burdwan, a district of Bengal. There were many teachers who joined the college after serving as school inspectors and vice versa.

· There was a broad way between Victoria School (Dowhill, Kurseong, Darjeeling) and DHTC. Victoria teachers then had the status of senior tachers of Govt. colleges of Bengal / WB. The teachers of DHTC coming from Victoria made a lasting mark in the domain of teachers' training in Bengal / WB. Our first principal served Victoria for a brief spell of time. The teacher M. K. Ray had the background of Victoria School. In fact, the teachers of the teachers' training colleges having been enriched with school experience had in most of the cases made notable contributions to teachers' training.

Guidane of Ph.D. research

· Teachers of DHTC have shown profound interest in research on Education and Psychology, R. Das (Principal, 1977-1989), S. N. Giri (Teacher, 1966-1999), A. K.Chatterjee (Teacher, 1969-2004) successfully guided Ph.D. students. Following the instances of those seniors, the present author also jumped on the bandwagon and sucessfully guided Ph.D. research, J. C. Dasgupta (Principal, 1959-1970), D. D. Mahanto (Principal, 1972-77) and some predecessors were engaged in research works in Education, Psychology, Linguistics, Guidance and Counseling, Evaluation and in other projects initiated by the college. It may be remembered in this connection that the college had ample scope of research before 1970 through its different wings. Vocabulary wing, Bureau of Education and Psychology, Extension Deptt. etc.

· Research Articles written by our teachers at different times can be found in local, national and international journals of Education. Science Education, Mathematics Education, Chemistry Education, Physics Education, Evaluation etc.

· The present author guided M.Ed. dissertations under different universities outside WB. And also examined Ph.D. theses of the universities outside WB.

Services of Extension Deptt. and IASE of DHTC :

· David Hare Training College and three other T. T. colleges of WB had Extension Deptt. which used to organize seminars, workshops or invite lectures for the 'in service teachers' of WB. Local educationists, field Advisors of NCERT, Experts from NCERT and others used to serve as external resource persons in the said Extn. Deptt. Through this Deptt. DHTC reached a vast number of school teachers, inspectors, headmasters etc. This Deptt. ceased to operate after the establishment of an independent state body i.e SCERT in 1980. N. L. Basak and B. B. Bhattacharya, the two renowned professors, served as coordinators of the extension deptt.

· The function of the Extention Deptt. has been revived in the college in a modified form with different objectives and dimensions. The modified function relates to the IASE (Institute of Advanced Studies in Education) which started in our college in 1995 and began its regular activities for 'in-service teachers'

from 2007. IASE has already organized workshops on 'Quality Teachers' Training, 'Pedagogical Analysis' etc. for the teachers.

Miscellaneous

- DHTC used to organize all the seminars, meetings and workshops in WB, hosted and financied by NCERT / RCE. Bhubaneswar / NCERT field Adviser, Calcutta.
- WB Govt.'s Information Deptt., Health Deptt. PHE Deptt. has so far organized a number of seminars at this college in connection with different public awareness programs.
- Hardly any boys' school in WB. will be seen without any alumni from DHTC.
- The Govt. Schools of WB and more particularly of Kolkata are very much associated with this college. It is well known that most of the teachers of these schools were the product of David Hare Training College.
- In all the affairs of teachers' training in the by gone days it was the practice to consult the principal of DHTC. In fact the principal enjoyed a very special status in WB or India in comparison to the principals of other T T colleges.
- DHTC organized the M.A. (Edn) course before 1960. The PG classes were revived in 2002 when M.Ed. course was started in the college. The objective of the course was to supply adequtely qualified teacher educators in teachers' training colleges.
- A few books written by the teachers of this college for the students of high and higher secondary schools and for the secondary teacher trainees have enjoyed a very large market over the last thirty years. The college has extended its services to students of different local schools to prepare projects for NSTS (National Science Talent Search Scheme) and for exhibition under BITM.
- N. L. Basak and D. D. Mahanto rendered pioneer service to teachers' training colleges set up at Burdwan and Malda respectively. Both of them are well known figures in the spheres of in-service teachers' training. Mohanto will be ever remembered for his thorough and meticulous approaches in the problems of teachers' training.
- DHTC set a standard before the schools and other training colleges of our state.
- DHTC under the leadership of Dr. D. K. Chakraborty and his associate Dr R. N. De organized computer literacy in Kamala Girls' School for the school teachers and students of Calcutta. He made study on the under privileged students of Primary Schools of Bankura under DPEP in WB.

- The present author under the initiative of Mrs. Mrinalini Dasgupta (a great teacher educator of WB) popularized science kits among the primary school teachers of Calcutta.

- The present author also popularized simple and scarp materials as teaching aids / materials for experiment for teaching Science in schools (more particularly the rural schools). He demonstrated this idea among different organizations like Secondary schools of WB, B.Ed. Colleges of WB, Women's Association of Bengal etc.

- A large number of research scholars in Education of different universities has been amply benefited from the library of this college. The college library is a mine of classic books on Education and it may be easily considered as a heritage library on teacher education in Bengal.

- DHTC always excellend in teachers' training on English since its inception. In the beginning the British Professors used to impart teachers' training on English method and major effort of the college was always directed to it. Even after independence the college had, most of the time, two English teacher educators. Training on science and geography rose to the pinnacle during the period of M. K. Ray and Lokesh Chakraborty respectively. Dr. A. K. Chatterjee with his wide experience presented meticulous training ingredients for the trainees of life science and helped develop new Life Science departments in other training colleges.

- DHTC through its erstwhile deptt. "Psychological Bureau" developed a no. of tests concerning school education as per prescription of the Secondary Education Commission (Mudaliar Commission), 1952-53. Even now the college occasionally receives letters with requests to send the tests developed by the college. (Unfortunately they could not be traced in the college. The psychological bureau retained them at the time of separation from this college, during 1967). However the college has a large collection on Psychological materials.

- David Hare Trg. College did not sponsor the Teachers' Training under the ideals of 'Naitalim' a training programme that basically originates from the Indian soil . The college, however, emphasized an all- round development of training programme under its jurisdiction by providing wood works, art, music and physical education for all the trainees. The directors of physical education of this college proved themselves as the good organizers in the play grounds of EDEN or YUBA BHARATI. Our last full time art teacher, S. Mukherjee (popularly known as Santida) organized exhibitions in Art College. Sri Goutam Pal, a talent among the non teaching staff of this college, has proved his ability as a champion of art and illustrated the text books of different education boards of the state.

Potentiality of the College

The college building is located in south Kolkata standing on nearly 10 acre of land mostly open and is easily approachable from all corners of Kolkata. It has also vast resources to qualify itself as a deemed university for teacher education. The Education departments of different state universities of WB are now preoccupied with growth and development of EDUCATION subject (Pass / Honours) introduced in general degree colleges (affiliated to them) at the cost of Teachers' Training Colleges. Teacher Education is the applied part of education. Hence there should be a separate department of Teacher Education (like Applied Physics, Applied Chemistry of Applied Mathematics Departments) in a university. The state universities are already heavily burdened So DHTC, a very old college, may be entrusted to give leadership to all teachers' training colleges (at least the Govt. Teachers' Training Colleges) of the state, by properly utilizing its potential. If universities on law, animal husbandry, fishery are possible, it is not impossible to set up a university on teacher education.

Observation and suggestions

- The golden era of DHTC began to decline since 1967 and the decline was complete by 1980. During the period some very prestigious offices were gradually detached from the college as a result of which it was converted into a just BT / B Ed College. Consequently, DHTC had to share common platform with other T T Colleges of WB, numbering beyond 75. It looked a dwarf in the procession of NIE, NIEPA, NCERT, RCE and RCE and Education Departments of different universities of WB. The college regaind some of its lost ground when IASE and M.ED. courses were introduced in the college. There was further elevation when M.Phil. under NSOU started in the college in 2004.

Fortunately a process has now started to regain at least a part of the pristine glory of the college wants to move forward the authorities should examine whether the following are at all necessary to achieve the desired goal :

- More involvement of the college in educational research with necessary publications.
- Arranging more seminars and orientation programs
- Keeping more contact with the practising schools
- Keeping contact with other training colleges
- Inviting different educational experts on different occasions
- Utilizing Govt. fund more judiciously and economically
- Arranging more space for college works
- Economical use of existing floor and wall spaces
- More systematization, regularity and punctuality in the college works

- More contact with the alumni
- More cooperation among the teaching and non teaching staff of the college
- More enrichment of the college library
- Preservation and utilization of old books for research purpose
- Adequate number of quality based periodical tests
- Increase in the number of working days
- More planning to compensate the services of teachers sent on duty or on deputation
- More outreach activities
- More security of the college
- Abolition of public thorough fare from the college
- Exclusive use of college campus by college itself particularly during its working hours
- Renovation of dilapidated buildings
- Unholding the heritage status of the college
- Necessary cooperation with local schools under the projects of ASP net of which DHTC is a member (Our college is a member of Associated School Project net- a UNESCO Project).

TASK AHEAD

The present faculty members of the college are brilliant in their academic careers. Some of them are highly experienced Teacher Educators with remarkable contribution in the domain of Teachers' Training it is incumbent upon them to work hard together with all concerned to achieve THREE desired goals (1) Heritages status of the college, (2) Up gradation of it as a Teachers' Training University of our state and (3) Elevation of the college to the status of Institute of National Importance.



শতবর্ষ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন সম্মাননীয় অতিথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী আশিস কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

SOME SNAPSHOTS OF REMINISCENCES AROUND DAVID HARE TRAINING COLLEGE

—Dilip Kumar Sinha

It is far from being a cliché to say that David Hare Training College (DHTC) has acquired a unique historicity of its own. Any exercise on going back on its past should bring out commonalities and mutualities between DHTC and other organisations, not simply of the same genre. DHTC must have been born with the purpose of providing teacher education to practising teachers or perhaps, a few possible new entrants to the teaching profession. One could have expected a replica of other institutions of Great Britain, because of, obviously of the alien rule. Like many institutions, started under the aegis of the Government at that point of time in Calcutta (the then capital of India), an alien closeness, for a certain period, could have found justification. That there was a need for teacher education catering to teachers of schools could be felt, long before the University of Calcutta could go off within its own department of teachers' training. This somewhat resembles the phenomenon of what Presidency College, a Government College, undertook well ahead of what the University of Calcutta could step in the realm of instruction at the post-graduate level. The Teacher Diploma (TD), for reasons of functionality, was taken as the hallmark of acquisition on teacher education from abroad; of course, this did not show off a sort of hierarchy as Oxonian or Cantabridgian degrees could put up then in the educational arena.

The above lines bring out, in some way, my perception of what could be the ambience and presumably, the rationale of DHTC. But any glance at its glorious history shows a remarkably, distinctive character that was envisaged at the time of its origin. My perception is all the more reinforced because of my father's description about the College and the leadership it enjoyed since the forties. My father, Dr. Bishnupada Sinha, an alumnus of DHTC, to my understanding, was not highly enamoured of the then B. T. degree, but certainly had fascinating impressions about the leadership of the College. As I remember now, he came in contact with the Principal of his time, Professor Apurba Kumar Chanda of IES. It may seem now somewhat amazingly enigmatic why Professor Chanda, an educational and cultural luminary and an Oxonian, too, could be the Principal of DHTC. As my father used to say, his tenure at DHTC didn't just come up as a spinoff of ritual(s) of transfer in government services, but, on the contrary, according to him, a genuine venture, on the part of the educational leadership at that point of time, to provide a different kind of complexion to inputs of educaitonal pursuits in DHTC. My father also spoke about another Principal Dr. K. D. Ghose, who was not only a distinguished scholar in English but could push firmly through his thoughts and convictions on education in DHTC, perhaps because of his exposure to TD in London. My father could, also be effusive about

Dr. Ghose because of the nuances and styles of experiments which Dr. Ghose undertook while preparing textual stuff in English. One might often be tempted to compare this to the beginning of teachers' training department in the University of Calcutta by its Vice-Chancellor Dr Shyama Prasad Mookerjee, who did rope in an outstanding person in the area of Geography, Dr S P Chatterjee, as the leader of the new department, mainly because of his holding a TD from London. One can cite a number of names having such professional degrees and associated with DHTC. At a later point of time, one ought to remember the great services put in by Principal D N Ray, who had his initial degree in Applied Mathematics from the University of Calcutta, followed by a TD from London. So is the case with many figures, for example, Dr J C Dasgupta, a brilliant psychologist, having moved over to educational psychology; the contribution of Dr R C Das holding a Ph. D. from London University on Industiral Psychology should also be mentioned. I must recall the interactions with them through our Summer Institutes at Jadavpur University.

One of the edges, I think, DHTC has had, over the decades, is its Educational and Psychological Research Bureau dealing essentially with psychology as well as having intimate overlaps with subject areas. I could witness, on my own, a worthwhile mobility of faculty between formal training department of DHTC and this research wing of DHTC. I consider this to be a distinctive characteristic of DHTC that has enabled it to carve out a niche in the domain of teacher education. The present SCERT can be taken, perhaps incontestably, an upshot of this mix-up, rather a symbiotic endeavour between teaching and research in educational areas.

My father's connection and my own connection with DHTC are obviously of different strands. My father being a teacher of English, hardly severed his academic pursuits that used to happen in the premises of DHTC. Personally, I can well recall the contribution of DHTC on the teaching of English about which there is a furore nowadays. The British Council of Calcutta took initiatives way back in fifties to organise programmes intended for sensitizing teachers on new trends in teaching English and used to provide the benefit of requisitioning experts from England in such exercises. I do remember occasions where such collaborative ventures between DHTC and the British Council could provide many teachers of English, specially the forward-looking ones, to go in for such exposures on the recent ways of teaching English, specially through 'direct methods'. As I remember now, in particular, the name of Mr. Bruton from U. K. as the initiator of such enterprises. The West Bengal Board of Secondary Education, I ought to remember, was earnest in restructuring instructional elements on the basis of the essence of what used to be deliberated in such programmes of DHTC. If I remember it well, there used to be a plethora of such activities in DHTC, which I could also perceive through the experiences of two elders of my family, namely, my father and my first maternal uncle, Shri Krishna Sadhan Dutta, both of whom were not only active participants but great enthusiasts about the possibility of reforms in

English teaching and learning. Both of them, being alumni of DHTC, used to speak well of Ballygunge Government High School that served as a model school linked with DHTC, a laboratory-like phenomenon rarely visible here nowadays. It is a matter of history that such enterprises in DHTC were really the precursors of similar activities elsewhere in different parts of India, certainly leading to the origin of Central Institute of English and Foreign Languages at Hyderabad. The memories of many members of the faculty of DHTC, for example, Prof. B Bhattacharya, Prof. Lokesh Chakravorty still cling to me, because of their intimacies with my father.

So far as mathematics teaching is concerned, I must wax eloquent on the contributions of DHTC in allowing mathematics teaching to acquire the dimension of mathematics education. Professor A K Gayen's classic efforts on Achievement Tests, of course, with the support of Ministry of Education, Government of India, should be gratefully remembered, as the bulk of his work had its basis in DHTC. I reember few personalities like Principal Dibakardas Mahanta and Professor K P Chowdhury who, although initially belonging to the Research Bureau, took over the reins of the College and the new department of teacher education at Kalyani University respectively, with visions for innovation in institutions of this sort.

I shouldn't forget the birth of our organisaion, Association for Improvement of Mathematics Teaching (AIMT) in 1971 in the premises of DHTC, with its full support and cooperation. The first Annual Conference was also held there followed, later on, by several academic activities on mathematics education. These unleashed a variety of connectivities between AIMT and DHTC.

I ought to end up with some humble remarks about where we ought to situate DHTC in the realm of educational endeavours. Professionalism has come to stay, whatever be the field of pursuits. Teaching as a profession, not in a way glaringly linked with commercialisation, has to flourish in the context of contemporary times. There has never been no dearth of educators, as evidenced by history and perhaps, historiography, on education. Universal accessibility of primary and secondary schooling cannot but be taken as something to be dispensed with. Like the must vexed BPL, one is often alarmingly distressed even now to find analogous labels in fields of education, in some segments of the society. Despite this, there is a continuing evolution of educational thoughts and practices. On the occasion of the centenary of DHTC, one should remember not only the peers but educational pioneers who strove for advancement of the nexus between teaching and learning. One shouldn't nowadays afford to take 'love of learning' as the simple motivation of our illustrious and silent pioneers; perhaps love of humanity enshrined in some communities must have emboldened them in steering their long journey towards enlightenment. They could, thereby, leave generations of pedagogical descendants who ought to be receptive to frontiers of innovation and excellence. The centenary of DHTC should stand out as a singularly distinguishable occasion for bringing to the fore the names and contributions of its beacons, as stimuli to move ahead.

নানা রঙের দিনগুলি

—হরিপদ মণ্ডল (১৯৫২—৫৩ শিক্ষাবর্ষ)

ডেভিড হেয়ারের নির্বাচনী পরীক্ষাটা সহজ ছিল না। তাই মনে আছে বেশ ওখানে নির্বাচনী পরীক্ষা দিতে গিয়ে একটি মজার কাণ্ড করেছিলাম। লিখিত পরীক্ষার শেষের দুদিন হল সাক্ষাৎকার পর্ব। নীচের তলায় অধ্যাপকদের বসবার ঘরের সামনে যে দলটিকে আহ্বান করা হয়েছিল, আমি ছিলাম তার মধ্যে। আমার সাক্ষাৎকার নিলেন দু'জন অধ্যাপক ও দু'জন অধ্যাপিকা। 'আপনি গান জানেন?' হ্যাঁ। কিন্তু এই উত্তর ছিল কেবলমাত্র স্মার্টনেস দেখাবার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন ঃ 'একটা যে কোনো গান গাইতে পারেন?' 'এখুনি?' 'হ্যাঁ, এখুনি এইখানে।' স্মার্টনেস তখন ডুবু ডুবু। শেষরক্ষা করি কি করে? মন্ত্রচালিতের মতো আমার গলা দিয়েই পরিষ্কার সুরে বেরুল—

'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে পাগল আমার মন জেগে ওঠে।'

কি করে আমার গলা দিয়ে গান বেরিয়ে গেল মা সরস্বতী জানেন। আর একজন অধ্যাপক তখনও ছাড়লেন না। তাঁর প্রশ্ন, 'Have you got any other hobby?' আমার উত্তর, 'O yes, I have, I can play on Tabla.' আরও কিছু প্রশ্নের পর 'আচ্ছা, ঠিক আছে' বলে অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা আমায় নিষ্কৃতি দিলেন। নিষ্কৃতি এইজন্যে বলছি যে, যা ঘটেছিল সবই 'ডেভিড হেয়ারের' সাক্ষাৎকার মাহাত্ম্যে। উল্লিখিত কোনো বিষয়ের কোনো দক্ষতা কোনোকালেই আমার ছিল না। দিনটা ছিল ১৯শে এপ্রিল, ১৯৫২। শনিবার। কিন্তু আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছিল। দোসরা জুলাই কলেজে ভর্ত্তি হয়ে কয়েক দিন পর থেকে যথারীতি ক্লাসে যোগ দিয়েছিলেন। সেটা ছিল ১৯৫২ সাল। ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ তখন ছিল সহশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান। মহিলারা দিনের প্রথম ভাগের ক্লাস করতেন হেস্টিংস হাউসে যেখানে এখন পৃথক মহিলা ট্রেনিং কলেজ (Institute of Education for Women)। তারপরের বাকি ক্লাসগুলো ছিল মিশ্রিত—ডেভিড হেয়ারের মূল বাড়িতে হত। ওঁরা সব কলেজের গাড়িতে এসে যেতেন টিফিনের সময়।

আমাদের হস্টেল ছিল কলেজের গায়েই, এখন যেটা মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষামূলক গবেষণা বিভাগ (Bureau of Educational & Psychological Research)। আমার স্থান হল দোতলার একটা দু-সীটওয়ালা ক্ষুদ্র কক্ষে। হস্টেল সুপার ছিলেন ভাইস প্রিন্সিপ্যাল শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি আজ আর আমাদের মধ্যে নাই। যেমন আরও অনেককে হারিয়েছি; হারিয়েছি আমাদের অধ্যক্ষ ডঃ ক্ষেত্রপাল দাস ঘোষকে যাঁর লেখা 'বাণী রীডার' এবং 'এ সেকেণ্ড বুক অব ট্রান্সলেশন' স্কুলের ছাত্র হিসাবে পড়ে নামটা হৃদয়ে অনেক আগেই গেঁথে রেখেছিলাম। পরে যাঁর কথা মনে আসছে তিনিও স্বনামধন্য অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়। উনি প্রথমে ডেপুটি চীফ ইন্সপেক্টর হিসেবে একবার আমাদের স্কুলে গেছিলেন, এবং আমার ক্লাসও দেখেছিলেন বছরখানেক আগে। যখন ওঁর টিউটোরিয়াল গ্রুপে ঢুকলাম, তখন আশ্চর্য হলাম উনি আমায় চিনতে পারলেন দেখে। সুবচনীবাবুর কথাও আমার বেশ মনে পড়ে।

প্রথম কয়েক দিনের মধ্যেই যে জিনিস আমাদের আশ্চর্য রকমে মুগ্ধ করেছিল, তা হল এই কলেজের অননুকরণীয় নিয়মশৃংখলা। অদ্ভুত শান্ত পরিবেশে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সকাল দশটায় ক্লাস আরম্ভ এবং পাঁচটায় শেষ হত। অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, ছাত্রছাত্রী, অফিসের কর্মচারী পিয়ন সকলেই যেন এক ডিসিপ্লিনে বাঁধা, কাউকে বেশি কিছু বলা বা হাঁক ডাক করার দরকার হচ্ছে না। যে যার কর্ত্তব্য

করে চলেছে হাসিমুখে—অতৃপ্তি বা অস্বস্তির ছাপ কারও মুখে নাই। অধ্যক্ষের সঙ্গে দুদিন দেখা হত সপ্তাহে। দুটি সম্মিলিত সাধারণ ক্লাস নিতেন ২৮৭ জন ছাত্রছাত্রীর। ক্লাস দুটি হত বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুলের হলে। অধ্যক্ষের বক্তৃতা সব সময় হৃদয়গ্রাহী না হলেও তাঁর ইংরাজীটা ভালো লাগত। আর ভালো লাগত তাঁর সাহেবি রুচি-বোধ। সর্বোপরি কলেজের নিয়মশৃংখলার প্রতি সর্বাধিক প্রযত্ন তাঁকে যথার্থই কলেজের উজ্জ্বলতম রত্ন করেছিল; বলা যায় তিনি তখন প্রশিক্ষণ জগতের এক প্রবাদপুরুষ।

নির্দিষ্ট রুটিনের সঙ্গেও আমাদের করতে হত খেলাধুলা। তাছাড়া ছিল ছবি আঁকা, গান শেখা, হিন্দী শেখা, ফার্স্ট-এড্ ক্লাসে যোগ দেওয়া। ছাত্রছাত্রী উভয়দলের পক্ষেই এরূপ ব্যবস্থা ছিল। ব্যাপারগুলি করুণ হয়ে দাঁড়াত যখন চুল-পাকা আধাপাকা কিছু প্রৌঢ় ছাত্র—যাঁরা স্কুল থেকে ডেপুটেশন নিয়ে ট্রেনিং-এ এসেছিলেন—এই সবে অংশগ্রহণ করতেন, যাঁরা কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের অনেকের থেকেই বয়সে বড়। বি.টি. পড়ার সেই আদি উন্মাদনার যুগে বয়স্ক-বয়স্কারা অনেকেই এসেছিলেন। আমরা তো ছিলাম তরুণদলের নীচের থাকে। শিক্ষকতায় সবে হাতে-খড়ি। তাই ট্রেনিং কলেজও ছিল আমাদের কাছে সাধারণ কলেজের সম্প্রসারণ। আমাদের হাসি-উচ্ছলতার অভাব হয়নি। আর এই কলেজের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে ট্রেনিং এর নীরসতা কেউ অনুভব করত বলে মনেও হত না।

আমাদের পুরুষ বিভাগেও ছিল এ. বি. সি. তিনটি বিভাগ। প্রথম চার পিরিওডের পরেই বিষয়ানুযায়ী মিশ্রিত সহশিক্ষার ক্লাস। মহিলাদের আসাটাই ছিল একটা বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যাপার। অধ্যক্ষমশাইতো ছিলেন সহশিক্ষার মস্ত বড় অ্যাডভোকেট। এমন কি তিনি আমাদের পুরুষ বিভাগের জন্যও ইংরাজীর অধ্যাপিকা নিয়োগ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। এই অধ্যাপিকার নাম শ্রীমতী শকুন্তলাকংকন মিত্র। ওঁর ইংলিশ রচনা লেখার গ্রুপে আমি ছিলাম এবং নিতান্ত অনুরক্ত ছাত্র ছিলাম বলে উনি আমায় খুব মনে রেখেছিলেন। লক্ষ্ণৌর মেয়ে—হিন্দভাষিণী; পরে কলেজে হিন্দী নাটক অভিনয়ের উদ্যোগে আমায় অংশ নিতে আহ্বান করেছিলেন; যদিও আমি হিন্দী নাটকে অংশ গ্রহণ না করে বাংলা 'অতিথি' নাটিকায় অভিনয়ে যোগ দিয়েছিলাম। পীযূষ চ্যাটার্জি (বর্তমান অধ্যক্ষ, রহড়া পি. জি. বি.টি. কলেজ) সেইসময় আমাদের উৎসাহের অগ্রদূত ছিলেন, যিনি কলেজের প্রাচীর পত্রিকা 'সংহতি' প্রকাশনারও ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। আমাদের নাটিকা ছিল পুরুষ-মহিলা মিশ্রিত অর্থাৎ স্ত্রী ভূমিকা অবর্জিত। অধ্যক্ষের অনুমোদিত কলেজে ছাত্রছাত্রীর মিলিত অভিনয় তখনকার দিনে পুরানপন্থীরা সমালোচনা করতেন; কিন্তু আমাদের অভিনয় দেখে তাঁরা আবার নির্দ্বিধায় বাহবা দিতে ভোলেননি। সহাধ্যক্ষ হেমবাবু, অধ্যাপক নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত এবং অধ্যাপিকা নলিনী দাস, অধ্যাপিকা লতিকা ঘোষ, অধ্যাপিকা শান্তি দত্ত—এরূপ কয়েকজনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ পরিচয়ের সুযোগ এসেছিল নানা কর্মসূত্রে। পড়ানোর জন্য সর্বাধিক মুগ্ধ করেছিলেন আমাকে নরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, ডি. এন. রায় ও শ্রীমতী নলিনী দাস। কিন্তু সকলের ক্লাসেই আমার সমান আগ্রহ থাকত। শ্রী জে. এন. দাসগুপ্ত ও শ্রীমতী প্রতিভা গুপ্ত পড়ানোর সূত্র ধরেই নিজেদের ব্যক্তিগত বা পরিবারগত কিছু কথা প্রায়ই বলে চমক দিতে চাইতেন; এতে আমরা ছোটরা কিছু বিশেষ না মনে করলেও দাদারা কিন্তু বাঁকা চোখে মুচকি হাসতেন। একটানা ৯/১০ টা ক্লাস করে ক্লান্তি আসত, কিন্তু ক্ষোভ থাকত না। বি. টি. পড়তে এসে যে এত খাটুনি খাটতে হয়, সে জ্ঞান আদপে ছিল না। অধ্যাপকরা কোনো কোনো সময় আবার এ মন্তব্য করতেন যে বি. টি.র জন্য দশমাস সময় নিতান্ত অবিচার—এটা এম. এ., এম. এস.-সির মত দু-বছরেরই কোর্স। কিন্তু কোর্স তো রেস কোর্সের মতোই রাউণ্ড দিয়ে ফিনিশ করতেই হবে। তার উপরে ছিল প্রদর্শনী পাঠদান, বিচার যোগ্য পাঠদান, পাঠটীকা এবং আসল পাঠদান। এর সঙ্গে আছে অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের সঙ্গে

সংযোগরক্ষা এবং বারোমাসে তেরো পার্বণের পালা। কলেজ লনের পশ্চিমধারের একতলা ঘরটাতে ছিল ক্যান্টিন; কোণে গ্যারেজের পাশের জায়গাটায় ছিল একটা চায়ের স্টল। টিফিন টাইমে বা ক্লাসের ফাঁকে মেয়েদের সঙ্গে বসে মিষ্টি খাওয়া টিফিন খাওয়ায় মজা ছিল। ক্যান্টিনটা চালাতেন আবার কয়েকজন উদ্বাস্তু মহিলা—ওঁরা দুপুরে আসতেন সন্ধ্যায় চলে যেতেন। পাশে কিছুদিন ভলি খেলার কোর্ট করা হয়েছিল, পরে ওখান থেকে হস্টেলের উত্তর পাশের ফাঁকা জায়গায়, এখন যেখানে হস্টেল ও অধ্যাপকদের কোয়ার্টার হয়েছে, ভলি-গ্রাউণ্ড করা হয়েছিল।

আমাদের প্রদর্শনী পাঠদান ও বিচার যোগ্য পাঠদান কখনো হত বালিগঞ্জে সরকারী বিদ্যালয়ে কখনো বা ওখানের ছাত্রদের তুলে এনে কলেজের ক্লাসঘরেই। বিচারযোগ্য পাঠদানের পর বিচার বিবেচনাটা বেশ মুখরোচক লাগত। পাঠদাতার সামনেই হত নানা মিষ্টিমধুর আলোচনা। ঐ বৈঠক শিক্ষানীতি, পাঠদান নীতির হদ্দমুদ্দ করে তবে ছাড়া হত। অবশ্য অধ্যাপকদের প্রদর্শনী পাঠদানগুলি সত্যিই চিত্তাকর্ষক ছিল এবং কি করে একটি ক্লাসের ৪০টি মিনিটের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা যায়, তার উদাহরণ তাঁরা ঠিকই রাখতেন। কোনো কোনো শিক্ষক-ছাত্রকেও দেখেছি অপূর্ব সুন্দর লেসন দিতে।

দশমাসের এই দ্রুতগামী ট্রেনিং বিদ্যাচর্চার মধ্যেও আট-দশটি চমকপ্রদ অনুষ্ঠান কলেজে আয়োজিত হয়েছিল। শিক্ষামূলক প্রদর্শনী, বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, নাট্যাভিনয়, পুতুল নাচ, ২৬শে জানুয়ারী, সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান—যাতে মাননীয় মন্ত্রী ভুপতি মজুমদার উপস্থিত ছিলেন, আবার ২২শে শ্রাবণের সান্ধ্য মজলিস, শিক্ষামন্ত্রী পান্নালাল বসু এতে পৌরোহিত্য করলেন এবং প্রধান অতিথি হয়েছিলেন ঔপন্যাসিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিনের শিক্ষামূলক ভ্রমণেরও আয়োজন করা হয়েছিল। ছাত্রীদের মধ্যে গানে বাসন্তী চৌধুরী ও অণিমা মুখার্জি এবং বক্তৃতায় কণক মুখার্জি (বর্তমানে এম-পি) সকলের হাততালি কুড়িয়েছিলেন। বাসন্তী দেবী পরে সঙ্গীতেই ডক্টরেট হয়েছেন।

কিন্তু গোটা কলেজের সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বি-টি বিভাগের প্রতিযোগিতার একটা মনোভাব প্রচ্ছন্নে এবং প্রকাশ্যেও কাজ করত। বিভাগীয়-প্রধান জে. এম. সেন এবং অধ্যক্ষ কে. ডি. ঘোষের মধ্যে একটা রেষারেষির কথা আমাদের বন্ধুমহলে ছড়িয়েছিল। দুজনেই তখন শিক্ষাজগতের, বিশেষ করে শিক্ষণ বিভাগের জ্যোতিষ্ক। শুনতাম জে. এম. সেন পরীক্ষার ফলাফলে বেশ শক্ত মনোবৃত্তি পোষণ করতেন এবং ডেভিড হেয়ারের ছাত্রদের একটু বাজিয়ে দেখতেন; কিন্তু কে. ডি. ঘোষ কলেজের প্রশাসনে অত্যন্ত দৃঢ়তা দেখালেও ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে শিক্ষাবিভাগ এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ে লড়াই করতেন। অবশ্য এসব উপকথায় আমাদের উল্লাস ছিল, কিন্তু পরখের প্রবৃত্তি ছিল না। তখনকার একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে মুদালিয়র শিক্ষা কমিশনের সদস্য-সদস্যাবৃন্দ আমাদের কলেজ পরিদর্শন এসেছিলেন ঐ সময় এবং শিক্ষক-শিক্ষণাদি বিষয়ে এখানে অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। মাননীয় অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য একটি সুন্দর অনুষ্ঠান করা হয়েছিল কলেজ প্রাঙ্গণেই।

১৯৫৩-এর এপ্রিলের দিকে অধ্যক্ষ মশাই একবার বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন। একদিন বিকেলে আমিও গেলাম কয়েক জনের সঙ্গে ওঁর মহানির্বাণ রোডের বাড়িতে। তাঁর অসুস্থতার উপরে উঠেও তিনি আমাদের স্নেহ সম্ভাষণ জানালেন। বাড়িতে একটা শান্ত নীরবতা বিরাজ করছিল। তাঁর সুরুচিপূর্ণ গৃহচ্ছবি দেখে আমরা তৃপ্তি পেলেও অধ্যক্ষের অসুস্থতায় মনে একটা ভারী ছাপ নিয়ে বাইরে চলে এলাম। এই সময় তাঁর বদলীর কথাও শুনছিলাম।

কেবলমাত্র বি. টি. পড়বার সময়েই যে—বন্ধুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল এবং সে পরিচয় পরে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল, তাঁদের কয়েক জনের নাম মনে আসছে যেমন—হরেকৃষ্ণ আদক, যদুপতি দাস, পীযূষ দত্ত, চিত্ত খাটুয়া, মণি মাইতি, রত্নেশ্বর মান্না, বিবেকানন্দ পাল, মদনমোহন সিংহ রায়।

আর যোগাযোগ না থাকলেও যাঁদের কথা স্পষ্ট মনে আছে, তাঁদের কয়েকজন হলেন বিষ্ণুপদ বর্মণ, নলিনীমোহন দেব, পরিতোষ দাঁ, গীতা জানা, সমর কোলে, আশুতোষ মাইতি, সুধাকৃষ্ণ মণ্ডল, জ্ঞান পড়্যা, ছবি রায়, রমা রায়, সীতা গাঙ্গুলী, সুলেখা মিত্র ও কণকরাণী রায়। কর্তব্যের আহ্বানে এবং সংসারের স্রোতে ভিন্ন ভিন্ন কর্মক্ষেত্রে আমরা যে যার ভূমিকাটুকু পালন করে চলেছি। পথ চলতে চলতে কেউবা হয়তো অদৃশ্য শক্তির কোলে চিরনিদ্রায় শান্তিলাভ করেছেন, তাঁদের সকলের সংবাদ সংগ্রহ করতে পারিনি আমরা। সেদিনের বন্ধু-বান্ধবীরা যাঁরা আছি, অনেকেই আজ প্রৌঢ়ত্বের সীমায়, আর কিছু আজকের দিনের তরুণ-শিক্ষাব্রতীদের উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে হয়তো বা পুরানো মরচেপড়া স্বপ্নগুলো 'রিনিউ' (নবীকরণ) করে নিতে প্ল্যাটিনাম প্যাভিলিয়ানে পা বাড়াচ্ছেন।

স্মৃতি সুখের, স্মৃতি বেদনার। বিদ্যা কেউ কাউকে দিতে পারে না, আবার ইচ্ছা হলেই নিতেও পারে না। এ পথেও কত ঋতুর কত বিবর্তন। কিন্তু একটি প্রতিষ্ঠান তার নানা রঙের দিনগুলির ভেতর দিয়ে নানা পর্দায় নানা সুর তুলতে পারে, দিতে পারে নানা বাস্তব অভিজ্ঞতার বেলোয়ারি ছোঁয়াচ। একটা ট্রেনিং কলেজ কীভাবে আমাদের পারিপার্শ্বিক বিচিত্র ছন্দোময় ও ছন্দোহীন উভয় জীবনধারাকে জানতে ধরতে আর যথার্থ পোষণ করতে, তার আলোকমালাকে সজীবতায় ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে তার কিছু গ্রহণযোগ্য সূত্র নিশ্চয়ই আমাদের কাছে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। ট্রেনিং মেথডগুলির ভালোমন্দ নিয়ে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের বিভিন্ন মতামত থাকতে পারে, কিন্তু এখানকার ট্রেনিং কি আমাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিটাকে মার্জিত করতে বা বদলাতে সাহায্য করেনি, সকলের ক্ষেত্রে সমান হয়তো বা নয়, কিন্তু অনেকের হিসাবে খাতায় অংকটা জমার ঘরে, এটা কি সত্য বলে মেনে নিতে কুণ্ঠা থাকে?

সেদিনের ট্রেনিং কলেজ এখন বহু শাখা প্রশাখায় প্রসারিত ও বিকশিত। এই কলেজ কেবল ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ গঠন ও বিকাশের নীতি পদ্ধতি শিক্ষা দিত না, যাঁরা শিক্ষক-শিক্ষণ-গ্রহণ করতে আসতেন, তাঁদেরও কেবল শুষ্ক নীতি পদ্ধতির জ্ঞান বিতরণ না করে সার্বিক গঠন ও আত্মবিকাশে সাহায্য করতে, পথ প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিল, এ বড়ো কম কৃতিত্ব নয়।

শিক্ষাগুরু মহাত্মা ডেভিড হেয়ারকে প্রণাম। আর স্মৃতির মণি-কোঠায় শ্রদ্ধা জানাই এই কলেজের শিক্ষক সকলকে, যাঁরা তাঁদের পুণ্য প্রয়াসে আমাদের হৃদয় হরণ করেছিলেন, যাঁদের স্পর্শে এই প্রতিষ্ঠান আমাদের আদর্শ Alma Mater.

ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, কিছু স্মৃতি

—খগেন্দ্রনারায়ণ দাস (১৯৫৪-৫৫)

১৯৫৪ সাল। খানাকুলের একটা স্কুলে শিক্ষকতা করি। তখনও দুবৎসর পূর্ণ হয়নি। তা সত্ত্বেও তখনকার নিয়মমতো জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের মাধ্যমে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করলাম। কিছু দিন পরে ইন্টারভিউর চিঠিও পেলাম। কিন্তু ইন্টারভিউর দিন কলেজে এসে তো চক্ষুস্থির। তখন কলেজ লনে কোনো বাগান ছিল না। বিরাট লন আবেদনকারিতে ভরে গেছে। ভিড়ের জন্য নোটিশ বোর্ডগুলির কাছে যাওয়া যাচ্ছে না। শুনলাম সরকার নাকি ঘোষণা করেছে একমাত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরাই ইনক্রিমেণ্টের সুযোগ পাবে। তাই ভর্তির জন্য এই ভিড়। যাক অনেক কষ্টে জানতে পারলাম ডেভিড হেয়ার ও বালীগঞ্জ স্কুল মিলে দশটি ঘরে লিমিত পরীক্ষা হবে। বিকালের দিকে বিভিন্ন ঘরে বাইরের প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা হবে। কলকাতার প্রার্থীদের পরের দিন মৌখিক পরীক্ষা হবে। যতটা মনে পড়ছে লিখিত পরীক্ষায় একটা রচনা লিখতে দেওয়া হয়েছিল। আর ছিল বেশ কয়েক পৃষ্ঠার পার্‌সন্যালিটি টেষ্ট। ওটা বোধ হয় ছিল সাইকোলজিক্যাল ব্যুরোর তৈরি করা। অল্প কিছু দিন আগে অধ্যক্ষ কে. ডি. ঘোষ বদলি হয়ে গেছেন। কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারলাম পরিবর্তন সম্বন্ধে সকলেই সচেতন। দারোয়ন শালীগ্রামতো বলেই ফেলল 'কে. ডি. ঘোষ যব থা তব কলেজকা রেলিং ভি কাঁপতা থা'। তখনও কলেজে অধ্যাপিকারা ছিলেন, আমার মৌখিক পরীক্ষা নিয়েছিলেন দুজন অধ্যাপিকা।

কিছুদিন পরে চিঠি পেলাম আমি ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছি। আমার স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন বি. টি. তে ইউনিভার্সিটির ছাত্র। তিনি বললেন, খগেনবাবু, ডেভিড হেয়ারে চান্স পেয়েছেন, ধরে নিন আপনার বি. টি. পাশ করা হয়ে গেছে। শুনে মনে মনে তখনই ডেভিড হেয়ারের জন্য খানিকটা গর্ব বোধ করলাম। ডেভিড হেয়ারে পড়তে পারব জেনে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে হল। ভর্তির চিঠির সঙ্গে কয়েকটি বইয়ের নাম দেওয়া ছিল। বলা হয়ে ছিল কলেজে যোগ দেওয়ার আগে যেন সম্ভব হলে বইগুলি পড়ে নিই।

১লা জুলাই বালীগঞ্জ স্কুলের অ্যাসেম্ব্লি হলে অধ্যক্ষ ডি.এন. রায়ের প্রথম বক্তৃতা। তিনি উঠেই বললেন, আমি এখন ভারতবর্ষের সব থেকে পুরানো ও সব থেকে নতুন ট্রেনিং কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সম্ভাষণ করছি। অআজ হেস্টিংশ হাউসে মেয়েদের জন্য Institute of Education for women-এর প্রতিষ্ঠা হল। অনেক আশা ছিল জীবনে প্রথম Co-education College-এ পড়তে পারব। কিন্তু প্রথম দিনই হতাশ হতে হল। অবশ্য যাদের বিজ্ঞান ছিল তেমন আটটি মেয়ে আমাদের সঙ্গে বিজ্ঞানের ক্লাশগুলি করত। আর মাঝে মাঝে দূর থেকে ভূগোলের মেয়েদের কাকলি শুনতে পেতাম। তখন বয়সের দিক থেকে বিচার করলে ছাত্রদের মধ্যেও বেশ বৈচিত্র্য ছিল। তাদের মধ্যে সদ্যপাশ করা ছেলে থেকে পঞ্চান্ন বছরের প্রৌঢ় পর্যন্ত সকলেই ছিল। তবে অধিকাংশেরই বয়স ছিল ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। এ থেকেই বোঝা যায় তখন স্কুলগুলিতে আনট্রেণ্ড শিক্ষকই বেশি ছিলেন।

অধ্যক্ষ তাঁর প্রথম ভাষণেই সারা বছরের কবে কী হবে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে দিলেন। বোঝা গেল এ বড় কঠিন ঠাঁই। সকাল দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত ঠাসা কার্যক্রম। এখানে ফার্স্টএড্, হিন্দী ও ফিজিক্যাল এডুকেশনের ক্লাস আবশ্যিক। প্র্যাকটিস টিচিং-এর ক্লাশ করতে হবে পুরো দুমাস। ষাটটা সুপার ভাইজড্ লেসন্ দিতে হবে। বুঝলাম এ ট্রেনিং এর সঙ্গে ঘোড়ার বা সার্কাসের পশুদের



মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী শ্রী সুদর্শন রায়চৌধুরী।

ট্রেনিং-এর কোন পার্থক্য নেই। আরও বুঝতে পারলাম যাঁরা 'বর্ন-টি চার' তাঁরা কেন ডেভিড হেয়ারে না পড়ে ইউনিভার্সিটিতে বি. টি. পড়তেন।

এবার ডেভিড হেয়ারের বিল্ডিং সম্বন্ধে কিছু বলা যেতে পারে। আগেই বলেছি তখন লনে কোনো বাগান ছিল না। লনের উত্তর ও পুবদিকে দোতলা বিল্ডিং ছিল। উত্তর দিকের বিল্ডিং-এর তিনতলাটি ছিল না। পুব দিকের দোতলায় এখন যেখানে ভুগোলের ক্লাশ হয় তখন সেখানে এ-সেকশানের ক্লাশ হত। নিচে ছিল অফিস, লাইব্রেরি ও স্টাফ্‌রুম। উত্তর দিকের বিল্ডিং-এর দোতলায় ছিল সাইকোলজিক্যাল ব্যুরো ও দু-একজন অধ্যাপকের বসার ঘর। নিচে ছিল বি ও সি সেকশনের ক্লাশ রুম আর দু একটি ছোট টিউটোরিয়াল রুম। লনের পশ্চিম দিকে যে বিল্ডিংটি রয়েছে সেখানে তখন একটা বেশ ভাল ক্যান্টিন ছিল। বালীগঞ্জ স্কুল ও ডেভিড হেয়ারের মধ্যে তখন নিবিড় ঘনিষ্ঠতা ছিল। স্কুলের অ্যাসেম্ব্লি হলটা কলেজের সভাসমিতি ও সোশলের জন্য ব্যবহার করা হত। বিজ্ঞানের লেবোরেটরিগুলিও ছিল স্কুলের একতলার পিছন দিকের ঘরে। বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডের একটি বাড়িতে আর্ট এণ্ড ক্র্যাফ্‌টের ক্লাশ হত। ওটাকে বলা হত কলেজ অ্যানেক্স। তখন অধ্যাপকদের কোন কোয়ার্টার্স ছিল না। হোস্টেল ছিল সার্নি পার্কে। আমরা দল বেঁধে বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড দিয়ে কলেজে আসতাম। সময়টা অপব্যবহার না করে আমরা হাঁটতে হাঁটতে প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতাম। হিন্দী কবিতা মুখস্থ করার ওটাই ছিল একমাত্র সময়। এখন যেখানে হোস্টেল হয়েছে তখন সেখানে ছিল খাটাল। জমি দখল করার জন্য আমরা কিছু দিন ওখানে ভলি বল খেলেছি।

বি. টি. পড়তে আসার আগে আমরা সকলেই অন্তত পনের বৎসর স্কুলকলেজে পড়েছি। কিন্তু মাত্র দশ মাসে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের প্রতি যে ভালবাসা ও অধ্যাপকদের সঙ্গে সে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার কোন তুলনা হয় না। অধ্যাপকদের অনেকেই তাঁদের মধুর ব্যবহার এবং পাঠদান সম্বন্ধে সুচিন্তিত নির্দেশ দানের মাধ্যমে আমাদের মনে স্থায়ী দাগ কেটে ছিলেন। আমরা পেয়েছিলাম গণিত ও বিজ্ঞনের অধ্যাপক সুবচনী প্রসাদ মুখার্জীকে, ভুগোলের অধ্যাপক লোকেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে ইংরেজির অধ্যাপক নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্যকে এবং বাংলার অধ্যাপক সুধীর রায়কে। অধ্যাপক দিবাকর দাস মহান্ত নতুন এসে আমাদের চিত্ত জয় করে নিয়েছিলেন। অধ্যাপক জে. পি. মিত্রেকে চিরকাল মনে থাকবে তাঁর রসিক সুলভ স্বভাবের জন্য। টিউটোরিয়াল ক্লাসে তাঁর বলা গল্প ট্রেনিং কলেজের প্রত্যেক অধ্যাপকের জানা দরকার। একদিন ক্লাসে এসেই তিনি বললেন 'আর আপনাদের কী পড়াব? কেবল একটু মুলো ঠুকতে পারি।' গল্পের গন্ধ পেয়েই আমরা জানতে চাইলাম মূলো ঠোকা কী? তিনি তখন গল্পটি বললেন। এক কর্মকারের কাছে একটি ছেলে কাজ শিখত। কিছু দিন পরে সে অন্য জায়গায় চলে গিয়ে বেশ ভাল কাজ শেখে। দেশে ফিরে এসে সে পথের ধারে একটি বড় কামান বানিয়ে রাখে। একদিন বাজার থেকে ফেরার পথে সেই আগের কর্মকার কামানটি খুঁটিয়ে দেখে বললে, "কামানটায় দুএকটা ত্রুটি রয়ে গেছে, আমি ঠিক করে দিচ্ছি। এই বলে সে হাতের মুলো দিয়ে কয়েক জায়গায় ঠুকে দিল। গল্পটি বলে অধ্যাপক মিত্র বললেন, 'আমরাও শুধু মুলো ঠুকতেই পারি।'

তখন অধ্যাপক রুদ্র ও অধ্যাপক পালিতের মত প্রেসিডেন্সি কলেজের কয়েকজন বিখ্যাত অধ্যাপক বিজ্ঞানের 'কনটেন্টস' পড়াতে আসতেন। তাঁদের পড়ানোর কায়দায় বিষয়গুলি আমাদের কাছে নতুন মাত্রা পেয়েছিল। একজন অধ্যাপক এত সুন্দর অ্যাস্ট্রনমি পড়াতেন যে আমরা সকলেই আকাশ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠি এবং অনেক নক্ষত্র চিনে ফেলি।

প্র্যাকটিস্ টিচিং-এর গুরুত্ব তখন অনেক বেশি ছিল। টানা দুমাস ক্লাস নিতে হত এবং অন্তত ষাটটা সুপারভাইসড্ লেসেন্ দিতে হত। প্রত্যেক দিন বিকাল বেলা কলেজে এসে পরের দিনের লেসেন নোট অ্যাপ্রুভ করিয়ে নিতে হত। এসময়ই অধ্যাপকদের কাছে আসা যেত এবং তাঁদের সুচিন্তিত মতামত জানা যেত। নবম শ্রেণীর গণিতের লেসেন নোট দেখতেন অধ্যাক্ষ রায় নিজে। আমরা যারা হোস্টেলে থাকতাম তাদের প্রায়ই আটটা পর্যন্ত অধ্যক্ষের ঘরে বসে থাকতে হত। ক্লাসে পড়ানো নিয়ে মাঝে মাঝে বেশ কঠোর মন্তব্য শুনতে হত। তবে কখনও কখনও মজা যে হত না তা নয়। একদিন আমার টিফিনের পর ষষ্ঠ শ্রেণীতে বিজ্ঞান ক্লাস ছিল। এ সময় সাধারণত সুপারভাইজার আসেন না বলে আমার প্রস্তুতিও ছিল না। হঠাৎ দেখি মিশ্রজী এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি রঙিন চক্ আর ডাস্টার নিয়ে ক্লাসে গেলাম। বোর্ডে এক প্লেট খাবার এঁকে তীর চিহ্ন দিয়ে লিখলাম ক্ষয় পূরণ, বৃদ্ধিসাধন ইত্যাদি। মিশ্রজী ভাল হাতের লেখা বাংলা পড়তে পারতেন। আমার আঁকা দেখে তিনি খুব খুশি। প্রশংসা করে একপৃষ্ঠা মন্তব্য লিখেছিলেন, কলেজের পরীক্ষার খাতা দেখা নিয়ে ও মজা হত। আমাদের এক বন্ধুর মেথড পেপার ছিল প্রাইমারি এডুকেশন। একবার পরীক্ষায় সে চার নম্বর খাতার ৬৪ পৃষ্ঠাই উত্তর লিখেছিল। মাঝে মাঝে সানি পার্কের রাস্তার দু ধারের সাহেবদের নামে তিন চার লাইন করে উদ্ধৃতি দেওয়া ছিল। বন্ধু টি নম্বর পেয়েছিল পঞ্চাশে চল্লিশ।

ডেভিড হেয়ারের ঠাসা পঠনপাঠনের কর্মসূচীর মধ্যেও খেলাধূলা ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক বধুবার বেলা একটার পর বালীগঞ্জ স্কুলের অ্যাসেমব্লি হলে গানবাজনা, আবৃত্তি, বিতর্ক প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকত। সবচেয়ে গুরুত্ব ছিল বাৎসরিক অনুষ্ঠান ও পুনর্মিলন উৎসবের। এক সপ্তাহ ধরে প্রদর্শনী খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলত, শেষ হত পুনর্মিলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। কলেজের লনে টেবিল সাজিয়ে রিইউনিয়ান টি-র ব্যবস্থা হত। খাবারের প্যাকেটটা বেশ বড়ো থাকত। টি বোর্ড থেকে গাড়ি এসে সুদৃশ্য কাপে চা পরিবেশন করত। সন্ধ্যার সময় অ্যাসেমব্লি হলে রিইউনিয়ন মিটিং-এর আয়োজন করা হত। ওটা ছিল কতকটা অফিশিয়্যাল অনুষ্ঠান। প্রথমেই জেনারেল সেক্রেটারি রিপোর্ট পড়তেন। তারপর থাকত 'ওল্ড বয়'-এর দীর্ঘ স্মৃতিচারণ। মিটিং শেষ হত সভাপতি হিসাবে অধ্যক্ষের ভাষণ দিয়ে। সব শেষে থাকত প্রাক্তন ছাত্রদের নাটক।

আমার নিজের শিক্ষাবর্ষ বলেই বলছি না। সে বছর ডেভিড হেয়ারে উৎসাহী ছাত্রদের একটা জোয়ার এসেছিল। সে জোয়ারের রেশ ছিল পরের বছরের রিইউনিয়নেও। আমরা কলেজের চিঠি বা বিজ্ঞপ্তির অপেক্ষায় না থেকে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে প্রায় সকলেই রিইউনিয়নে এসেছিলাম। আমাদের শিক্ষাবর্ষের কৃতী ছাত্রদের সংখ্যাও লক্ষণীয়। অধ্যাপক কমল চাটার্জী, অধ্যাপক অমর ঘোষ, অধ্যক্ষ রথীন রায়, অধ্যাপক সুধীর পাল, অধ্যক্ষ মদন ঘোষ, ইন্টালি স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রফুল্ল ভট্টাচার্য, হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিমাই ভট্টাচার্যের মত অনেকেই ১৯৫৪-৫৫ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র।

অনেক কিছু বলা হল। এবার পঞ্চাশ বছর আগের স্মৃতি রোমান্থনে সম্ভাব্য ভুলভ্রান্তির জন্য মার্জনা চেয়ে লেখা শেষ করছি।

একটি পালকির খোঁজে

(ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে)

—সমীর চক্রবর্তী

মার্বেল ফলকটা এখনও আছে। হারিয়ে যায়নি। ৪ নম্বর হেয়ার স্ট্রিটের বাড়ির দেওয়ালে লেখা—"On this site formerly stood the residence of David Hare, Born 1775 Died 1842." এ সবই বইয়ে রয়েছে। তবু দেখার ইচ্ছে হওয়াতে হেয়ার স্ট্রিটের NICCO House-এর গেটে গিয়ে খুঁজেছিলাম Marble Table-টিকে। কিন্তু খুঁজছিলাম আরও কিছু। সেই লোকটিকে যিনি আজ থেকে প্রায় দু-শো পাঁচ বছর আগে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর মার্কিংটন জাহাজে পোর্টস্ সাউথ বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করে ১৮০১ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা মে ডায়মণ্ডহারবারে জাহাজ থেকে নেমেছিলেন ভারতবর্ষে ঘড়ির ব্যাবসা করতে। প্রায় কম বেশি ২০০ বছর আগে।

১৮০১ সালে ডেভিড হেয়ার পৌঁছালেন কলকাতায়, ঘড়ির ব্যাবসা করতে। জাঁকিয়ে বসলেন ঘড়ির ব্যাবসায়। প্রভূত অর্থ উপার্জন করলেন। কলকাতায় সম্পত্তি করলেন অনেক, বলতে গেলে সারা কলেজ স্কোয়ার এবং আশেপাশের প্রায় সব জমিই ছিল ডেভিড হেয়ারের সম্পত্তি।

এরপর আরও একশো বছর কেটে গেছে, ১৯০৯ সালে তৎকালীন Mr. Alexander Pedler-য়ের পরিকল্পনায় ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ শুরুর একটা আভাস পাওয়া যায়। আমরা যে তথ্য পাই সেটা হল—"The College owes its genesis to a comprehensive scheme, drawn up by Mr. Alexander Pedler, Director of Public Instruction, Bengal, in June 1901, for better training of teachers of English vernacular schools in the provinces comprising of Bengal, Bihar and Orissa."

তবে এই কলেজের স্থাপনা এবং এই কলেজের নামকরণ এই কলেজের বিভিন্ন দিক নিয়ে যে দু-জন সবচেয়ে বেশি ভাবনাচিন্তা করেছিলেন তাঁরা হলেন Prof. H. R. James, তৎকালীন প্রেসিডেন্সী কলেজের Principal এবং ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের Principal Prof. W. E. Griffith। তাঁদের পরিকল্পনামোতাবেক এই Training কলেজের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব এবং তা অস্থায়ীভাবে শুরু করার ব্যবস্থা তাঁরা করেন। ২১শে জানুয়ারি ১৯০৮ সালে Prof. James-য়ের নেতৃত্বে যে Committec তৈরি হয়েছিল সেখানেই প্রথম বলা হল ১লা জুলাই ১৯০৮ থেকে এই কলেজ শুরু হবে। হিন্দু হেয়ার স্কুলের আশেপাশে এই কলেজ অস্থায়ীভাবে চালু হবে যাতে ঐ স্কুলগুলিকে কলেজের Practical কাজে লাগানো যায়। Albert College-য়ের (আজকের কফি হাউস) পাঁচটি ঘর নিয়ে শুরু হয়েছিল এই কলেজ। Prof. James প্রস্তাব করেছিলেন কলেজের নাম হোক David Hare Training College।

আরও একশো বছর পরে কলেজটিতে স্নাতকোত্তর বিভাগের (M. Ed.) পঠন পাঠন শুরু হওয়ার সাথে সাথে (২০০২ থেকে) আজ কলেজটি Institute of Advanced Studies in Education-য়ে পরিণত। NSOU-IASE-র অধীনে ২০০৪ সালে শুরু হল M. Phil in Education কোর্স। নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে।

১৮৩৫ সালে মেকলে ডেভিড হেয়ার সম্বন্ধে বলেছিলেন, "ভারতের শিক্ষার ব্যাপারে যাঁরা আজ আগ্রহী তাঁদের মধ্যে মিষ্টার হেয়ারই প্রথম কাজে নেমেছিলেন...এ দেশের বাসিন্দাদের....ইংরেজি ভাষার চর্চায় উৎসাহিত করার জন্য...কারণ এটাই ছিল পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করার সব থেকে উপযোগী পন্থা।" আবার ডঃ সুশোভন সরকারের ভাষায় যুক্তিবাদী মন তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল ডিরোজিওর দিকে, দুজনেই বিশ্বাস করতেন ভারতবর্ষের সব থেকে বেশি করে দরকার—"ইউরোপীও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসার।" ডেভিড হেয়ার, তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা চার দশকের বেশি (১৮০১-১৮৪২) উৎসর্গ

করেছিলেন বাংলার মানুষদের জন্যে। উনিশ শতকে আমাদের পুনরুত্থান ও নবজাগরণের ভিত্তি স্বরূপ ছিল যে নতুন শিক্ষা, তাঁর অন্যতম স্থপতি ছিলেন ডেভিড হেয়ার।

এই ডেভিড হেয়ারের ছিল একটি সুসজ্জিত পালকি। হেয়ার সাহেব বাইরে বের হলেই দলে দলে ছেলেরা—"me poor boy, have pity on me, me take in you school" বলে তাঁর পালকির দুধারে ছুটত। এই পালকি ছিল হেয়ার সাহেবের বাহন। তখন কলকাতা শহরের সবেমাত্র গোড়াপত্তন হচ্ছে। যানবাহনের পত্তন ঘটেনি। প্রায় সব সম্পন্ন লোকেরাই পালকি ব্যবহার করতেন। আর হেয়ার সাহেবের পালকি, তা ছিল দেখার মতো। কী না ছিল তাতে, যেন ছোটখাটো একটা ঘর। ঔষধ, তোয়ালে, সাবান, তেল, মাজন, ছুরি আর বই। আর থাকত খাবার আর একটা বেত। হেয়ার সৎ কাজ করতেন দৃষ্টির আড়াল থেকে। নিঃশব্দে অতি সংগোপনে, তিনি কল্পনাগুলিকে রূপ দিতেন। তাঁর দৈনন্দিন কাজগুলো ছিল ছকে বাঁধা।

রসিককৃষ্ণ মল্লিক বলেছেন, হেয়ারের পালকি একটা রীতিমতো ঔষধাগার বিশেষ, সব রকম রোগ সারাবার ঔষধ তাতে মজুত থাকত। আবার রাজনারায়ণ বসু তাঁর "আত্মচরিত" গ্রন্থে লিখেছেন যে স্কুলের ছুটি হবার সময় হেয়ার সাহেব তাঁর স্কুলের ফটকে তোয়ালে, সাবান প্রভৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তোয়ালে দিয়ে ছেলেদের দেহের ময়লা পরিষ্কার করে দিতেন। অপরিচ্ছন্ন ছেলেদের বেতও খেতে হত।

হেয়ার সাহেবের পালকি সেই সময় ঘুরে বেড়াত গঙ্গার ঘাটে, মাধববাবুর বাজারে, কলুটোলা, পটলডাঙ্গা, আরপুলি, ঠনঠনিয়া প্রভৃতি জায়গায়—যেখানে যেখানে তাঁর স্কুলগুলো ছিল। সেই পালকিতে চড়েই হেয়ার সাহেব যেতেন তাঁর স্কুল সোসাইটির স্কুলগুলো পরিদর্শনে, হিন্দু কলেজ পরিদর্শনে, ছাত্রদের বাড়িতে, আবার কখনও কখনও গঙ্গার ঘাটে। যেখানে ছাত্রদের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে হেয়ারের সতর্কতা ছিল গোয়েন্দাদের মতোই নিপুণ। তাঁর ছাত্ররা যাতে বাবুদের পাল্লায় না পড়ে, তাই প্রত্যেক ঘাটে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন পালকিতে ঘুরে ঘুরে। এই ভাবে প্রায়ই তিনি পলাতক ছাত্রদের ধরে ফেলতেন এবং পরে তাদের কপালে শাস্তিও জুটত।

গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার বালক রামতনু লাহিড়ীকে হেয়ারের ফ্রি স্কুলে ভর্তি করবার জন্যে কী রকম সাধ্য-সাধনা করেছিলেন তা আমরা শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" থেকেই পাই। তখনকার দিনে অনেক মা-বাবাই এইভাবে হেয়ারের পালকির পেছন ঘুরে তার ছেলেকে ইংরেজি শেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন হেয়ারের স্কুলে। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন—হেয়ারের পালকির সঙ্গে সঙ্গে কিছু দিন ছুটিতে হইবে। বালক রামতনু তাহাই করিতে লাগিলেন। তিনি হাতিবাগানে বিদ্যালঙ্কারের বাসা হইতে সকাল সকাল আহার করিয়া কোনও দিন বা অনাহারে হেয়ারের বহির্গত হইবার পূর্ব্বেই ক্রে-সাহেবের ভবনের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইতেন, এবং তাহার পালকির সহিত ছুটিতে আরম্ভ করিতেন। হেয়ারের পালকি নানা স্থানে যাইত এবং এক এক স্থানে অনেকক্ষণ বিলম্ব করিত। রামতনু সর্ব্বত্রই যাইতেন ও অপেক্ষা করিতেন। একদিন অপরাহ্নে হেয়ার স্বীয় ভবনে ফিরিয়া আসিয়া পালকি হইতে অবতরণ করিয়া দেখিলেন বালকটির মুখ শুকাইয়া গিয়াছে।...

এইরূপে প্রায় দুই মাসেরও অধিককাল গত হইল। শেষে হেয়ার বুঝিলেন এ বালক ছাড়িবার পাত্র নয়, বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে ইহার অতিশয় আগ্রহ। তখন তাঁহাকে ফ্রি বালকের দলে লইতে স্বীকৃত হইলেন।"

এদেশীয় সমাজে তাঁর যতখানি প্রভাব ছিল, কোনো বেসরকারী ব্যক্তির পক্ষেই এর আগে তা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। কীভাবে একটি ব্যক্তি শিক্ষার শাণিত দীপ্তি ও প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি ছাড়া বা পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের অধিকারী না হয়েও শুধুমাত্র উদীয়মান তরুণ সম্প্রদায়ের উন্নতি বিধানের অব্যাহত প্রচেষ্টায় রত থেকে বছরের পর বছর ধরে দেশীয় সমাজের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবময় আসনটি অধিকার করে রাখতে পারে, হেয়ার তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। বোধহয় এক্ষেত্রে তিনি ভারতবর্ষে

অনন্য। স্কুলের বালকদিগের পরিচ্ছন্নতার দিকে হেয়ারের অতিশয় দৃষ্টি ছিল...কোনো কোনো দিন বসিবার বা ভাঙিবার সময়ে তিনি গামছা হাতে স্কুলের দ্বারে দাঁড়াইতেন এবং প্রবেশ ও নির্গমনের সময় সর্বাপেক্ষা অপরিচ্ছন্ন বালকদিগকে ধরিয়া তিরস্কারপূর্ব্বক মায়ের মতো উত্তমরূপে গা মুছাইয়া দিতেন। তাঁর পালকিতে থাকত ছেলেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার সরঞ্জাম। কয়লাঘাটা থেকে কলুটোলা, মাধব দত্তের বাজার (এখন যেখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আশুতোষ বিল্ডিং), ঠনঠনিয়া কালীতলা, আরপুলি, পটলডাঙ্গা ছিল তাঁর রোজকার গন্তব্যস্থল। "প্রথমে তাঁহার নিজের প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা ও স্কুলগুলি পরিদর্শন করিতেন, তৎপরে যে সকল দরিদ্র বালকের পীড়ার সংবাদ পাইতেন, তাহাদের ভবনে গিয়া তাহাদিগের ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতেন। অবশেষে হিন্দু কলেজে গিয়ে উপস্থিত হইতেন, সেখানে প্রত্যেক শ্রেণীর বালকের কার্য পরিদর্শন করিতেন, এইরূপ সমস্তদিন শহরের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, সায়ংকালে বাসভবনে ফিরিয়া যাইতেন—সেই সময়ে ঐসব অঞ্চলের অধিবাসীরা হেয়ার সাহেবের মুখ এতবার দেখিতেন যে, অনেকে তাঁহাকে আপনার লোক মনে করিতেন।"

রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের কথায়—"স্কুলের বালকদিগের প্রতি হেয়ারের সে কি প্রেম ছিল তাহা বর্জনীয় নহে। তাহাদিগকে দেখিলে তাঁহার এত আনন্দ হইত যে, তিনি আর সকল কাজ ভুলিয়া যাইতেন। মধ্যে মধ্যে আসিবার সময় নিম্ন শ্রেণীর শিশুদিগের জন্য খেলিবার বল কিনিয়া আনিতেন। স্কুলের ছুটি হইলে ঐ বল ঊর্ধ্বে ধরিয়া উদ্বাহু হইয়া শিশু দলের মধ্যে দাঁড়াইতেন; তাহারা চারিদিক হইতে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিত; কেহ কোমর জড়াইত; কেহ গাত্র বাহিয়া উঠিবার চেষ্টা করিত; কেহ বা স্কন্ধে ঝুলিত; তিনি তাহাতে মহা আনন্দ অনুভব করিতেন..."।

পোশাক-পরিচ্ছদে যেমন, তেমনি আহারের ব্যাপারেও অত্যন্ত সাদাসিধে ডেভিড হেয়ার। তিনি বাঙালির ঝোল-ভাত খুব পছন্দ করতেন। আর মাগুর মাছ খেতে ভীষণ ভালোবাসতেন; তিনি তাঁর বন্ধু রাজা রামমোহন রায়ের কাছ থেকে এই-মাছ খেতে শিখেছিলেন। আমাদের তৎকালীন মিষ্টিও তিনি খুব পছন্দ করতেন। আর ভালোবাসতেন পানীয়ের মধ্যে নারিকেল দুধ। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি একেবারে বাঙালি বনে গিয়েছিলেন।

হেয়ারের সেই পালকির খোঁজ আমরা আর পাইনি। ১৮৪২ সালের ১ জুনের পরে (ডেভিড হেয়ারের মৃতুদিন) সেই পালকির আর খোঁজ নেই। প্রায় দু-শো বছর ধরে আমরাও খোঁজ করছি সেই পালকির, যে পালকিতে থাকবেন তিনি যিনি বন্ধুহীনের বন্ধু, অভিভাবকহীনের অভিভাবক, সহায়হীনের সহায়ক, ছাত্রবৎসল শিক্ষক ও একজন শিক্ষাব্রতী। যদি কেউ সেই পালকির সন্ধান পান তবে শতবর্ষের পুরানো ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, ২৫/৩ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড ঠিকানায় জানালে ছাত্রদের প্রভূত উপকার হবে।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১। রাধারমণ মিত্র ঃ ডেভিড হেয়ার, ১৯৬৮
২। সুশীল গুপ্ত ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ, ১৯৫৯
৩। প্যারীচাঁদ মিত্র ঃ ডেভিড হেয়ার, ১৮৭৭
৪। শিবনাথ শাস্ত্রী ঃ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ১৯০৩
৫। সুশোভন সরকার ঃ বাংলার রেনেসাঁস, ১৩৩৭
৬। নিমাইসাধন বসু ঃ ডেভিড হেয়ার ও হিন্দু কলেজ।
৭। রাজনারায়ণ বসু ঃ আত্মচরিত।

কিছু স্মৃতিকথা ও শিক্ষাপ্রসঙ্গে

—মধুসূদন পাঁজা (প্রাক্তন ছাত্র, ১৯৬৩-৬৪)

David Hare Training College-এর শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসব বর্তমান বৎসরে কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই শুভবার্ত্তা বর্তমান অধ্যাপক মাননীয় শ্রীবিষ্ণুপদ বেরা মহাশয়ের নিকট থেকে অবগত হয়ে তাঁরই অনুপ্রেরণা ও উৎসাহদানে আমি এই অতীত স্মৃতিচারণটুকু লিখছি। আমি বিগত ১৯৬৩-৬৪ সেশনে এই কলেজ থেকে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রাপ্ত হই। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বাস করি বলে সংগত কারণে কলেজ ও কলিকাতার অনেক পরিবর্তন আমার অগোচরে আছে। তবুও কলেজ সম্পর্কে যেটুকু স্মৃতিপটে আসে তার কিছুটা নিজের আত্মতৃপ্তির জন্য লিখতে প্রয়াস পাচ্ছি।

ভুলি নাই ভুলি নাই
তব স্মৃতি নিয়ে কত সুখ পাই।

কলেজের অবস্থান, গোলাপকুঞ্জে বেষ্টিত গেট সম্মুখে চতুষ্পার্শ্বে পুষ্পোদ্যানবেষ্টিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণ এবং পাঁচতারা হোস্টেলের কথা খুব মনে পড়ে। বর্তমান ও তৎকালীন সকল অধ্যাপককে (জীবিত/মৃত) সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। সকলের কথা কালের আবর্তে ভুলে গেলেও কয়েকজনের কথা আজও স্মৃতিপথে ভাস্বর। জে. এন. দাশগুপ্ত বাবু, নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়, প্রত্যুৎপন্নমতি সুধীর চন্দ্র রায় মহাশয়ের সঙ্গে এশিয়ার বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ শ্রদ্ধেয় কুলদাপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয়ের কথা খুব মনে পড়ে। চৌধুরীবাবু অসাধারণকুশলী Psycho-Analyst ছিলেন।

কলেজের অধিবেশন হলে শিক্ষা বা তৎসম্পর্কিত বিষয়ে ছাত্রশিক্ষকদিগের মধ্যে মাঝে মাঝে Seminar হত। ঐ সময়ে কোনো সমস্যা নিয়ে শোরগোল ও বিতর্কের অবতারণা ঘটলে সুধীরবাবু সত্বর মঞ্চে উপস্থিত হয়ে এমন সমাধান করে দিতেন যে David Hare College-এর বাছা বাছা আড়াইশো ছাত্র চুপচাপ হয়ে যেত। Tactics and takling-এ তাঁর অসাধারণ নিপুণতা ছিল।

একটা সৌভাগ্যের কথা না বলে পারা যায় না। ঐ শিক্ষাবর্ষে (1963-64) ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সর্বজনশ্রদ্ধেয় ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এই কলেজে এসেছিলেন। তাঁকে দেখার সৌভাগ্য আমাদের অনেকের হয়েছিল। কলেজে কিছুক্ষণ থাকার পর পার্শ্ববর্তী বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে তিনি চলে গেলেন।

তৎকালীন সময়ে ব্রিটিশ ভারতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে সমস্ত ইংরেজ মহান শিক্ষাবিদ ও সমাজসংস্কারক ছিলেন তাঁদের মধ্যে উইলিয়ম কেরী, মার্শম্যান ও 'মহাত্মা ডেভিডের' নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদেরকে একযোগে "শ্রীরামপুর ত্রয়ী" বলা হত। এঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায় Hindu School, Hindu College (বর্তমানে Presidency College) Hare School এবং Srirampur College প্রতিষ্ঠা হয়। হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে নানা গোঁড়ামি, কুসংস্কার, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি নানা অনাচার দূরীকরণে এঁরা মহাত্মা রামমোহনকে ধর্মসংস্কার আন্দোলনে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছিলেন। শ্রীরামপুরে ছাপাখানা, School Book Society, Calcutta Book Society স্থাপনে এঁদের আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতা অস্বীকার করা যায় না। ভারতের অন্যতম শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ David Hare Training College মহাত্মা ডেভিডের অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি। এই কলেজের ছাত্র হওয়াও এক সৌভাগ্যের বিষয়। মহাত্মা ডেভিডকে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত কলেজকে ভূয়ঃ এব স্মরণ করি প্রণাম করি।



কলেজের শতবর্ষ অনুষ্ঠানে মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী শ্রী সুদর্শন রায়চৌধুরী, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব শ্রী অশোক মোহন চক্রবর্তী এবং শিক্ষা অধিকর্তা শ্রী শুভশংকর সরকার।

কালিদাস রায়ের "ছাত্রধারা" কবিতার কটা কথা মনে পড়ে,

বর্ষে বর্ষে দলে দলে আসে বিদ্যামঠতলে

চলে যায় তারা কলরবে।

একদিন এসেছিলাম, এখন জনসমুদ্রে মিশে একাকার হয়ে গেছি। জীবনটা শিক্ষকরূপে অতিবাহিত করেছি। এখন অবসন্ন অবসাদগ্রস্ত। শিক্ষা সম্পর্কে আমি যেটুকু অনুভব করেছি সে সম্পর্কে কিছুটা বলবার জন্য মনটা আঁকুপাঁকু করে। কিছু অপরাধ হলেও ক্ষমাই হবে বলে আশা রাখি।

সা শিক্ষা যা বিমুক্তয়ে

শিক্ষা আমাদিগকে সব কিছু অশুভ ভাব ও অকল্যাণ থেকে বিমুক্ত করে। আজকের দিনে সেই শিক্ষা আমাদিগকে কতটা মুক্ত করতে পেরেছে সেটা ভাববার বিষয়। বর্তমান অবস্থায় প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কত বেড়েছে। শিক্ষা ও শিক্ষিতের সংখ্যাও প্রচুর বেড়েছে। কিন্তু এতে গৌরব করার মত কিছু আছে কি? কারণ হিসাবে বলতে হয় শিক্ষার গুণগত মর্যাদার হ্রাস পেয়েছে। মনুষ্যত্ব ও মানবতাবোধ অনেক কমেছে। খুন, জখম, দাঙ্গা, কলহ, হাঙ্গামা, চুরি ডাকাতি, লোভলালসা, ছিনতাই, নারীধর্ষণ, চরিত্রহীনতা কি পরিমাণে বেড়েছে, দৈনিক পত্রিকাগুলি তার জীবন্ত প্রমাণ।

মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের হার নিয়ে পরাধীন ভারতে জাতীয়তা, দেশাত্মবোধ, আত্মত্যাগের কি বিশাল আন্দোলন, কি বিশাল অনুপ্রেরণা—

যত নিবে প্রাণ তত করিব দান

তাই শিক্ষাপ্রসার ও মানুষকে শিক্ষিত করার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। স্বাধীনতার ষাট বছর পরেও শিক্ষার বিশেষ গুণগত দিক বৃদ্ধি পায়নি। শিক্ষা ও শিক্ষিত সমাজের মধ্যে স্বর্গীয় গুণাবলীর অভাব। তার কারণ অনুসন্ধান শিক্ষাপ্রণেতা, শিক্ষানুরাগী ও নিয়ামকদের অতি অবশ্য কর্তব্য। সিনেমা, থিয়েটার, টি.ভি. এবং নানাবিধ দৃশ্যকাব্যে যেভাবে obscene ছবি, গোপনীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, পোযাক-পরিচ্ছদ ও বিষয়বস্তু দেখানো হয়, তাতে যুবসমাজ উদ্ভ্রান্ত ও উন্মার্গগামী হয়ে যাচ্ছে। মনে হয় Censor Board ও অর্থাগমের দিকে নজর দিয়ে এদের অনুমোদন দিচ্ছে। বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণের সাহিত্য আদর্শ আর মানা হচ্ছে না। Stimulant জিনিস দর্শককে Stimulate করবেই করবে, অনুকরণ প্রবৃত্তি আসবেই আসবে।

শিক্ষার মধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। শিক্ষার আক্ষরিক ও বিষয়গত দিক প্রসারিত হলেও গুণগত দিকে ঘাটতি ঘটে যাচ্ছে। শিক্ষাবস্তুটির তাৎপর্য বিশ্লেষণে অনুসরণে ও গ্রহণে ব্যর্থ হলে সমাজজীবনে, জাতীয় জীবনে বিপর্যয় নেমে আসতে বাধ্য। তাই বর্তমান দিনে শিক্ষাভাবনা নূতন করে করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সার্থক মানুষ আমরা আজ খুঁজে পাচ্ছি না। শিক্ষা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে শ্রেণিকক্ষে, Tutorial Home এ শিক্ষকের নির্দেশনায় বিশেষ তত্ত্ব ও তথ্যের চর্বিতচর্বণ গলাধঃকরণ, পরীক্ষা নাম্নী নিক্তিতে অবিকল উদ্গীরণ, Star Mark খচিত উজ্জ্বল মানপত্র লাভ, অর্থকরী উচ্চাসনে আরোহণ, কর্তব্যে অবহেলা, ফাঁকি ও শোষণে, স্বার্থসিদ্ধি সাধনে সম্পদসংগ্রহে ব্যাপৃত হয়ে Oscar Wild এর Selfish Giant এর রূপ ধারণ করেছে। তাই জাতীয় জীবনে নৈতিক মানে হতাশা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ Ruskin তাঁর বিখ্যাত "Unto the Last" নামক গ্রন্থে বলেছেন, "Man is the real Wealth of the Country"। সুতরাং আমাদের মানবসম্পদ ঠিক ঠিক গুণগতভাবে অগ্রসর হচ্ছে কি না, দূরদর্শী শিক্ষাপ্রণেতা ও ব্যবস্থাপকগণ নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারছেন। বর্তমান

শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য চাকুরি প্রার্থনা, ব্যক্তিগত লোভ সাধন ও সম্পদ লাভ। চতুর্দির্কের পরিবেশে আজ পানদোষ, কুটিলতা, স্বার্থান্বেষণ, আত্মসুখেচ্ছা, 'মাত্রাতিরিক্ত ধনাগমতৃষ্ণা। দেশ জাহান্নামে যাক্, আমি ও আমার আপনজনেরা সমস্ত সম্পদের অধিকারী হব। এমন একটা বদনেশা প্রায় প্রত্যেকের মধ্যে দানা বেঁধেছে। আমার মনে হয় জাতীয় জীবনের যা কিছু দোষ-ত্রুটি, দুর্গতির জন্য শিক্ষা ও শিক্ষিত সমাজই দায়ী। শিক্ষিত সম্প্রদায়ই রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন দপ্তর পরিচালনা করছেন। ফলাফল তাদের উপরেই বর্তাবে। মুটে, মজুর, অশিক্ষিত সম্প্রদায় কোনো দায়িত্বে নেই।

মানবতানাশের জন্য আজ চারিদিকে হাহাকার। স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখে আমরা আতঙ্কিত। চক্ষুকর্ণবিশিষ্ট, হস্তপদাদিযুক্ত বাক্‌বিশিষ্ট মানুষই মানুষ নয়। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বলেছেন শিক্ষায় মানুষের দ্বিতীয় জন্ম। এই জন্মেই মানুষকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষাসত্তার বিকৃতি যদি বর্তমান সমাজের দুর্গতির কারণ হয়, তবে তাকে সংস্কার ও ঠিকপথে পরিচালিত করার দায়িত্ব শিক্ষকসমাজকে আগেই নিতে হবে। শুধু বৃত্তিকরী ও অর্থকরী দিকটা দেখলেই চলবে না। অর্থই সব নয়, যদিও অর্থের অতি প্রয়োজন। বৃত্তির কথা, জীবনমুখিতার কথা অস্বীকার করা যাবে না। অন্ন চিন্তা আগে, পেট খালি থাকলে উপদেশ কাজে লাগবে না। খালি পেটে ধর্ম হবে না। কথায় বলে

"যদি হয় অন্নহারা
কালিদাসও কাব্যহারা"

যে কারণেই হোক মানবিকতাকে অস্বীকার করা যাবে না। অর্থের প্রয়োজন অতি সত্য কিন্তু উপার্জ্জন ও অর্থই শেষ কথা নয়। অর্থ সম্পদ ও মানবসম্পদ, দুইদিকেই তাকাতে হবে।

ভারত অতি পবিত্রভূমি। মহামানবের দেশ, মহাপুরুষের দেশ। ভারতের সুপ্রাচীন অধ্যাত্মবাদ, ধর্মসাধনা, নীতিশাস্ত্রকে আমরা ভুলতে বসেছি, ভুলেছি। ভারতের সমাজচেতনা, সমাজব্যবস্থা, সারা পৃথিবীর এখনও অনুকরণযোগ্য। মুনি-ঋষিদের সাধনালব্ধ আধ্যাত্মিক চেতনাবাদ আমাদের ভোলা উচিত নয়। স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্মসভায় ভারতীয় সংস্কৃতি, ধর্মীয় মাহাত্ম্য বর্ণনা করে সারা বিশ্বে কি বিশাল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। সারা বিশ্ব মুগ্ধ চমৎকৃত। ভক্তি শ্রদ্ধা আজ অতি বৃদ্ধ ও খঞ্জ হয়ে পড়েছে। চুরি, প্রতারণা, গুণ্ডামি, ফাঁকিবাজি, কর্তব্যে অবহেলা, মিথ্যাভাষণ, জাতিধর্ম হয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। পাপপুণ্যে অবিশ্বাস, বিশ্বাস নেই কর্মে ও অপকর্মে, এসব কোথা থেকে কিভাবে আসছে। অক্ষরসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যেও এসব দেখা যাচ্ছে। তবে তো আমাদের ধরে নিতে হয়, শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে কোথাও বিড়ম্বনা আছে। এখনকার পূজাপদ্ধতি ও দেবোপাসনার মধ্যেও ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের প্রতিযোগিতা। ভক্তি শ্রদ্ধার বালাই আছে বলে মনে হয় না। সেবা ও ত্যাগ শব্দ আভিধানিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বামীজিরচিত "চরিত্রগঠন", "ভক্তিরহস্য" ও "এসো মানুষ হও" এসব বই পড়া উচিত। ভুললে চলবে না—

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"

মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের "ভক্তিযোগ" আগে স্কুলপাঠ্য হিসাবে পড়ানো হত।

অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমান চলতে পারে না। বর্তমানের দ্বারা ভবিষ্যৎ নিরূপিত হয়। স্বামীজিরই কথা— "Present is determined by the past and future by the present." ভিত সুদৃঢ় না হলে সৌধ বা প্রাসাদ নির্মাণ করা যায় না। সব কথাই শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানিয়ামকগণ ভালভাবেই জানেন। কেবল বাস্তবে প্রয়োগের অভাব দেখা যাচ্ছে। ভারতের অধ্যাত্মবাদ বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ আজ প্রায় একেবারে অবহেলিত। প্রাচীন মুনি ঋষিদের নীতি উপদেশ, বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্করাচার্য, রামানুজ, রামচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ থেকে বর্তমানে

রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, গান্ধিজি, সুভাষচন্দ্র, রামমোহন, বিদ্যাসাগর পর্যন্ত মহৎ ও মহান ব্যক্তিগণের আদর্শকে আমাদের শিক্ষণব্যবস্থার মধ্যে সুদৃঢ়ভাবে স্থান দেওয়া উচিত। শিক্ষকতা জীবনে দেখেছি তৎকালীন বাংলা সাহিত্যবিভাগে দ্রুতপঠন হিসাবে পৌরাণিক গল্পের সমাহার তখন বেশ ছিল। এখন এগুলি Back-dated হয়ে অবহেলিত হয়ে আছে। আমাদের কবর পরোক্ষভাবে আমরাই খুঁড়ে রাখছি, উত্তরসূরিদের মাটি চাপা দেবার দায়িত্ব।

শূন্যে যেমন বৃক্ষরোপণ করা যায় না, ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে দেশের বিশেষ উন্নতি করা যাবে বলে মনে হয় না। জাতির অন্তর্নিহিত নৈতিক সত্তাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করানো অপচেষ্টা। প্রবহমানা গঙ্গা-যমুনাকে প্রতিরোধ করে হিমালয় টপকে অন্যদেশে স্থানান্তরকরণ যেমন অসাধ্য, তেমনই ভারতের প্রাচীন চিন্তাস্রোতকে ভিন্নখাতে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

বর্তমানে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কেবল পরীক্ষানিয়ামক ও পরীক্ষাগ্রহণকেন্দ্রে পর্যবসিত হয়েছে। উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতেও কদর্য রাজনীতি অসুস্থ অপসংস্কৃতির আখড়া হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় একটি আশুতোষ, জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আর একটি বিদ্যাসাগর দ্বিতীয় বিবেকানন্দ সৃষ্টি এরা করতে পারছে কই?

এটা স্বীকার্য যে বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে বর্তমানে আমরা চলতে পারব না। বিশ্বের সঙ্গে তাল রেখে আমাদের চলতেই হবে। ইউরোপের ঐশ্বর্য আমাদের প্রভাবিত করুক তবুও মাটি ছাড়া যেমন গাছ হয় না, তেমনই আমাদের প্রাচীন গৌরব ও আদর্শের অনুশীলন ব্যতীত আমাদের জাতীয় উন্নতি হতে পারে না। গান্ধিজি বলতেন "উন্মুক্ত বাতাসের জন্য আমাদের ঘরের দরজা জানালা খোলা থাকবে। কিন্তু যখন ঝড় আসবে তখন সব বন্ধ করে দিতে হবে। বিদেশি অনুকরণকে পরিমার্জিত, পরিশীলিত করে আত্মীকরণ করতে হবে। সুতরাং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নৈতিকতা, ধর্ম-সংস্কৃতি ও অধ্যাত্মবাদের কথা ভুললে চলবে না। বিবেকানন্দের একটা উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে—"তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্যজাতির জড়বাদসর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তিন পুরুষ যাইতে না যাইতে তোমরা নিশ্চিহ্ন হইবে।"

উপযুক্ত চরিত্রগঠন না হলে শিক্ষার কোনো মর্যাদা থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী ব্যক্তি যদি চোর গুন্ডা, মাতাল লম্পট হয়, পিতামাতাকে যদি বোঝা মনে করে পরিহার করে, সদুপদেশকে প্রলাপবাক্য মনে করে, তবে তাকে কি শিক্ষিত বলে বিহিত মর্যাদা দেওয়া যাবে? ঐরূপ শিক্ষিত শ্রেণিকে Educated devils বা Educated Giants ব্যতীত কি বলা যেতে পারে? সিনেমা, টিভি ও প্রচারমাধ্যমের ছবিগুলি জনমানসকে কলুষিত করছেই। শিক্ষা নীতিহীন হওয়ার জন্য বর্তমান দিনে মাস্টার, পণ্ডিত, ডাক্তার, কবিরাজ, সরকারি কর্মচারী, রাজনীতিবিদ ও প্রশাসনিক ব্যক্তিগণ অসামাজিক জীবে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। একজন ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করতে সরকারের কি কম পয়সা ব্যয় হয়? রাজ্যপালের নিকট থেকে মানপত্র গ্রহণের প্রাক্কালে গৃহীত প্রতিশ্রুতি এরা কতটা পালন করছেন? অর্থোপার্জনই যেন শেষ কথা।

শিক্ষা স্বয়ং কিন্তু এর জন্য দায়ী নয়। পরিচালক ও পরিচালনব্যবস্থাই দায়ী। 'Philip Sidney-র একটি কথা মনে পড়ে—"If any medicine be the cause of death of any patient, medicine is not responsible, but the doctor who prescribed it". তদ্রুপ আমরাও শিক্ষাকে ঠিকপথে বাস্তবায়িত না করতে পেরে চরিত্রহীন অপরাধীর সৃষ্টি করছি । পরোক্ষভাবে নেপথ্যে আমরাই দায়ী। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় উদরপূর্তি ও ভোগের বস্তু আহরণ মূল লক্ষ্য হয়ে গেছে। বর্তমান বস্তুতান্ত্রিক-যান্ত্রিক সভ্যতা আত্মোপলব্ধির পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। কস্ত্বম্, কোহহম্, কুতো

বা আয়াতঃ" এই বিজ্ঞানভিত্তিক সার কথা বুঝবার শক্তি কয়জনের আছে? স্বামীজির একটা কথা না বলে পারা যাচ্ছে না—"Education is the manifestation of perfection already in man" বর্তমান শিক্ষাধারার মধ্যে কোথাও perfection বিকাশের বিশেষ সুযোগ কোথায় আছে?

শিক্ষকের সম্মান কিছুকাল আগে পর্যন্ত কত উচ্চে ছিল। প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু শিক্ষকদিগের অসামান্য সম্মান দিতেন। সেজন্য একজন খ্যাতনামা শিক্ষকের জন্মদিন স্মরণ করে "শিক্ষক দিবসের" সৃষ্টি করা হয়েছিল। যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে শিক্ষা প্রায় আদর্শভ্রষ্ট। ভোগ ও ইন্দ্রিয়সেবনে নিজ নিজ জীবন চালিত। বৃদ্ধ পিতা মাতা ও গুরুজনের দিকে দৃষ্টিপাত ডিগ্রিধারী ছেলেদের মধ্যে অনেকের নেই। নিম্নে ছড়াটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

মা বাপে পায় না ভাত গায়ে উড়ে খড়ি।
পরায় বামার অঙ্গে বারাণসী শাড়ি।

লোকনিন্দা, মানাপমান, লোকের কিছু কথা এসব চুলোয় যাক। শিক্ষাব্যবস্থায় যে নীতিশিক্ষার কিছু নেই তা কিন্তু একেবারে নয়। প্রয়োগ করে দেখাবার উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব চোখের সামনে নেই। সরকারি প্রচেষ্টাও নেই। সমাজবেত্তাদের সমাজসেবীদের এ বিষয়ে ভূমিকা নিতে হবে। জাতির সংগঠক শিক্ষকদিগের ভূমিকা এই বিষয়ে অনেক বেশি। কামিনী রায়ের একটি কবিতার কয়েক ছত্র কিছুটা মনে পড়ে ঃ

মানিক মুকুতা নিধি আমারে দিও না বিধি
আমি নাহি তাহা চাই।
মনুষ্যত্ব মহানিধি আমারে দিও বিধি
আমি তাহা পেতে চাই।—

বলা বাহুল্য একথা আজ অচল। উপদেশ দিলে বা শুনলে বাতুলের উপহাস বলে উড়িয়ে দেয়। আর্থিক অভাবই কিন্তু সব কারণ নয়। শিক্ষায় নৈতিক মানের অভাব আর প্রয়োগের দিকে নজর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের নেই। আইন আছে, প্রয়োগের লোক নেই। শিক্ষা জীবনভিত্তিক হোক কিন্তু তা নীতিবিগর্হিত পথে নয়। কর্তব্যপরায়ণতা, নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা, মানসিকতা আগ্রহ থাকা চাই। বিদ্যার অপপ্রয়োগ হচ্ছে মিথ্যার আখড়াই চলেছে। বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের জ্ঞানের অভাব আছে। প্রাচীন ও শাশ্বত আদর্শকে আর মানতে চাইছে না।

আর্য ধর্ম কথা কেহ নাহি মানে।
দিবস রজনী রত ইন্দ্রিয় সেবনে।।

যারা পথপ্রদর্শক, নিয়ামক তাদের মধ্যে শুভ আচরণের অভাব পরিদৃষ্ট হচ্ছে যে রাজনীতি আত্মোৎসর্গের আদর্শ, বর্তমানে সেই রাজনীতি স্বার্থসিদ্ধির অভিসন্ধি। সীমাহীন কামনা বাসনা ভোগের পশ্চাতে আমরা ধাবিত হচ্ছি। রামচন্দ্রের রাজনীতি, মনু প্রবর্তিত মানবনীতি মেনে নিতে পারছি কই? ত্যাগের আদর্শ নেই, ভোগবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। নীতিশাস্ত্র বলে ঃ—

কামৈঃ ন বিতৃপ্তিরস্তি।

অগ্নিতে ঘৃত প্রদান করলে যেমন অগ্নি ক্রমবর্ধমান হয়, সেরকম কামনা বাসনা ভোগের দ্বারা তৃপ্ত হবে না। রাজা নহুষ সমাগরা পৃথিবীর অধিপতি, ইন্দ্রত্বলাভ করেও মুনি ঋষিদের ধন আহরণে বিরত ছিলেন না। নীতি মানতে হবে, মানাতে হবে। নীতিই এতদিন জগৎকে এতদূরে এনেছে। নীতিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিধৃত। নীতি উপহাসযোগ্য নয়। শাস্ত্রীয় বিধান সংস্কার করে যুগোপযোগী করে নিতে হবে।

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় পৃথিবীর অনেক জাতি শিক্ষার সঙ্গে ধর্মকে বিস্মৃত হয়নি, খ্রিস্টধর্ম রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পেয়েই এত বিস্তৃতি লাভ করেছে। অতি অল্পসংখ্যক ইস্রায়েল ইহুদি জাতি বাইবেলের Classical literature কে অনুশীলন করে অদ্বিতীয় শক্তিরূপে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

আমাদের ভারতেও জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে একটা না একটা Classical literature এর অনুশীলন ও অনুধাবন করা যেতে পারে। পণ্ডিত নেহেরু তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Discovery of India তে উল্লেখ করেছেন—"If I was asked what is the greatest treasure which India possesses and what is her finest heritage, I would unhesitatingly answer—It is the Sanskrit Language and literature and all that it contains."

কিছুটা মনে হচ্ছে সংস্কৃত সাহিত্যের মৃত্যু, আমাদের একপ্রকার মৃত্যু। রামায়ণ, মহাভারতের আদর্শ আমরা ভুলতে বসেছি। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি "গীতা" পুস্তকটিকে তাঁর মাতৃদেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। জাতীয় অধঃপতনের একটি কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন—"I quite agree that the study of Sanskrit is sadly neglected"। অস্বীকার করার উপায় নেই যে সংস্কৃতের মধ্যে Educative Value সবচেয়ে বেশি। যদিও বিদ্যালয় সমূহে আজ সংস্কৃত পাঠের ব্যবস্থা আছে—এটা ঐচ্ছিক—এর আগা নেই ডগা নেই। শূন্যে ঝুলন্ত অবস্থায়। অশোক মিত্র কমিশন তা বুঝতে পারলেও এই ভাষা শিক্ষা ব্যবস্থায় অবাঞ্ছিত উপেক্ষিত। সংস্কৃত পাঠ সময়ের অপব্যয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আদর্শ পিছিয়ে পড়া জাতিকে ভারতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। ধর্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকন্না, শিশুপালন, স্বাস্থ্যনীতি এই সব শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, খনা, লীলাবতী, মীরাবাঈ, অহল্যাবাঈ,সংঘমিত্রা, রাসমণি, শ্রীশ্রীমা, সারদাদেবীর আদর্শ চোখের সামনে তুলে ধরতে হবে। মাতৃজাতিকে স্মরণ করতে হবে স্বামীজির সেই উদাত্ত আহ্বান "হে ভারত ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী দময়ন্তী" এখনও ঘরে ঘরে অজ্ঞাতসারে সীতা আছে বলেই পারিবারিক জীবন সামাজিক জীবন চলছে। ভারতবর্ষ চলছে। নইলে বন্য হয়ে যেতাম।

পাশ্চাত্যের অনুকরণে রাজনীতি নিয়ে আমরা মাতামাতি করছি। মনে রাখা দরকার রাজনীতিতে পাশ্চাত্যের মত আমরা সফল হব না। মনে রাখতে হবে পাশ্চাত্যের রাজনীতি করতে গিয়ে প্রাচ্যের আদর্শ যেন ভুলে না যাই। সকল জাতির কেবল ভালোটা আমরা অনুকরণ করব। আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে ভারতীয় নীতির আদর্শ কোনোক্রমে পরিহার করা যাবে না। ভারতীয় নাড়িতে যে ধর্মীয় শিক্ষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাকে বর্জন করা সমীচীন হবে না। মনে রাখা দরকার।

Education without instruction in morals and religion would create a race of hostile devility. শিক্ষিত আমরা অনেকেই Clever devils এ পরিণত হয়ে যাচ্ছি। সত্য অসত্যের ফল উপলব্ধি করছি না। কয়েকটা পাশ ও ভালো বক্তৃতা করতে পারলেই উপযুক্ত শিক্ষিত হওয়া যাবে না। স্কুল, কলেজ থেকে পাঠ্য থেকে যে আদর্শ পাওয়া যাবে তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে। যে শিক্ষার মধ্য দিয়ে দয়া, মায়া, স্নেহ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, উপচিকীর্ষা, সদ্বৃত্তি, দেশাত্মবোধ সৎসাহসিকতার সঞ্চার হবে না, সে কিসের শিক্ষা!

মুখে জানে ব্যবহারে নাই।
সে বিদ্যার মুখে ছাই।।

সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থাকে ঠিকমতো পরিচালনা ও বাস্তবে রূপায়ণ করে নৈতিক মানে উন্নত মানুষ তৈরি না করতে পারলে জাতির প্রকৃত উন্নতি নাই। আর এই পথে শিক্ষাকদিগেরই অগ্রণী ভূমিকা নিতেই হবে, নতুবা আশা হতাশায় পরিণত হবে। শিক্ষা মহান জাতি তৈরি করুক, ন্যায়পরায়ণ নাগরিক তৈরি করুক।

প্রার্থনা—শতবর্ষতম স্মারক পত্রিকায় এই প্রবন্ধ একটু স্থানলাভ করুক। সমস্ত গুরুভাই জাতির নির্মাতা অধ্যাপক ও হিতৈষীদিগের শ্রদ্ধা ভালবাসা ও প্রণাম জানাই। মহাত্মা ডেভিডকে পুনঃপুন শ্রদ্ধা ও ভক্তি জানিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করছি। ত্রুটি মার্জনীয়।

वक्त के साँचे को बदल जाते हैं कुछ लोग!

डॉ० कुमार विश्वबंधु

भारत में नवजागरण का आरंभ मोटे तौर पर उन्नीसवीं शती के दूसरे दशक के मध्य से माना जा सकता है। क्योंकि यही वह समय है जब राजा राममोहन राय ने ईस्ट इंडिया कम्पनी सरकार की नौ वर्ष पुरानी नौकरी छोड़ी (1814 ई०) और भारतवासियों को वर्षों के धार्मिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों, मृत मूल्यों व अर्थहीन सामाजिक संस्कारों से मुक्त कर, उन्हें ज्ञान-विज्ञान के नये आलोक में लाने के लिए अभियान छेड़ दिया। वे भारत के पहले आधुनिक व्यक्ति थे। पर आधुनिकता की जो नई दृष्टि उनके पास थी, उसमें केवल पश्चिमी शिक्षा की रौशनी का नयापन ही नहीं था, बल्कि उस दृष्टि में अपने देश की ज्ञान परम्परा और सांस्कृतिक विरासत का गहरा बोध भी था। उनका नवजागरण अभियान वास्तव में नवीन युग जीवन के संदर्भ में उसी ज्ञान परम्परा और सांस्कृतिक विरासत का नये सिरे से अन्वेषण, पुनरुद्धार औरं विकास का प्रयास था। उनके इस अन्वेषण अभियान में कई विदेशी विभूतियाँ भी उनके साथ थीं, जिनमें एक नाम उनके अंतरंग, सहयोगी और मित्र डेविड हेअर का भी है। कलकत्ता का प्रसिद्ध 'हेअर स्कूल' और 'डेविड हेअर ट्रेनिंग कॉलेज' उसी महामना के रचनात्मक कर्मों का जीता जागता स्मृति सौध है।

डेविड हेअर का जन्म सन् 1775 ई. में स्कॉटलैंड में हुआ था। अनुमान किया जाता है कि वे सन् 1800 ई०में घड़ी निर्माण के अपने पुश्तैनी कारोबार में किस्मत आजमाने कलकत्ता आए और फिर हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए। यहाँ की मिट्‌टी, यहाँ की हवा और यहाँ के लोगों के प्रेम में ऐसे पड़े कि फिर लौटना न हो सका। कुछ वर्षो तक व्यापार भी किया। सफल भी हुए। लोकिन व्यापार करना और धन जमा करना, उन्हें अधिक दिनों तक रास न आया। सन् 1816 ई० में उन्होंने अपना व्यापार बंद कर दिया और अब तक जो भी धन कमाया था, उन सब को लेकर भारतीय जन-जीवन में अलख जगाने निकल पड़े। सोचने वाली बात है कि पच्चीस वर्ष का एक विदेशी युवक अपनी जन्म भूमि स्कॉटलैंड से व्यापार करने और धन कमाने के मंसूबे लेकर दूर समुद्र पार हजारों मील की यात्रा करता हुआ भारत आता है, अपने मंसूबे में कामयाब भी होता है, और फिर अचानक एक दिन सब छोड़ छारकर एक गैर मुल्क के लोगों के जीवन को ऊँचा उठाने के लिए अपना तन-मन-धन सबकुछ दांव पर लगा देता है। इतना ही नहीं, उस महान मानव प्रेमी की अंतिम सासें भी यहीं कलकत्ता शहर में निकलती है। 31 मई की रात लगभग एक बजे उन पर उस समय की जानलेवा बीमारी कॉलेरा का हमला होता है और दूसरे दिन 1 जून, 1842 ई. की सुबह लगभग छह बजे उस महान आत्मा के जीवन का अंत हो जाता है।

लेकिन डेविड हेअर जैसे लोग शायद कभी नहीं मरते, मर ही नहीं सकते। क्योंकि ऐसे लोगों का जीवन अनायास ही स्थूल देह की सीमाओं का अतिक्रमण कर जाता है। वे एक देह से निकल कर अनेक-असंख्य मन में फैल जाते हैं - कहीं भावना बनकर, तो कहीं विचार

बनकर, ऐसे लोग अपने मूल्यादर्शों के साथ युगों-युगों तक जिंदा रहते हैं। जब तक पृथ्वी पर मनुष्य जाति रहेगी, जब तक मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति जीवित रहेगी... गौतम, गांधी, विवेकानन्द, राजा राममोहन राय और डेविड हेअर जैसे लोगों का अस्तित्व बना रहेगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय के ठीक सामने कॉलेज स्क्वॉयर में डेविड हेअर की प्रस्तर मूर्ति स्थापित है। जिसके एक तरफ उनके प्रयासों से स्थापित कलकत्ता मेडिकल कॉलेज है, तो दूसरी ओर एकदम पास-पास संस्कृत कॉलेज, हिन्दू कॉलेज (आज का प्रेसीडेन्सी कॉलेज) और कलूटोला ब्रांच स्कूल (आज इसका नाम हेअर स्कूल है) है। और ज्ञान-विज्ञान के इन सभी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केन्द्रों के उद्योक्ता डेविड हेअर शहर की धूल और धुँए के बीच आज भी उतने ही दृढ़, उतने ही अविचलित, उतने ही भावमय और विशाल...। मन करता है उनकी मूर्ति से पूछूँ......कौन हैं आप? क्या है आपका परिचय?......एक विदेशी? एक व्यापारी? एक समाज सुधारक? एक शिक्षक? या फिर एक मानव प्रेमी? लेकिन क्या सचमुच इन सवालों को उनसे पूछने की जरूरत है? यह भी एक सवाल है और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। हिन्दी के सुप्रसिद्ध समीक्षक डॉ. नामवर सिंह कभी-कभी उर्दू का एक शेर कहते हैं...''वक्त के सांचे में ढल जाते हैं कुछ लोग, वक्त के सांचे को बदल जाते हैं कुछ लोग''। डेविड हेअर वस्तुतः वक्त के सांचे को बदलने वाले लोगों में थे। इसलिए उनका परिचय किसी देश, काल और पेशे का मुहताज नहीं हो सकता। उनका सबसे बड़ा परिचय यह है क़ि वे सच्चे अर्थों में एक मनुष्य थे। ऐसा मनुष्य जिसके हृदय में मनुष्य मात्र के लिए प्यार था। समग्र मानव जाति के लिए महानुभूति थी। ऐसा मनुष्य जो सबको खुशहाल और आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता था। एक पराए देश में, पराए धर्म और पराई भाषा के लोगों के लिए उन्होंने यही सपना देखा था। भारत वे चाहे जिस भी सपने के साथ आए हों, भारत में कुछ समय रहने के बाद उनका सपना बदल गया। तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अशिक्षा, धर्म के नाम पर चल रहे मिथ्याचार, पाखंड व ढोंग तथा सामाजिक कुरीतियों के फलस्वरूप मनुष्य द्वारा मनुष्य के प्रति बरती जा रही क्रूरता और अमानवीयता ने एक व्यापारी के चोले में मौजूद उनकी कोमल आत्मा को हिला कर रख दिया। हिन्दी साहित्य के महान आधुनिक कवि और चिंतक गजानन माधव मुक्तिबोध के शब्दों में कहें तो यही वह महत्वपूर्ण मोड़ है जहाँ डेविड हेअर का व्यक्तित्वांतरण होता है और एक व्यापारी अपने व्यवसायिक नफे-नुकसान के तंग घेरे से बाहर निकल कर ''सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय'' के उस मार्ग पर निकल पड़ता है, जिसके लिए कभी कबीर ने कहा था-

कबिरा खड़ा बाजार में, लिये लुकाठा हाथ।
जो घर जारै आपना, सो चले हमारे साथ।

''कबिरा' दरअसल हर मनुष्य के भीतर मौजूद आत्मा की वह आवाज है, जिसकी पुकार को हम ज्यादातर लोग प्रायः सुनी-अनसुनी कर देते हैं। लेकिन हर युग और समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं, सुनकर समझते हैं और फिर उसे सहेजकर निकल पड़ते हैं जीवन की एक नयी यात्रा पर। लेकिन इस नयी यात्रा पर निकलने से पहले पीछे का सबकुछ जलाना पड़ता है। सब कुछ त्यागकर, छोड़कर हल्का होना पड़ता है। इसलिए सन् 1814 ई. में राजा राममोहन राय ईस्ट इण्डिया कम्पनी की नौ वर्ष पुरानी अच्छी

भली नौकरी से त्याग-पत्र दे देते हैं और डेविड हेअर 1816 ई. में अपने अच्छे-खासे पुश्तैनी व्यापार से अलग हो जाते हैं।

राजा राममोहन राय और डेविड हेअर, भारत को आधुनिकता की जिस नयी राह पर बढ़ता हुआ देखना चाहते थे, उसके लिए देश में व्यापक पैमाने पर शिक्षा का प्रचार-प्रसार आवश्यक था। जबकि भारत में उस समय शिक्षा की दशा अत्यन्त खराब थी। देशी शिक्षा व्यवस्था जैसी भी थी, एक तो उसका क्षेत्र ही बहुत सीमित था। दूसरे, अपने शास्त्रीय और रूढ़िवादी चरित्र के कारण, वह ज्ञान का प्रकाश फैलाने के स्थान पर तत्कालीन जीवन और समाज में फैले अंधकार को और भी गहरा कर रही थी। वह पतनशील सामंती व्यवस्था का अंतिम काल था और उस व्यवस्था की सारी सीमाएँ, कमजोरियाँ तथा विकृतियाँ तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था में भी साफ तौर पर देखी जा सकती थी। साथ ही अंग्रेजी साम्राज्यवादी औपनिवेशिक आर्थिक शोषण और राजनैतिक गुलामी ने उसकी रही-सही अच्छाइयाँ व ताकत भी उससे छीन ली थी। मानसिक कूप मण्डूकता, मिथ्याचार, दिखावा, जाति-पाति का भेद-भाव, छुआ-छूत, धार्मिक अंधविश्वास, आडंबर, बाल विवाह, सती प्रथा और न जाने क्या-क्या, देश के सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक जीवन को घुन की तरह खाए जा रहा था। इन्हीं परिस्थितियों में राजा राममोहन राय ने भारतीय समाज-जीवन को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम अपने हाथ में लिया। उन्हीं के अनथक प्रयत्नों का नतीजा था कि सन् 1835 ई. में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को हमेशा के लिए बंद कर दिया। और उन्हीं की मांग पर उसी साल अंग्रेजी सरकार ने अपने औपनिवेशिक फायदे के लिहाज से ही सही भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को मंजूरी दे दी। और जैसा कि राजा राममोहन राय ने सोचा था, वह एक हद तक फायदेमंद भी साबित हुई। भारतीयों का पश्चिमी ज्ञान-विज्ञान और आधुनिक विचारों से सम्पर्क बढ़ा। उन्हें सोचने-समझने की नयी दृष्टि मिली। अपनी वास्तविक शक्ति और सीमाओं को जानने-समझने का नया बोध पैदा हुआ। साथ ही आने वाले दिनों में वर्षों की औपनिवेशिक गुलामी से मुक्ति के लिए संघर्ष की जमीन भी तैयार होने लगी। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की नींव अपने व्यापारिक हित के लिए ही रक्खी थी, इसमें कोई शक नहीं। परंतु उसका कुछ लाभ भारतीयों को भी मिलना ही था, और वह उन्हें मिला। जिसका कुछ अंदेशा शायद अंग्रेजों को भी था। सन् 1831 ई. में मेजर जनरल एस. स्मिथ ने इस मुद्दे पर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था...''शिक्षा का परिणाम यह होगा कि वे सब सांप्रदायिक और धार्मिक पक्षपात जिनके द्वारा हमने अब तक मुल्क को वश में रखा है और हिंदू-मुसलमान दोनों को लड़ाए रखा है इत्यादि, दूर हो जाएंगे और उन्हें अपनी शक्ति का पता लग जाएगा।'' लेकिन उसके कुछ और भी दूरगामी नतीजे निकले, जिसके बारे में उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा। उसने हमसे हमारी भाषा ही छीन ली। सन् 1947 ई. को हमें राजनैतिक स्वतंत्रता तो मिल गयी लेकिन भाषाई गुलामी का जुआ आज भी हमारी गर्दन में पड़ा है, आगे भी न जाने कब तक पड़ा रहेगा। क्योंकि इस बीच हम अपना भाषाई स्वाभिमान ही गंवा बैठे हैं।

जो भी हो, तत्कालीन निराशाजन्य परिस्थतियों में अंग्रेजी सरकार और स्वतंत्र रूप से बहु संख्यक अंग्रेजों द्वारा भारत में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए जो भी प्रयत्न किए गए, उनका

उस समय विशेष महत्व था। इस संदर्भ में डेविड हेअर का नाम संभवतः हमेशा ही सबसे ऊपर रहेगा। खासकर इसके लिए भी कि सामान्य शिक्षा के साथ स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए भी उन्होंने बहुत बढ़कर काम किया। वह भी ऐसे समय में जिसके बारें में प्रसिद्ध इतिहासकार सर् यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि "बंगाली हिन्दुओं में यह धारणा घर कर गयी थी कि जो स्त्री पढ़ना लिखना आरंभ करती है, वह विधवा, वेश्या अथवा भिखारिन होने को अभिशप्त है।" इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय उनके प्रयत्नों की हिन्दू समाज में क्या प्रतिक्रिया हुई होगी। फिर भी उस समय की नारी शिक्षा के लिए काम करने वाली संस्थाओं को वे लगातार अपना समर्थन और सहयोग देते रहे। एक तरफ जहाँ उनका ध्यान आधुनिक ज्ञान एवं शिक्षण व्यवस्था पर आधारित प्रारंभिक शिक्षा पर था, वहीं पश्चिम के आधुनिक ज्ञान-विज्ञान पर आधारित उच्च शिक्षा की सुविधा भी वे इस देश के लोगों के लिए मुहैया करवाना चाहते थे। उस समय कलकत्ता के तीन प्रसिद्ध विद्यालय- आरपुली पाठशाला, पटलडांगा स्कूल और कलूटोला ब्रांच स्कूल (आज इसका नाम उन्हीं के नाम पर हेअर स्कूल है) की स्थापना के लिए ही नहीं, शुरुआती स्तर पर उसे ठीक प्रकार से चलाने और आगे बढ़ाने के लिए भी उन्होंने बहुत परिश्रम किया। उन्हीं के द्वारा कलकत्ता के कॉलेज क्वॉयर के उत्तर की तरफ अत्यन्त कम मूल्य पर उपलब्ध करवायी गयी जमीन पर संस्कृत कॉलेज तथा हिन्दू कॉलेज (आज का प्रसिद्ध प्रेसिडेन्सी कॉलेज) की नींव पड़ी। यही नहीं कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना में भी उनका बहुत हाथ रहा है। इसके अलावा शहर के दूसरे विद्यालयों में जाकर वहाँ की व्यवस्था को देखना, उन्हें सब प्रकार की सहायता और परामर्श देना, व्यक्तिगत तौर पर छात्रों का हाल-चाल पूछना, मेधावी छात्रों को छात्र वृत्ति देकर पुरस्कृत करना आदि उनकी रोजमर्रा की कार्य सूचि में शामिल था। साथ ही साधारण जनों की हर सम्भव सहायता के लिए भी वे हमेशा तत्पर रहते थे।

25/3, बालीगंज सर्कुलर रोड, कलकत्ता-700 019, के पते पर उसी महान मानव प्रेमी की पावन स्मृतियों को समर्पित आज का 'डेविड हेअर ट्रेनिंग कॉलेज' है, जो अपनी स्थापना के सौ वर्ष पूरे कर रहा है। अंग्रेज सरकार द्वारा स्थापित अंग्रेजी स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से 1 जुलाई, 1908 ई. को इस कॉलेज की स्थापना हुई थी। परंतु इसका आरंभ अपने वर्तमान पते पर नहीं बल्कि 15 नंबर कॉलेज स्क्वॉयर के एक मकान के दूसरे महले पर कुल पाँच कमरों के साथ हुआ था। श्री डब्लू. ई. ग्रिफिथ इस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल हुए। कॉलेज के लिए अस्थायी तौर पर मकान के पाँच कमरे दो वर्ष के लीज और मासिक सौ रुपए किराए पर लिए गए थे। एक जुलाई, बुधवारके दिन डेविड हेअर ट्रेनिंग कॉलेज की कक्षाएँ शुरू हो गई। उसी दिन शिक्षक के रूप में श्री एच. आरमिस्टेड भी कॉलेज से जुड़ गए। कुछ दिन बाद ही 10 जुलाई को पटना डिविजन के विद्यालय के निरीक्षक पद के कार्यभार से मुक्त होकर श्री थिकेट भी इस कॉलेज में पढ़ाने आ गए। इस तरह प्रिंसिपल को मिलाकर कुल तीन अध्यापकों और बीस स्नातक प्रशिक्षणार्थियों के साथ डेविड हेअर ट्रेनिंग कॉलेज की ऐतिहासिक यात्रा का श्रीगणेश हुआ।

अपनी स्थापना से अगले ग्यारह वर्षों तक कॉलेज, कॉलेज स्क्वॉयर के उन्हीं पाँच कमरों

में बना रहा। हालांकि कॉलेज के लिए स्थायी भवन निर्माण योग्य जमीन की खोज भी इस बीच होती रही थी। कॉलेज के अध्यक्ष श्री डब्लू. ई. ग्रिफिथ ने इस दिशा में काफी प्रयास के बाद शहर से दक्षिण की तरफ बालीगंज इलाके में एक जमीन का चुनाव किया और उसके अधिग्रहण का प्रस्ताव 2 अगस्त, 1914 ई. को सरकार के सामने पेश किया गया। भवन पुनर्निर्माण के कारण जून 1919 ई. को कॉलेज को मकान छोड़ने का नोटिस मिला। ऐसे में कॉलेज के लिए फिर से एक नए अस्थायी मकान की खोज शुरू हुई और अंततः 45, बेनिया टोला लेन की तीन मंजिल इमारत में कॉलेज को स्थानांतरित किया गया। इस मकान का किराया मासिक 650 रु था। इधर श्री ग्रिफिथ द्वारा प्रस्तावित जमीन का मामला कई तरह की प्रशासनिक खींचातानी और उठा-पटक से गुजरता रहा। जिसमें एक बार बह राजस्व विभाग के कब्जे में चला गया, जिसे शिक्षा विभाग ने 1922 ई. में उसे फिर अपने लिए हासिल कर लिया। अंततः बालीगंज में 1924 ई. में कॉलेज के लिए स्थायी भवन निर्माण का काम शुरू हुआ जो दूसरे वर्ष के अंत तक बनकर तैयार हो गया। सन् 1925 ई. में कॉलेज अपने नव निर्मित स्थायी भवन में पक्के तौर पर आ गया और तब से लेकर आज तक 25/3, बालीगंज सर्कुलर रोड, डेविड हेअर ट्रेनिंग कॉलेज का स्थायी पता बना हुआ है।

पिछले सौ वर्षों के लम्बे जीवन काल में इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक कॉलेज ने न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे, कितनी ही मुसीबतों का सामना किया, कई बार तो इसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। खासकर सन् 1932 ई. में निर्मित बंगाल रिट्रेंचमेन्ट कमिटी ने कुछ ऐसा ही प्रस्ताव सरकार के सामने पेश किया था। लेकिन इस कॉलेज से जुड़े लोगों और इसके चाहने वालों ने समय-समय पर इसे हर संकट से बचाया, इसे आगे बढ़ाया। समय-समय पर जगहें बदली, प्रिंसिपल और अध्यापक बदले, उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुए, कई बार इसका स्वरूप भी बदला लेकिन जो नहीं बदला वह है इसका सतत् विकासमान प्रगतिशील शैक्षिक चरित्र। प्रसिद्ध शायर गोरखपुरी फिराक का एक शेर है-"आने वाली नस्लें तुम पर फक्र करेंगी ऐ हम उम्रों, जब उन्हें मालूम होगा कि तुमने फिराक को देखा है।" डेविड हेअर ट्रेनिंग कॉलेज अपने जीवन के सौ वर्ष पूरे कर रहा है और हम सभी लोग फिर चाहे वह इस कॉलेज का प्रिंसिपल हो कि अध्यापक या कि छात्र, क्लर्क हो कि दरवान सबको इस बात के लिए गर्व करने का अधिकार है कि वह कॉलेज की इस ऐतिहासिक घड़ी का साक्षी बन रहा है। लेकिन अनायास ही सबके ऊपर एक दायित्व भी आ जाता है कि इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घड़ी में उस महान आत्मा को याद करें जिसके नाम पर यह कॉलेज है। याद करें कि कैसा था वह विदेशी जिसने अपना सबकुछ इस देश के लिए कुर्बान कर दिया और आज कैसे हो गये हैं हम लोग जो विदेश की सुख-सुविधा के लिए हर धड़ी देश छोड़ने को तैयार रहते हैं। याद करें कि कैसा था वह व्यापारी जो समाज सेवा और शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए अपने व्यापार से अलग हो गया और सोचें कि कैसे हैं हम लोग जो समाज सेवा तथा शिक्षा को ही मुनाफे के व्यवसाय में बदल चुके हैं। इस शतवर्ष में यह आत्म परीक्षण ही शायद हमारे लिए, इस देश के लिए डेविड हेअर के प्रति सच्ची श्रद्धांजली होगी।



শতবর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সঙ্গে মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী শ্রী সুদর্শন রায়চৌধুরী এবং কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী প্রণবকৃষ্ণ চৌধুরী।

A FEW WORDS ON TEACHER-EDUCATION IN WEST BENGAL

—Prof. D. Mahanta

The overall picture of Teacher Education in West Bengal does not look so bright. There is no coordinating link between Teachr Education at the Primary level and that at the Secondary level and no provision has yet been made for regular training of teachers at the higher level. Let us present here a synoptic view of teacher education in the State.

In the Secondary sector, we have at present about 26 regular Training College and 15 Training Departments attached to general Degree Colleges. These Training Colleges and Training Departments work under the general supervision and control of six Universities, -Calcutta, Burdwan, North Bengal, Kalyani, Viswa-Bharati and Jadavpur. Besides, there are two Post-Graduate Basic Training Colleges which also train teachers of secondary schools, but which are run by the Education Directorate of the State. Further, there are three more Training Colleges or Departments – one attached to the Education Directorate, one to Kalyani University and one to Calcutta University, the first two colleges run training courses for physical instructors and the last one for home science teachers. The annual intake capacity of all these Training Colleges or Departments taken together is around 7000 or so.

Recently the State Government has sanctioned the institution of part-time evening courses for secondary school teachers at about 130 Training Centres. These newly started training centres for part-time courses (of 18 months' duration) will be mostly located at the secondary schools of different districts and the intake capacity is likely to be around 6500. A few such centres under the jurisdiction of Burdwan and North Bengal University have already started functioning.

In the Primary sector, we have got about 46 Junior Basic Training Institutes and a few Guru Training Schools under the control of the Education Directorate. Besides, there are a few Senior or Junior Teachers' Training Courses for Elementary and Primary teachers run by a few Public and Private Bodies with the approval of the Education Directorate. The intake capacity of all these colleges taken together is around 6000 or so.

Thus we see that six Universities and the Education Directorate have been sharing the major responsibility of teacher-education in the State. But no provision has so far been made for establishing any satisfactory link among the Universities

themselves or between the Universities on the one hand and the Education Directorate on the other.

It will also be clear on scrutiny that inspite of the rapid growth of teacher-training institutions since the attainment of Independence, the development of teacher-education in this State has generally been unsystematic. In view of the recent government decision to restructure the educational system of this State, it has become imparative that along with the re-organisation of education at different levels, teacher-education should also be planned and re-organised keeping in view the reformulated aims and objectives of school, junior college and university education. Besides it is perhaps high time that over and above the quantitative expansion of teacher-education, we should plan for qualitative improvement of the products of teacher training institutions, specially for their 'external fitness'.

All these would lead to a strong case for creating a State Board of Teacher Education in West Bengal and we hope that our Education Directorate and Education Department would take an early decision in the matter.

The Indian Education Commission of 1964-66 strongly recommended the establishment of such State Boards of Teacher Education and the Commission also suggested interalia the functions of such Boards, as given hereunder :

1) Prescribing standards for training institutions.
2) Improving curricula, text books, instructional materials and other related programmes for teacher-education.
3) Prescribing conditions for recognition of training institutions and arranging their periodic inspection.
4) Offering consultative services to the training institutions.
5) Ensuring that persons completing the prescribed courses are found competent for the teaching job.
6) Preparing plans for short-term and long-term development of teacher-education, both quantitative as well as qualitative.



শতবর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দিচ্ছেন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী প্রণবকৃষ্ণ চৌধুরী।

TEACHER EDUCATION — A PROFILE OF WEST BENGAL

—Dr. Pronab Krishna Choudhury

Education plays an important formative role in our society. It makes individuals fit for their environment - both natural and socio-cultural – through the development of their abilities. Education empowers a helpless child to lead a successful life in future. This empowerment occurs through teaching and instruction in the classroom. It has been truly said that "the destiny of India lies in its classroom" and "the teachers build the future citizens of the country". A lot of responsibilities lies with the teachers and the teachers must be properly equiped to perform their jobs. The teachers should develop necessary knowledge, skills and attitudes to assume these responsibilities and perform their duties in an effective manner. Our teachers are required to be properly trained and educated to achieve the objectives of our education system. Teacher Education colleges have been set up in our country to remain engaged in the development of qualified professional teachers.

Since independence there has been an unprecedented demand for education and as a result the number of students and schools has increased manifold in the last few decades. The Indian education system has expanded in terms of educational institutions, enrolment, diversified courses, teachers and other physical facilities. The teacher education colleges consequently has increased in number with little considerations of quality of training. The teacher education colleges are facing a lot of problems and the most important problem is the disparity in the quality of teacher education programmes in the country.

NCTE Act and its impact on Teacher Education :

The parliament framed the National Council For Teacher Education Act, 1993 for planned and coordinated development of teacher education system throughout the country. In accordance with the provisions of the aforesaid Act, Rules and Regulations framed thereunder, every institution imparting teacher training is entitled to run such course, only after it has received recognition from the NCTE. The requirement of the infrastruture, faculty members with prescribed qualifications and the intake permitted for such institutions, has been regulated under the provisions of the Act & Regulations of NCTE.

In West Bengal there were, in all, 46 institutions offering B.Ed course and 56 Primary Teachers' Training Institutes before NCTE Act came into effect in 1995. These institutions were either Government or Government aided. On an average the intake capacity of these colleges was about 150-200. There was

no gap between demand and supply for recruitment of trained teachers either at secondary level or at primary level. From 1996 onwards the colleges started submitting applications to the Regional office of the NCTE for getting recognition. But very few colleges got recognition that too with an intake of 50 for PTTIs and 60 for B.Ed. Colleges. Majority of the colleges sighed away from submitting application for recognition to NCTE because they were unable to fulfil the unrealistic / unachievable norms prescribed by the NCTE.

In West Bengal till 2004-2005 session both the recognised and unrecognised colleges offered training without any difficulty. But in the year 2006 the Hon'ble Calcutta High Court issued an order against a PIL that no teacher education college should run without getting recognition of NCTE. Consequently all the unrecognised B.Ed., BPEd & Primary Teachers' Training Institutes were closed down and the students who were already admitted and attended classes during the session 2005-2006 were debarred from appearing in the examination. To remove the stalemate an ordinance was promulgated for validation of the courses offered by those unrecognised colleges in the state. Accordingly, the Bed & BPEd degrees of students, who passed from unrecognised colleges up to 2005 were validated and permission to appear in the B.Ed. & BPEd examination scheduled to be held in 2006 was given by the NCTE in exchange of penalty to the tune of about Rs 10 Crores. But the PTTIs could not submit the penalty and missed the opprotunity as the matter in their case was subjudice. The situation has not yet improved.

At the beginning the number of recognised colleges were inadequate to cater the need of the state and as consequence tremendous pressure was mounting. The Government could not sit idle and decided to allow private enterprises to establish teacher training colleges in the state. In the mean time most of the unrecognised teacher training colleges tried hard to get recognition from the NCTE. During 2006 and 2007 ie, within a span of two years, inspite of so many hurdles, most of the colleges got recognition. As of now, in West Bengal, 07 Government 34 Government aided B.Ed. Institutions and 42 Private B.Ed. Colleges are recognised. Among the BPEd Colleges 4 Govt., 5 Govt. aided and 6 Private Colleges are recognised by the NCTE.

So far the recognition of PTTIs is concerned only 33 colleges are recognised till date and the rest of the college are eagerly waiting. Among those 33 recognised colleges 11 are govt, 7 govt aided and 115 private institutions.

If we look into the district-wise distribution of recognised private institutions, in Murshidabad 6 B.Ed colleges have so far been recognised whereas in Hooghly and Darjeeling no such college has yet been established (Table 1). However, in respect of number of NCTE recognised B.Ed and BPEd colleges, West Bengal occupies the topmost position in the eastern region (Table 2).

This is also true in case of PTTIs. There are about 138 PTTIs in the state though majority of these colleges are yet to get recognition of NCTE.

Matter of Concern : One of the functions of NCTE as envisaged in its statute is to take all steps to prevent commercialisation of teacher education and the council insists upon a declaration from the applicant institutions that the college would run on no profit no loss basis, but unfortunately, the scenario is something different. It is alleged that majority of self financing colleges are collecting money at an exorbitant rate in the name of donation and / fees taking advantage of the situation. Till date no step has been taken by the NCTE against the errant institutions. NCTE is indirectly acting as a facilitator of commercialisation of teacher education instead of preventing it.

Some people are of opinion that NCTE has :

- Allowed unchecked proliferation of teacher education institutions in the country.
- Granted recognition to colleges irrespective of demand for teachers in that state.
- Concentrated more on infrastructure rather than teaching process and curriculum.
- Granted recognition to more Bed colleges than necessary in some states, such as Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Maharastra and neglected primary teacher education.

There are other serious allegations against the NCTE. Recently Sudip Banerjee report has recommended scrapping of the NCTE. The Government of India will decide as to whether the NCTE Act will be repealed or amended. However, one should not hesitate to welcome the council if it takes necessary steps for addressing the grey areas :

- Regarding qualification of Lecturer in elementary teacher education institution Diploma in Elementary Teacher Education or 5 years teaching experience in elementary school or elementary teacher education institution should be waived or should be made desirable. MA/MSc. with B.Ed should be accepted instead of MA/MSc. with Bachlor or Elementary Education (B.E1.Ed) because this course is not offered by any university in West Bengal. Secondly, as such, both B.Ed. and B.E1.Ed course are basically same and if at all any extra input is felt necessary that could be provided through in-service teacher education.

  Regarding Principal of PTTIs, teaching experience in elementary teacher education institution should be made desirable not compulsory atleast for coming 5/10 years. Alternatively, teaching experience in secondary teacher education college may serve the purpose. Retired teachers of B.Ed colleges may be appointed on contract basis upto the age of 65 years pending recruitment of a regular Principal.

- Regarding Principal of B.Ed. Colleges, Retired Readers / Principals of B.Ed. Colleges may be appointed as Principal in B.Ed college on contract basis upto the age of 65 years pending recruitment of a regular Principal.
- The minimum built up area for an institution with 100 intake capacity should be 1000 sq mts instead of 1500 sq mts. In case of institutions located in the cities or hills the built up area and Land area should be relaxed on merit basis. In case of Govt and Govt aided collegs or any other college established long before the NCTE Act came into effect, new norms of land area and built up area should not cause any impediment.
- There should have scope for using Psychology Lab, E T Lab, Language Lab etc in the course / curriculum of the Universities or Boards.
- There should have some Regulatory Mechanism to maintain uniformity in Curriculum Transaction, Practice Teaching, Fee Teaching, Fee Structure, Salary of staff and in the overall management of Teacher Education Institutions.
- Coordination & cooperation amongst the Institutions, concerned affiliating bodies, College Service Comission, School Service Comission, State Govt. and the Central Govt. do not at present prevail. But this is necessary for safeguarding the interest of all.

Silver Lining :

The National Policy on Education 1986 has developed a scheme of restructuring and vitalizing the entire pattern of teacher education. According to this scheme both the primary teacher training and secondary teacher training courses are to be considered as pre-service teacher education. The prospective teachers of primary level should be oriented with the spirit of Universal Elementary Education. They should be sensitized to deal with pupils from rural and weak socio-economic background, working children and also children with disability. In each district one PTTI has been upgraded to District Institute of Education and Training (DIET) to provide academic and resource support at the grass-root level for the success of various strategies and programmes undertaken for the realization of Universalization of Elementary Education. Some B.Ed. Colleges have ben upgraded to College of Teacher Education (CTE) and depending on the number of districts in a state one or two colleges have been elevated to Institute of Advanced studies in Education (IASE) in each state.

In West Bengal 16 PTTIs have been elevated to DIETs for in-service training of primary teachers of the state. Six B.Ed. Colleges have been upgraded to CTEs mainly for in-service training of secondary school teachers. David Hare Training College has been given the status of IASE. David Hare Training College has been entrusted with the in-service training of teacher educators of primary and secondary teacher education colleges and also Headmasters of secondary schools

of the state. David Hare Training College has also been engaged in research and in organising orientation programmes through seminars, workshops and conferences.

Most of the DIETs, CTEs and IASE were established during the 9th Plan period with the financial assistance of Ministry of Human Resource Development, Govt. of India. The fund was sanctioned mainlyh for the development of infrastructure. The amount sanctioned for the civil work was inadequate and as a result the buildings remained incomplete in some colleges including David Hare Training College. However, fund has been available for the implementation of various development programmes. It is expected that in future there shall be more coordination and enthusiasm to make the in-service teacher education programme a success.

Table -1 : District wise distribution of NCTE recognized T eacher Education Institutions in West Bengal

Sl. No.	DIST.	PTTI			B.Ed			B.P.Ed.		
		Govt.	Govt.	Private Aided	Govt.	Govt.	Private Private	Govt.	Govt. Aided	Private
1	Kolkata		4	1	2	9	4	1	1	1
2	S.24 Parganas		1			1	1			
3	N.24 Parganas	2	1		1	5	3	1		
4	Howrah					2+1*	3			
5	Hooghly	1		2	2	1*		1		
6	Burdwan			2	1	2+1*	4			
7	Bankura	1		1		1	3		1	1
8	Birbhum		1			1	3		1	
9	Nadia	2				2	1		1	
10	Murshidabad	1		1		1	6		1	2
11	Purba Medinipur	1		4		3+1*	4			1
12	Paschim Medinipur			1		1+1*	2			
13	Darjeeling					2				
14	Jalpaiguri	2				1	2			1
15	Coochbehar	1				1	1	1		
16	Maldah				1		1			
17	Dakshin Dinajpur						2			
18	Uttar Dinajpur					1	1			
19	Purulia			3		1	1			
	Total	**11**	**7**	**15**	**7**	**34+5***	**42**	**4**	**5**	**6**

* Yet to be recognized.

Table-2 : Number of NCTE recognised Teacher Education Institutions in Easter Region

Name of States	Pre school	Elementary	BEd	BEd distance	MEd	BPEd	MPEd
Arunachal Pradesh	–	6	2	–	–	–	–
Assam	–	22	49	–	4	–	–
Bihar	1	32	23	3	1	1	–
Jharkhand	–	22	37	–	–	–	–
Manipur	–	8	6	–	2	–	–
Meghalaya	–	7	4	–	–	–	–
Mizoram	–	3	2	–	–	–	–
Nagaland	–	4	3	–	–	–	–
Orissa	9	65	16	–	6	3	2
Sikkim	–	2	2	–	1	–	–
Tripura	–	4	3	1	1	1	–
West Bengal	–	32	83	–	4	14	3

Table- 3 : Names and Address with category and year of NCTE recognition of Teacher education colleges in the districts of West Bengal.

District	Name of Institution	Category	Year of NCTE recognition
Kolkata	1. David Hare Training College, 25/3 Ballygunge Circular Road, Kolkata-700 019	Govt.	2000
	2. Institute of Education for Women, Hastings House, 20B Judges Court Road, Alipure, Kolkata-700 027	Govt.	2001
	3. Department of Education, University of Calcutta, 1, Reformatory Street, Alipore, Kolkata-700 027	Unviersity Dept.	2002
	4. Department of Education, Rabindra Bharati University, EB Campus, 56-A, B. T. Road, Kolkata-700 050	University Dept.	2005

District	Name of Institution	Category	Year of NCTE recognition
	5. Acharya Jagadish Chandra Bose College, 1/1B, Acharya J. C. Bose Road, Kolkata-700 020	Govt. Aided	2001
	6. St.Xaviers College, 30 Park Street, Kolkata-700 016	Govt. Aided	2005
	7. Shri Shikshayatan College, 11, Lord Sinha Road, Kolkata-700 071	Govt. Aided	2003
	8. Calcutta Girls' BT College, 6/1, Swinhoe Street, Ballygunge, Kolkata-700 019	Govt. Aided	1997
	9. Loreto College, 7, Middleton Row, Kolkata-700 071	Govt. Aided	1997
	10. Satyapriya Roy College of Education, AA-287, Salt Lake, Sector-1, Kolkata-700 064	Govt. Aided	2004
	11. Sammilani Teachers' Training College, Sammilani Mahavidyalaya, EM Bye Pass, Kolkata	Private	2005
	12. Shyama Prasad Institute of Education and Training, 5/B, R. Dasgupta Road, Kolkata-700 026	Private	2007
	13. Jagadish Chandra Basu Sikshak Sikshan Mahavidyalaya, 113/1, Garfa Main Road, Kolkata-700 075	Private	2007
Howrah	1. Bijoy Krishna Girl's College, Mahatma Gandhi Road, Howrah-700 001	Govt. Aided	2002
	2. Ramkrisha Sikshan Mandira Belur Math, Howrah-711202	Govt. Aided	2003
	3. Uluberia College, Uluberia, Howrah-711315	Govt. Aided	–
	4. Gangadharpur Sikshan Mandir, Gangadharpur, Howrah-711302	Private	2006

District	Name of Institution	Category	Year of NCTE recognition
	5. Surendralal Das Teachers' Training College, P.O. Ananda Nagar, P. S. Bally, Howrah-711227	Private	2007
Hooghly	1. Govt. Training College, Chawkbazar, Hooghly, Pin-712103	Govt.	2000
	2. Institute of Edn (PG) for Women, Chandan Nagar, Khalisani, Hooghly, Pin-712 138	Govt.	2001
	3. Ramkrishna Sarada Sikshan Mandir, Anur, Hooghly	Govt. Aided	–
Burdwan	1. Govt. College of Education Kazirhat, Lakurdih, Burdwan, Pin-713102	Govt.	2000
	2. Burdwan University, Institute of Science Education, Rajbali, Burdwan, Pin-713104	University Dept.	2000
	3. Katwa College, Katwa, Dist. Burdwan, Pin-713130	Govt. Aided	–
	4. Kalna College, Kalna, Dist. Burdwan, Pin-713409	Govt. Aided	2007
	5. Mahananda College, Nadiha, Durgapur, Dist. Burdwan, Pin-713201	Private	2005
	6. Galsi Rabindra Nazrul College of Edu., Galsi, Dist. Burdwan, Pin-713406	Private	2006
	7. Bijoy Pal Memorial B.Ed.College, 65 Station Road, P. O. Burnpur, Dist. Burdwan, Pin-713325	Private	2007
Bankura	1. Nikhil Banga Sikshan Mahavidyalay, P.O. Bishnupur, Dist. Bankura, Pin-722122	Govt. Aided	2006
	2. Athena BEd College, Vill. Churamonipur, P. O. Sonamukhi, Dist. Bakura, Pin-722207	Private	2007
	3. Swaraj Nagar Teachers' Training College, P. O. Khatra, Dist. Bankura, Pin-722146	Private	2007

District	Name of Institution	Category	Year of NCTE recognition
	4. Bankura College of Education, At. Katjuridanga, P.O. Kenduadihi, Dist. Bankura, Pin-722102	Private	2007
South 24 Parganas	1. Fakir Chand College, P.O. Diamond Harbour, Dist. South 24 Parganas	Govt. Aided	2007
	2. El Bethel, Rasapunja, Bishnupur, Dist. South 24 Pgs.	Private	2008
	3. Parameswar Mahavidyalaya, Namkhana, South 24 Pgs. Pin-743357	Private	2007
North 24 Parganas	1.Govt. of College of Education, Banipur, North 24 Pgs, Pin-743233	Govt.	2000
	2. Ram Krishna Mission Brahmananda College of Education, Rahara, North 24 pgs. Pin-743186	Govt. Aided	2002
	3. G. C. Memorial College of Education, New Barrackpore, North 24 Pgs., Pin-743276	Govt.	2002
	4. Gobardanga Hindu College, Gobardanga, Khantura, North 24 Pgs.-743273	Govt. Aided	2006
	5. Gandhi Centenary BT College, Habra, Prafullanagar, North 24 Pgs, Pin-743268	Govt. Aided	2005
	6. Nandalal Ghosh BT College, Panpur, P. O. Narayanpur, North 24 Pgs, Pin-743123	Govt. Aided	2007
	7. Swami Vivekananda College of Education for Women, 20, Riverside Road, P. O. Barrackpore, North 24 Pgs, Pin-700120	Private	2007
	8. Kolkata Teachers' Training College, Panpur, P. O. Narayanpur, Dist. North 24 Pgs, Pin-743126	Private	2007

District	Name of Institution	Category	Year of NCTE recognition
Birbhum	1. Binoy Bhawan, Dept. of Education, Visva Bharati, Santineketan, Dist. Birbhum, Pin-731235	University Dept.	1998
	2. Tarasankar Bandyopadhyay BEd Institution, P. O. Kuchighata, Dist. Birbhum, Pin-731201	Private	2007
	3. Rabindra nazrul Smriti BEd Educational Institute, P. O. Hetampur, Dist. Birbhum, Pin-73124	Private	2007
	4. Santineketan Boniad BEd Training Institute, At. Rabindrapalli, P. O. Santineketan, Dist. Birbhum, Pin-731233	Private	2007
Nadia	1. Dept. of Education, University of Kalyani, P. O. Kalyani, Dist. Nadia, Pin-741235	University Dept.	2001
	2. Shimurali Sachinandan College of Education, Shimurali, Dist. Nadia	Govt. Aided	2005
	3. Krishnanagar BEd College, 56 Ramsey Road, Chasapara P. O. Krishnanagar, Dist. Nadia, Pin-741101	Private	2007
Murshidabad	1. Union Christian Training College, Berhampore, Dist. Murshidabad, Pin-742101	Govt. Aided	2000
	2. Education College, P. O. Basantapur, Dist. Murshidabad, Pin-742406	Private	2007
	3. Prabharani BEd College, 2No. Banjetia, Berhampore, Dist. Murshidabad, Pin-742101	Private	2007
	4. Jalangi BEd College, Vill. Narasinghapur, P. O. Sagarpara, Dist. Murshidabad, Pin-742306	Private	2007
	5. Aurangabad BEd Training College, At & P.O. Aurangabad, Dist. Murshidabad	Private	2007

District	Name of Institution	Category	Year of NCTE recognition
	6. Pandit Raghunath Murmu Teachers' Training College, P. O. Palsanda More, Dist. Murshidabad, Pin-742184	Private	2007
	7. Aurangabad BEd College, P.O. Aurangabad, Dist. Murshidabad, Pin-742201	Private	2007
Purba Medinipur	1. Tamralipta Mahavidyalaya, At & P.O. Tamluk, Dist. Purba Medinipur, Pin-721636	Govt. Aided	2007
	2. Yogoda Satsanga Palpara Mahavidyalay, P.O. Palpara, Dist. Purba Medinipur, Pin-721458	Govt. Aided	2007
	3. P. K. College, P.O. Contai, Dist. Purba Medinipur, Pin-721401	Govt. Aided	–
	4. Panskura Banamali College, Panskura, Dist. Purba Medinipur, Pin-721152	Govt. Aided	2007
	5. Institute of Education, Haldia, ICARE Complex, Hatiberia, Dist. Purba Medinipur	Private	2005
	6. Subhas Chandra Basu BEd Training College, Vill. Jaramagar, P.O. Heria, Dist. Purba Medinipur, Pin-721430	Private	2007
	7. Kabi Sankanta Secondary Teachers' Training Institute, At & P.O. Reapara, Nandigram, Dist. Purba Medinipur, Pin-721650	Private	2007
Paschim Medinipur	1. Vidyasagar Teachers' Training College, Medinipore, Dist. Paschim Medinipur, Pin-721101	Govt. Aided	2007
	2. Sevayatan B T College, Sevayatan, Jhargram, Dist. Paschim Medinipur	Govt. Aided	–
	3. Dr. B. R. Ambedkar College, P. O. Malighati, Debra, Dist. Paschim Medinipur, Pin-721211	Private	2006

District	Name of Institution	Category	Year of NCTE recognition
	4. Bengal College of Teacher Education, Vill.-Dhurabila, Dhamkuria Chandrakona Town, Paschim Medinipur, Pin-721201	Private	2007
Darjeeling	1. Shree Ramkrishna B. T. College, 27, Gandhi Road, Darjeeling, Pin-734101	Govt. Aided	2001
	2. Siliguri BEd College, P. O. Kadamtala, Siliguri, Dist. Darjeeling	Govt. Aided	2005
Jalpaiguri	1. A. C. Training College, Nayabasti, P.O.& Dist. Jalpaiguri, Pin-735101	Govt. Aided	2007
	2. Eastern Dooars BEd Training College, Alipurduar, Bhatibari, Dist. Jalpaiguri	Private	–
	3. Falakata BEd College, Vill. Muktipara, P.O. Jalpaiguri, Pin-735211	Private	2007
Coochbehar	1. University BT and Evening College, Kesab Road, Munjabari, Coochbehar, Pin-736101	Govt. Aided	2001
	2. Coochbehar BEd Training College, P.O. Tangomari (Rajarhat), Dist. Coochbehar, Pin-736101	Private	2007
Malda	1. Govt. Teachers' Training College, P. O. & Dist Malda, Pin-732101	Govt.	2000
	2. Satish BEd College, Near Polytechnic College, P.O. & Dist. Malda, Pin-732102	Private	2006
Dakshin Dinajpur	1. Balurghat BEd College, Mongalpur, P.O. Balurghat, Dist. Dakshin Dinajpur, Pin-733101	Private	2005
	2.. Gangarampur BEd College, P.O. Kaldighi, P.S. Gangarampur, Dt. Dakshin Dinajpur, Pin-733124	Private	2006

District	Name of Institution	Category	Year of NCTE recognition
Uttar Dinajpur	1. Raiganj BEd College, P.O. Karnajora, Dist. Uttar Dinajpur, Pin-733130	Govt. Aided	2007
	2. Maulana Abul Kalam Azad Teachers Training College, Vill-Ranipur, P.O. Tina, P.S. Itahar, Dist. Uttar Dinajpur	Private	2006
Purulia	1. Sponsored Teachers' Training College, Deshbandhu Road, Purulia	Govt. Aided	2003
	2. Manbhum Institute of Education and Social Science, Tata Road, P.O. Dulmi Nadiha, Dist. Purulia, Pin-723102	Private	2007

PROSPECT OF TEACHER EDUCATION PROGRAMME IN INDIA

—Dr. Dilip Kumar Chakraborty,
Ex-Principal

'Teacher education is an integral component of the educational system. It is intimately connected with society and is conditioned by the ethos, culture and character of a nation. The constitutional goals, the directive principles of the state policy, the Socio-economic problems and the growth of knowledge, the energing expectations and the changes operating in education etc. call for an appropriate response from a futuristic education system and provide the perspective within which teacher education programme need to be viewed.' (NCTE)

The concept of teacher education existed in India even in ancient period, although it was not well organised. It is found in 'Upanishadas' that Guru is instructing disciples, who have become 'Snatakas' (completed studies), how to deliver lessons to the young 'Brahmacharis' (Students). This system continued for a pretty long time until Buddistic philosophy and system of education became predominant. When Taxila, Nalanda, Patilaputra etc. became international centres of learning, a well developed system of teaching - learning was in practice there in, but no concept of teacher education could be traced during that time. During Muslim rule, no systematic teaching - learning process could be traced, but some centres developed under the patronage of rulers for practice of Islamic Theology. However, a system of elementary education still continued at the grass root level in Maqtabs and Pathshalas, but there was no provision for training of teachers in those days. During the first half of nineteenth century a report was published on indegenous education by Rev. Adam. In his report Rev. Adam had mentioned about 'monitorial system' in teaching which may be called a preliminary concept in teacher training.

The first systematic attempt in respect of teacher education was made by the European Missionaries. William Carey, a renowned educationist at Serampore, had set up a Normal School for training of primary teachers. The said school started functioning at Serampore. A few more such schools were set up at and around Calcutta thereafter. Similar schools were also set up at Bomaby and Madras subsequently.

During the second half of nineteenth century, need of training secondary teacher was also thought of by the British rulers. In the Wood's Despatch of 1854, training of teachers was stressed upon. Some Govt. Normal schools for



কলেজের শতবর্ষ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং প্রাক্তনীগণ।

training of teachers at plrimary and secondary level were set up in the country subsequently. But, a systematic concept of teacher education was yet to be developed in India. The Hunter Commission of 1881 pointed out that teacher education should be more organised for the Sake of development of school education.

Need for a well developed system of teacher education was focussed in the educational resolutions framed by Lord Curzon in the beginning of twentieth century. It was laid down in the said resolutions, which came out in 1902.

1. More men of ability and experience in the work if higher training school should be enlisted to provide an adequate staff of well trained members of the Indian Education Service.

2. The equipment of a training College for Secondary teachers is at least as important as that of an arts college.

3. For gradnat, the training course should be one year University Course leading to university degree or diploma. The course should be chiefly directed towards imparting to them a knowledge of the principles which underlie the art of teaching and some degree of technical skill in the practice of arts for others. It should be a two year course, conbracing the extension, consideration and revision of their general studies to make them capable teachers.

4. The training in the theory of teaching should be closely associated with its practice, and for this purpose, a good practising school should be attached to each college.

5. Every possible care should be taken to maintain a connection between the training college and the school, so that the student on leaving college and entering his career as a teacher may not neglect to practise the methods which he has been taught.

As a follow up of educational resolutions of 1902 Indian Education Act was passed in 1904. A Royal Commission was constituted in 1905 to recommend measures for improvement of vernacular teaching. In pursuance of the recommendation of the said commission a degree college for teachers training was set up at Calcutta in 1908 which was named as 'David Hare Training College' in memory of David Hare who took a leading role in setting up Hindu College, Hare school and many other institutions. This is to mention here curriculum for B.T. Course conducted in David Hare Training College was framed at the London University since Teacher Education Department did not exist in Calcutta University or any other University in India at that time. B.T. course was an advanced concept in Teacher Education in India. It gained much

importance in education circle of this country so much so that about 40 B.T. Colleges were reported to be functioning in the country before 'independence. Besides, department of education was started in about 30 universities in India during the said period.

After independence, the Secondary Education Commission constituted in 1952-'53 stressed the need for adequate training of school teachers in the interest of betterment of school education. As such, a professional Body named National Council of Educational Research and Training (NCERT) was set up by the Govt. of India for conducting in depth educational programmes related to school education and teacher education. N.C.E.R.T. opened a new dimension of Teacher Education in the country by launching inservice courses refresher courses for the school teacher as well as teacher educators. The Regional Colleges of NCERT located at different regions introduced some advanced level programmes in Teachers Education like M.Ed. MAMEd / M Sc. MEd, Ph.D. etc.

Despite this progress in the field of Teacher Education in the country, it was being felt by the educationists as well as by the people concerned that Teacher Education unless revitalised would become irrelevant in regard to the school education system. The National Policy of Education 1986 remarked that necessary steps needed to be taken immediately so as to make Teacher Education programme meaningful and responsive to the changed curriculum and practice in schools. The Programme of Action (POA) of NPE'86 pointed out.

'* Professional Commitment and overall competencies of teachers leave much to be desired;

* The quality of preservice education has not only not improved with recent developments in pedagogical science, but has actually shown signs of detoriation,

* Teacher education programmes consist mainly of preservice teacher training with practically no systematic programmes of inservice training facilities which are lacking;

* There has been an increase in sub-standard institutions of teacher education and there are numerous reports of malpractices, and

* The support system provided by the State councils of Educational Reserch and Training (SCERTs) and the University Departments of Education has been in sufficient and there is no support system below the state level.'

In pursuance of the recommendations of NPE'86 a scheme of reconstruction of Teacher Education programme in the country has been connected by the Ministry of Human Resource Development of the Govt. of India. According to this scheme, the expected goal of the Teacher Education Colleges is to develop desired competencies within school teachers through preservice and

inservice teacher education programmes with the help of teacher educations who are expected to have in depth knowledge in both pedagogical areas and methodologies of transacting various subjects in class rooms. For the purpose, some teacher educator Colleges of refute in the country were upgraded as 1) District Institutes of Education and Training (DIETs), 2) Colleges of Teacher Education (CTEs) and 3) Institutes of Advanced Studies in Education (IASEs).

Besides, a professional body named National Council For Teacher Education (NCTE) was entrusted by the MHRD to monitor the activities of the Teacher Edudcation pgrogramme throughout the country. But, it is matter of that despite all the attempts to revitalize Teacher Education in the country, it seems, however that the said programme has not been able to fulfill the desired objectives due to the following reasons:

a) Teacher Education programmes, both preservice and inservice , are still remain in isolation and those have no bearing on either the main stream of education or school education process.

b) The people of India has to face many new Challenges in the twentifirst century. Population increase beyond a controllable limit has generated more number of people below poverty line without having proper foods, shelter, safe drinking water, sanitation and education. On the other hand, our country has to march forward with the scientific and technological programmes, modern communication system, competition in the global market and development of manpower competent to respond in the rapidly growing field of Information Technology. The conventional Teacher Education programme cannot meet those challenges.

c) Commercial attitude and outlook devleoped in the Society has caused erosion of values in the new generation of learners. Unfortunately, the existing Teacher Education programme has failed to offer any resonable solution to this problem.

d) Due to continuous increase in population size of the country the traditional system of schooling has become almost inaccessible to a large number of children and the picture is becoming still worse day by day.

e) Well developed techniques or strategies are still wanting in respect of education of the children who are physically or mentally challenged. The scheme of 'inclusive education' launched by the Ministry of Social Justice of the Govt. of India is still in the experimental stage.

f) The fund allocation either at the Central level or at the State level is far behind the minimum quanta required to fulfil the Sarva Siksha Abhiyan.

It seems, the conventional scheme of Teacher Education is not adequate to

meet the above problems and challenges. Therefore, a new vision in matter of Teacher Education is required so that it may function in the desired way. A silver lining in the gloomy picture is that new thoughts have emerged in our country in respect of education in general and teacher education in particular, which have focussed the following agenda.

a) Determining new objectives in teacher education
b) Designing new content
c) Student centred education and dynamic method of teaching
d) Priorities in learning society,
e) New dimension in teacher role,
f) Access and equity in education
g) Decentralized planning / management,
h) Community participation and capacity building,
i) Increased role of NGOs,
j) Distance / open learning system
k) Partnership between public and private sectors. (Vision 2020: Orissa)

The above mentioned areas are to be taken proper care of for bringing systematic and meaningful, changes in Teacher Education. However, identification of the problems is only a necessary condition for improvement of the system, sufficient condition for the above purpose will be to take possible steps to improve the system within at least reasonably appreciable time limit. The steps which have been focussed by the educationists are shown below :

* Adequate funding is necessary for updating and upgradation of Teacher Education programme vis-à-vis the total educational reconstruction scheme in the country. A public-private partnership is perhaps necessary for provision of fund for the purpose.

* A new pedagogical concept which is suited for contextual framework of our country is to be designed for imparting developing creative competencies within the teachers, so that they may be able to generate new knowledge.

* Value oriented education should from the basic framework of the Teacher Education pattern.

* The teacher should be capable of dealing with new horizon of concepts like Information Technology, Biotechnology, Nano Technology etc. The teacher Education curriculum should aim at capacity building of teachers.

* A new strategy / approach is to be developed within the Teacher Education frame for bringing a large section of children within the arena of education within a specific time frame.

* Teacher Education programe should not flow in isolution. Integration of this programme with other branches of knowledge and other programmes followed in Govt. / Private enterprises is necessary.

* The teachers must be equipped through teacher education programme with necessary competency to handle the EDUSAT programme, which are special programmes telecast though the Education Satellite Channel in India.

* It has been pointed out by many educationals that an uniform pattern of school education cannot perhaps do justice to divergent culture and local problems in distant parts of our country. So a culture specific education programme with local variations must have a place in Teacher Education programme.

It is envisaged that reorientation / reconstruction of Teacher Education programme with the above mentioned inputs may be a meaningful step for our social and national development.

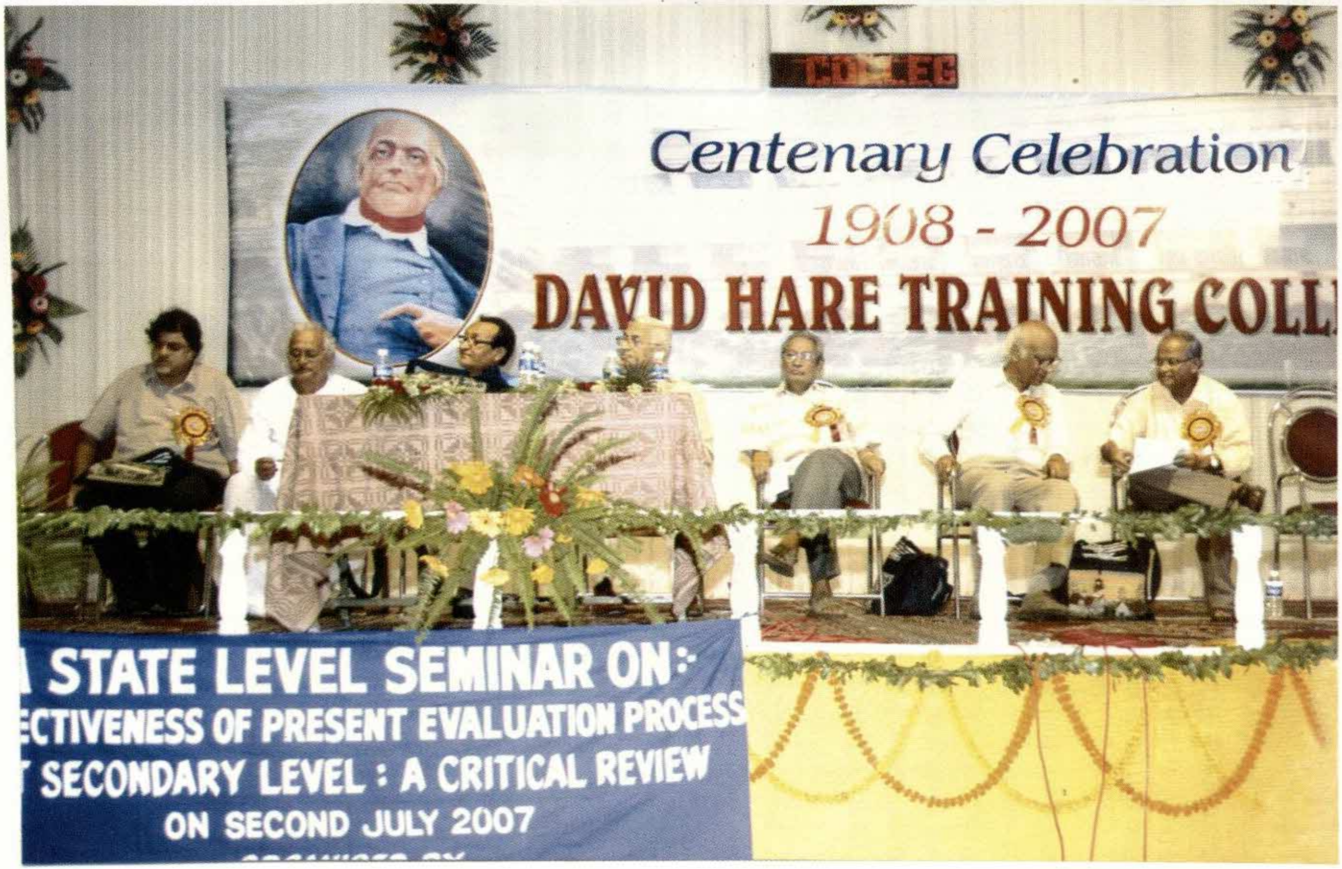
TRANSFORMING SCHOOLS-EMPOWERING TEACHER EDUCATION SYSTEM

—Swapan Kumar Sarkar

If it is asked - What is the greatest discovery ever made by man - all of us will go to mention the discovery of Einstein or Galileo or Archimedes or Newton or someone else's. But we can think of the situation in a different way. The common School is perhaps the greatest discovery ever made by man. Possibly there will be no hesitation to accept the proposition. We can easily visualize the validity of such saying from the quantum of pupils only in one area of the education system. In West Bengal around one crore of students are there in the state managed primary education. We have other areas of education starting from upper primary to higher education. Can we even think of a situation where there is no such institution to send our kids for formal schooling? But in reality there are lakhs of primary and secondary schools, thousands of colleges and hundreds of universities in India. In our state alone there are 52000 primary schools having around one crore of pupils. Those pupils move gradually to upper classes. To accommodate such students we have more than 10000 secondary and higher secondary schools. In addition to this we have 14000 Sishu Siksha Kendras and 1200 Madhyamik Siksha Kendras run by the Sishu Siksha Mission. The state has a strong contingent of teachers for primary, secondary and higher secondary systems. Through the years the common school has become the strongest and the most effective social institution to make future citizens. But when we are concerned at increasing the number of schools as well as the number of learners, the quality of education should also get equal importance.

Quality issues in education always get the priority in any academic discussion. William Adam (1853), Sir Charles Wood (1855), Sir William Hunter (1882), Sir Philip Hartog (1929) all these luminaries discussed the quality issues about the indigenous system of education and suggested various measures for the qualitative improvement of school system. With other issues they had recommended for appointing trained teachers in schools. Kothari Commission (1964) also reinforced the importance of teacher education.

As the nation's attention is increaisngly focused on the outcomes of education, policymakers have undertaken a wide range of reforms to improve schools, ranging from new standards and tests to redesigned schools, new curricula and new institutional strategies. One important lesson from these efforts has been the recurrent finding that teachers are the fulcrum that determines whether any school initiative tips toward success or failure. Every aspect of



কলেজের শতবর্ষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সেমিনার—একটি মুহূর্ত।

school reform - the creation of more challenging curriculum, the use of ambitious assessments, the implementation of decentralized management, the invention of new model schools and programmes - depends on highly-skilled teachers.

However, teachers in the liberal arts and humanities have tended to argue that if teachers know the content of their subject specialities, they do not need to take courses of education. These scholars argue that 'teachers are born' and not made. The opposite view is that although there are many artistic components in teaching, education also can and must be studied as science. They point to the research based findings and there are immense such works which corroborate the second proposition.

Our own opinion is that argument concerning education as an art of science is invalid. We feel that the highest quality of teaching inseparably combines both knowledge of scientific derivative and art. We also feel that though there is not much that programmes in teacher education can do to impart the artistic component of teaching - except to demonstrate artistic procedures in their own teaching - such programmes can give prospective teachers a good deal of scientifically based information.

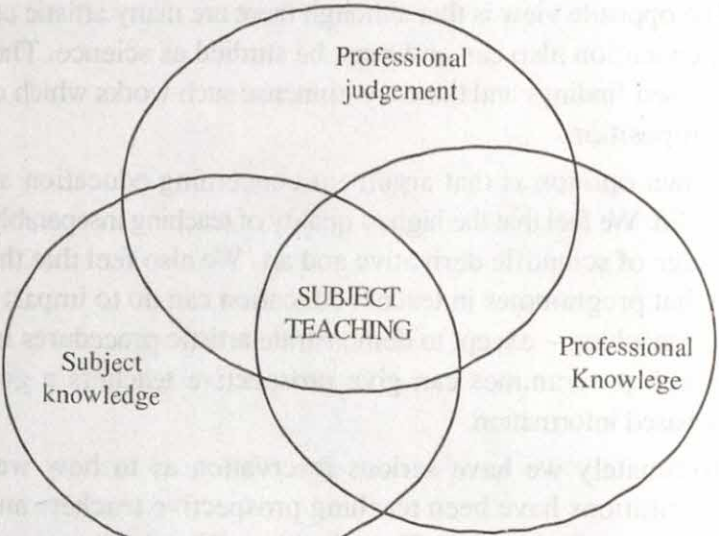
Unfortunately we have serious reservation as to how well Teacher Education Institutions have been teaching prospective teachers and what the relevant sciences really have to offer education. What has gone wrong?

Like other professions teaching is also a profession. Professional excellence can only be acquired by thorough and rigorous professional training, sensitization and orientation. Professional attributes need to be identified first and cultivation of such attributes are to be exercised. Mastery on the subject and professional acumen to transact such expertise in the classroom are to be subtly combined together to yield highest benefit. The effectiveness of Teacher Education specially lies here.

Our society has undergone a significant change in the last century in the wake of pressing demands of modernisation and matching with the developed countries with regard to advancement and progress. But the pace of change has not been even in the case of different social strata such as rich and poor, urbanites and ruralites, menfolk and womenfolk, boys and girls. A common trend in the form of aspirations and hopes are discernible in all the section of the society. Poors have started perceiving education as an instrument to wipe out the tears, the rich to fulfill their aspiration. The recently launched country wide programme of Sarba Siksha Abhijan (SSA) has boosted the hopes and aspirations of the entire nations to a greater height. So education for all is not at all a myth now. An all out effort is being taken in our state by converging efforts of all the stake holders to achieve the national agendum within the time stipulation. But this can

only be achieved by ensuring quality teacher education along with taking care of other relevant aspects.

To become a teacher one needs to supplement his subject knowledge with professional knowledge about teaching and learning and to develop his professional judgement.



Teaching is continuously creative and a problem solving activity.

The entire Teacher Education programme should be designed in such a way so that, the would be teachers can be prepared to play their assigned roles with professional competencies. The system of teacher education is characterized by inertia as it has been painfully slow in responding to the needs and demands of school education, therefore, strategies will have to be designed to rejuvenate the system. With this end in view some attempts have been made, some programmes have been launched, a number of experiments have been tried, a host of schemes have been floated but dissatisfaction has persisted as it is felt that instead of improving, the quality of the products of teacher education college have gradually deteriorated over the years. It has a very little bearing on the entire school education system now.

But the quality of teachers depend on the quality of teacher education programmes. The content of any Teacher Education Programme must proceed from the roles and function of a teacher and should have the potential to prepare the student teachers to handle the curriculum effectively. A school teacher has to perform some academic and pastoral roles. The role of the teacher encompasses a variety of activities including :

Academic Activities :

- Subject teaching
- Lesson preparation
- Setting and making of house work
- Assessing pupil progress in a variety of ways including making Test and examination
- Writing reports
- Working as part of a subject team
- Curriculum development and planning
- Undertaking visits, field courses
- Reporting to parents
- Keeping up to date
- Co Scholastic activities
- Research, innovation and improvisation

Pastoral Activities :

- Teaching personal, social and health education
- Getting to know the pupils as individuals
- Helping pupils with problems
- Liaising with parents
- Giving career and subject guidance
- Reinforcing school rules and routines, e.g. on behaviour

The previous discussion has revealed that the content of the teacher education programme need reorientation to equip prospective teachers. The prospective and working teachers will be helped to acquire competencies to develop lessons, exercises and evaluation materials. To develop such competencies, it seems desirable to make 'curriculum development' and preparation of instructional materials, integral components of Teacher Education curriculum. The emphasis must be on development of skills rather than theoretical understanding on principles of curriculum development and material preparation. The curriculum may be designed in such a way so that 40% load is given to theory and residual 60% is entirely devoted to practical activities.

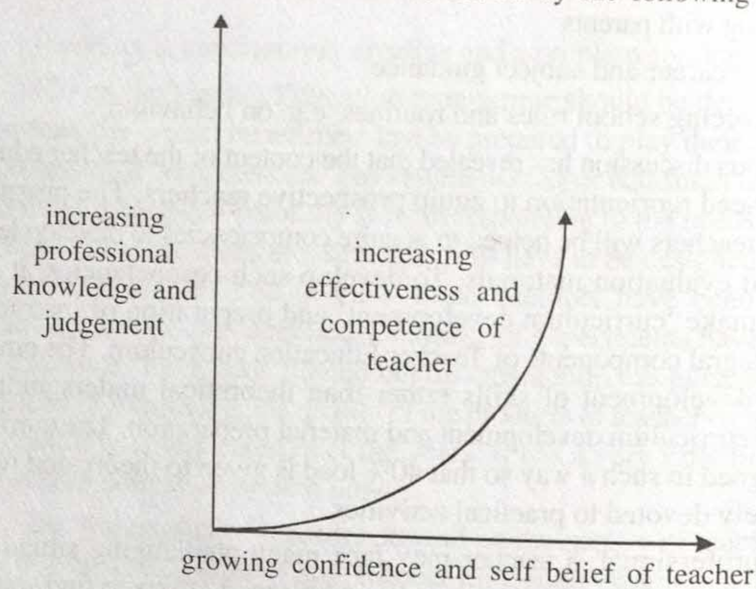
Being a professional, a teacher may face many challenging situations in schools. He is expected to make systematic and planned efforts to find solutions. Such situations put him to delve deep into the problem and undertaking action research. Therefore, to demystify the concept of research and to convey the message to the teacher that it is within their competence to undertake research, it should be made an integral part of any Teacher Education Curriculum.

Sufficient sensitization for creation of child centred and activity oriented ethos are a sine qua non. In theory, most teachers and education administrators swear by child centred and activity centered education but not exactly know how to organize the process of education following such principles. Hence, it becomes imperative to provide enough practice to the student teachers for making learning joyful through the creation of activity oriented and child centred ethos.

Attributes of effective teacher can be identified in the following way and once these attributes are known to every one in the field they can take initiative to instill such chaacteristics in grooming teachers.

HUMOROUS	ENTHUSIASTIC	ENJOYS THE SUBJECT
RELAXED	ORGANIZED	MAKES THE WORK RELEVANT
IMAGINATION	SUPPORTIVE	IS ACTIVE HELPING PUPILS LEARN
WARM	CHEERFUL	USES A VARIETY OF METHODS
FIRM	FLEXIBLE	HAS HIGH EXPECTATION
LISTENS	ENCOURAGES EXPLAIN CLEARLY	
FAIR	SYMPATHETIC	GIVES PRAISE
FRIENDLY	RESPONSIVE	APPLIES SANCTIONS FAIRLY AND DECEIT MAKE EMPTY THETAS

Becoming an effective teacher can be shown by the following diagram :



Mosston's (1986) continuum of teaching styles have indicated some definite directions for adopting such styles in teaching practices for increasing competencies among teachers.

These styles are :

Command style - This style is often described as autocratic or teacher centred.

Practice style - Whilst similar to the command style, there is a shift in decision making to pupils.

Reciprocal style - The pupils work in pairs evaluating each other's performance. Each partner is actively involved – one as the 'doer' and the other 'observing' as the 'teacher partner'.

Self-check style - This style is designed to develop the learner's ability to evaluate their own performance. The teacher sets the task and the pupils evaluate their performance against criteria and set new goals in collaboration with the teacher.

Inclusion style - In this style differentiated tasks are included to ensure that all pupils gain some feeling of success.

Guided discovery style - In this style the teacher plans the pupils' learning programme on the basis of the level of cognitive development of the learner. The teacher then guides the pupil to find the answer – reframing the quantum and task if necessary.

Divergent style - The learners are encouraged to find alternative solutions for a problem.

Learner's Initiated style - This style is more pupil directed. At this point on the continuum, the stimulus for learning comes primarily from the pupil.

Self-teaching style - This style describes independent learning without external support.

The student teachers are to be exposed to this and other such views, so they can try and use them professionally often mixing two or more of them.

Teacher Education Colleges in West Bengal along with other states are practically uncultivated or under-cultivated lands which must devote attention to update its curriculum, input new innovation of pedagogy in practice, provide more emphasis on practice rather than hackneyed theories, making things flexible, designing programmes logically rather than ritually. These initiatives are needed immediately before winding up the whole system as redundant. The curricular and academic programmes including evaluation system must be reviewed and rearranged to make it purposive and wholesome.

Teacher Education system cannot be streamlined by providing a left handed approach. All contributing factors of the total system must be considered and taken care of. The three arms of the triangle i.e. curriculum / syllabus, student teachers and teacher educators are to be closely looked into, strengths and

weakness of areas are to be identified. Subsequent overhauling drive is to be made accordingly. Some discussions and submissions have been made earlier for the first two aspects and few submission can be placed for the faculty improvement. Two pronged approaches may be considered. Teacher educators should get new exposure to get acquainted with the recent development in pedagogy. This will make them professionally updated. It will essentially boost their morale, generate new enthusiasm and drive them to disseminate those to their students.

Every teacher educator is to be assigned with some programme of action research. The need based action research is to be carried out and the feedbacks are to be utilised as and when required.

The colleges of teacher education are purported to cater to the needs of schools. But there is very little convergence of two. This aspect also to be addressed and a reciprocal relationship must be established for academic interest. Teacher educators are the practicing educational engineers, they should develop functional relation with the pedagogues so as to provide necessary pedagogical support to them.

Some incentive programme may also be introduced for the teacher educators for example success stories of teacher educators and their professional attainments may be documented and circulated. Some exchange programme can also be arranged. Education Directorate under the able leadership of Director of Public Institution can introduce some award scheme for the teacher educators for their outstanding achievement in the professional field. Such initiatives must make the situation more attractive, ignite new endeavours, fascinate new ideas and turn the profession meaningful. In this way the uncultivated treasures of teacher education system and its resources may be put into use and become a useful social institution.



শতবর্ষ অনুষ্ঠানে মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী শ্রী সুদর্শন রায়চৌধুরী কর্তৃক গ্রন্থ প্রকাশের বিশেষ মুহূর্ত।



কলেজের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে পত্রিকার উদ্বোধন করছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী।

THE NATIONAL CURRICULUM FRAMEWORK 2005 AND CONCERNS FOR TEACHER EDUCATION

—Dr. Rathindranath De

Several national level commissions and committees on education have emphasised the importance of the preparation of teachers for enhancement of quality of teaching learning process in the school and pointed out the inadequacy of the teacher education processes in the country since independence. The teacher education (TE) as a process to enrich the quality of school education however has continued in its own style throughout the country. The process is yet to be redesigned to accommodate the concerns reflected in the recently published NCF2005.

There are plenty of examples of innovation by motivated teachers who are silently engaged in their institutions to provide appropriate learning opportunity to their students, though it remains to be seen as an universal practice and hence a requirement of providing constant support to the teachers is considered essential.

There has been some support made available to the process of both pre-service and in-service TE e.g. through the Centrally Sponsored Scheme of Teacher Education (CSSTE), District Primary Education Project (DPEP) and Sarba Sikhsha Abhiyan (SSA) etc. in recent years, however, expected results from these projects are hardly perceived, mostly due to lack of co-ordination among various organisations.

The present concerns of teacher education as described in para 5.2.1 of NCF05 continues to raise similar issues as have been mentioned over the years and thus confirm that much remains to be done to address the challenges. The teacher educators, therefore, mostly are in agreement with the observation of NCF05 that the "Existing teacher education programmes neither accommodate the emerging ideas in context and pedagogy nor address the issue of linkages between school and society. There is little space for engagement with innovative educational experiments."

The report of the Education Commission (1992) in West Bengal pointed out similar concerns. It mentioned that the "The system of teachers training as it is at present is neither comprehensive nor well coordinated. Besides, classroom practices reflect little of whatever training is imparted". The report summarised some drawbacks, those are : "a) The different training colleges are affiliated to different universities and sometimes follow different syllabus … b) The training colleges do not follow a uniform staff pattern …. c) The sizes of the training colleges vary greatly …. Besides, the number of teachers that pass out of these institutions every year far exceed the number that the existing school system can absorb. The result is a regrettable loss of trained man-power and a corresponding

increase in the number of educated unemployment; d) The training itself is treated as a formality….. According to reports, there is no qualitative difference in the performance of trained and untrained teachers; e) The greatest and most alarming deficiency is that the training courses are irremediably out dated. Having been drafted during the British days, quite a few of them have nearly lost their relevance to the teaching - learning situation as it obtains in our schools. If anything, they turn our teachers into status-quoists. The syllabi are mostly pedagogical and contribute little towards improving the efficiency of classroom teaching" (para 11, 11, p.207). The commission also noted that the teachers' training courses have to face a challenge in terms of increasing number of pupils in our schools.

The report of the School Education Committee (2002) in West Bengal observed, that "The 'Teacher' has always occupied a pivotal position in any system of education. Teacher's competencies and commitment in resolving all relevant domains of school education are the major determinants for spreading the access and maintenance of quality in school education". The committee reiterated the need for strengthening the system of teacher education (para 8(I),1, p-103).

The NCF05 has not mentioned much about the role and function of NCTE which was established in 1974 and is now a statutory authority in terms of the NCTE Act., 1993. The NCTE was established with a view to achieve planned and coordinated development of the teacher education system throughout the country. The functions of the Council include preparation of suitable plans and programmes in the field of teacher education. As the NCF05 suggests some paradigm shifts, the curriculum framework for teacher education prepared by NCTE in 1998 may require thorough revision. It is not known whether NCTE will consider the suggestions of the NCF05 in adopting a decentralized planning for improvement in teacher education involving the state level institutions and teacher organizations providing due importance to the autonomy of teachers and teacher educators in a developmental process.

There remains another area of concern in terms of wide gap in approaches of the initial teacher education institutions and those followed in the processes of on-the-job training. There are several agencies, that arrange on-the job training for teachers often without consultation with each other, which lead to lack of clarity resulting in regrettable loss of resources. The mainstream institutions lose their significance due to such lack of convergence and the arrangement continues to remain as ad-hoc.

The Education Commission (1964-66) recommended that the in-service teacher education programme 'should be based on research input', the 1988 Curriculum Framework of NCERT mentioned that "The existing effort at curriculum development and material preparation is generally de-linked from the available infrastructure of educational research. The research base of the curriculum development centers is rather weak and professional linkages between these centers and educational researchers should be established as early and as effectively as possible. The research base of the curriculum development centers such as SCERTs

should be strengthened by establishing linkages between them and education faculty of universities and teacher training colleges, which carry out educational research." The Education Commission (1992) in West Bengal recommended encouragement of research activities in the university departments and in SCERT on problems of teaching and training in the state. However, any one concerned with teacher education would agree that, much remains to be done to address the issues.

Some suggestions of the National Commission of Teachers like creation of "teachers' centers that could serve as meeting places, where talent could be pooled and teaching experiences shared" remains to be given proper shape.

It appears that aspirations of NCF05 can never be realised without an appropriate shift in the process of preparation of teachers and that requires a completely new vision of the teacher education institution and requirement of a set of specialists in language, social science, mathematics science, fine arts, music etc who will not only be experts in their respective fields but will have abilities to create a multidisciplinary environment in teacher education, to be expected in schools subsequently. The generic M.Ed course, often prescribed as an essential qualification for a teacher educator may not serve the desired purpose. This may further make the profession of a teacher educator unattractive and the institutions may be deprived of the best possible human resource form various disciplines, to infuse new life to the process of teacher education.

The observation of NCF05 that the "... conceptual inputs in teacher education need to be articulated in such a manner that they describe and explain educational phenomena-actions, tasks, efforts, processes, concepts and events. Such a teacher education programme would provide adequate scope for viewing a theoretical understanding and its practical aspects in a more integrated manner rather than as two separate components..." (p-109) provide the vision of teacher education that has to be articulated in future.

The NCF05 proposes "to undertake a major shift away from an overwhelming emphasis on the psychological characteristics of the individual learner to his/her social, cultural, economic and political context." (para 5.2.3, p-110) in the teacher education programme, this is yet another dimension that has to be taken care of while reshaping the teacher education programme.

In para 5.2.5, p-112 the NCF 05 document examines the initiative and strategies for inservice education and mentions that it should be "a process, which includes knowledge, development and change in attitudes, skill, disposition and practice-through interaction both in workshop settings and in school... Self-reflection needs to be acknowledged as a vital component of such programme." The concerned teacher educators feel such a vision of in-service education would become reality when the recommendation of the NCF05 to work out a "training policy defining parameters such as periodicity, context and methodology of programme", is accepted by different functionaries in the system.

Some recent developments e.g. establishment of West Bengal Council of Vocational Education and West Bengal Council of Rabindra Open Schooling and

subsequent increase in number of vocational schools and study centers for Open Schools in West Bengal would require a separate set of initial and on-the-job teacher education system in West Bengal.

Creative and innovative use of information and communication technology for enhancing access and relevance of education is yet to be explored in the process of teacher education. The field of educational technology has yet to find appropriate attention in the university departments of education and in teacher education colleges. The NCF05 has mentioned that "Teachers require first-hand experience of making programmes themselves in order to develop an interest in the new technology". The opportunity of using EDUSAT satellite in sharing experience of teachers at sub-district level centers could not be materialised due to lack of planning. The computer system already available at many schools may serve to become excellent teaching learning devices once teachers prepare themselves in using them in teaching learning of different subjects. The electronic media has a tremendous potential of reaching to the teachers even in remote areas, unfortunately this has not been utilized properly in the process of teacher education.

To infuse professionalism in initial teacher education, there can be multiple models, a four year integrated programme of B.Sc (Hons)/B.A.(Hons) and B.Ed in collaboration with general degree colleges, university departments of languages, science, social-sciences and teacher education colleges after the higher secondary stage could be another option to prepare teachers. Such a collaboration may reduce the present alienation of teacher education colleges from the mainstream institutions

All initial teacher education programmes may be followed by a mandatory period of internship in a school, under the supervision of the headmaster and other teachers to bridge the alleged gap of theory and practice of teacher education. Such an arrangement may bring the school closer to the teacher education institutions and teacher educators may find the much needed laboratory for experimentations or innovations in school education.

The increase in demand for school education in West Bengal and subsequent expansion of the system now requires recruitment of a large number of teachers and their professional enrichment through appropriate teacher education processes. The recruitment of primary teachers are done by the District Primary School Councils and a certificate of successful completion of pre-service teacher education awarded by the West Bengal Board of Primary Education is an essential qualification for the teachers at the primary schools in West Bengal. Initial and on the job training of these teachers are tremendous systemic challenges.

The recruitment of teachers for secondary and higher secondary schools is managed by the West Bengal School Service Commission through competitive examinations. Five percent marks are awarded for the B.Ed degree in the entire process, thus pre-service teacher education is not an essential qualification to be a teacher in a secondary / higher secondary school. Such persons who enter teaching

without a professional qualification are sent to B.Ed colleges for an in-service training.

The B.Ed programme, primarily designed as initial pre-service programme may become grossly irrelevant for a practicing teacher, doubts have been raised by many in terms of relevance of the contents and processes of the B.Ed programme even as an initial pre-service teacher education process. A nation-wide review of teacher education is therefore needed to re-design teacher education programme "...to respond to the school curriculum renewal process and in accordance with the state and regional contexts in which they are situated." (NCF05, position paper on teacher education, p-26).

Processes of strengthening the teacher education in West Bengal have now been initiated through different efforts of the state level organisations and through the Centrally Sponsored Scheme of Teacher Education which include support to the State Council of Educaional Research and Training (SCERT), Institute of Advanced Studies in Education (IASE). College of Teacher Education (CTE)s and District Institute of Education and Training (DIET)s in West Bengal.

The IASE and the CTE s and B.Ed colleges of the state are under the higher education department and the SCERT, DIETs and the Primary Teacher Training Institute (PTTI)s are under the school education department and are expected to conduct various teacher education programme. The statutory autonomous organizations e.g. West Bengal Board of Primary Education, West Bengal Board of Secondary Education, West Bengal Board of Madrasah Education, West Bengal Council of Higher Secondary Educatione etc. organize need based training programme for the teachers. The West Bengal Sarba Sikhsha Mission through its District Project Offices conduct in-service teacher education programme. It may be expected that through effective utilization of resources and appropriate policy of convergence, the concerns expressed in various national and state level committee, commissions and documents will be addressed in near future.

References :

1. National Curriculum Framework 2005 ; NCERT ; (2005)
2. Report of the Education Commission ; Govt. of West Bengal ; (1992)
3. Report of the School Education Committee, West Bengal ; Govt. of West Bengal ; (2002)
4. Supplementary Report of The School Education Committee, West Bengal ; Govt. of West Bengal ; (2003)
5. Report of the Education Commission (1964-66) Education and National Development ; Govt. of India.
6. NCF 2005 Position Paper : National Focus Group on Teacher Education for Curriculum Renewal ; NCERT ; (2006)
7. National Curriculum for Elementary and Secondary Education : A Framework ; NCERT ; (1988).

শিক্ষক-শিক্ষণের প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয়

—রূপক হোমরায়

শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বস্তুত এই প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি থেকেই আজ থেকে একশো বছর আগে এই ডেভিড হেয়ার নামাঙ্কিত শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। শতবর্ষে বহুশত ছাত্র এবং শতাধিক ছাত্রী এখান থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে নিজ নিজ কর্মজীবনে প্রবেশ করেছেন, অনেকেই শিক্ষক বা শিক্ষিকা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ও সর্বজনের শ্রদ্ধা অর্জনে সমর্থ হয়েছেন। তৎসত্ত্বেও একথা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না এখানকার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি কোনো ছাত্র বা ছাত্রীকে শিক্ষক/শিক্ষিকা হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ও যথাযথ। শিক্ষক শিক্ষণ-এর তাত্ত্বিক বা দার্শনিক দিকটি নিয়ে বিতর্কের বোধ হয় খুব একটা অবকাশ নেই। এই মহাবিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র এবং প্রায় তিরিশ বছর শিক্ষকতা করতে গিয়ে যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতে হয়েছে সেগুলির সমাধানের পথ খোঁজার উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই।

(ক) প্রশিক্ষণের পর্ব ও সময়সীমা ঃ B.T/B.Ed পাঠক্রমের সময়সীমা মাত্র দশমাস। একশো বছরেও এই সময়সীমা অপরিবর্তিত থেকে গেছে। প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ও তার জন্য নির্ধারিত সময়সীমা বর্ধিত করার প্রয়োজনীয়তা চট্টোপাধ্যায় কমিটি (১৯৮৩-৮৫) উপলব্ধি করেন এবং পাঁচ বছর করার সুপারিশ করেন। আমরা সবাই জানি এই প্রস্তাব কার্যকরী হয়নি। শিক্ষক শিক্ষণের দুটি প্রধান ভাগ রয়েছে—(১) প্রাক্ চাকুরি প্রশিক্ষণ (Pre-Service Training) এবং (২) কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ (In-Service Training)।

(১) প্রাক্-চাকুরি প্রশিক্ষণ ঃ শিক্ষকতায় প্রবেশের আগে প্রশিক্ষণের বাধ্যকতা কখনোই স্বীকৃত হয়নি। অর্থাৎ শিক্ষকতা শুরু করার সময় তোমার প্রশিক্ষণ থাকলে ভালো না থাকলে সময়মতো করে নিলেই চলবে। বর্তমানে এই সময়—প্রথম পাঁচ বছর। এর সঙ্গে অবশ্য বার্ষিক বর্ধিত বেতন বা ইনক্রিমেন্ট এর সম্পর্ক রয়েছে। প্রশিক্ষণ না নেওয়া পর্যন্ত অন্তত সরকারি ইনক্রিমেন্ট পাওয়া যাবে না। আধা সরকারি ক্ষেত্রে প্রথম পাঁচ বছর ইনক্রিমেন্ট পাওয়া যাবে। তার পরের পাঁচ বছর পাওয়া যাবে না। এবং দশ বছর পরে আবার পাওয়া যাবে। প্রশিক্ষণের সঙ্গে বেতন বৃদ্ধির এই সম্পর্ক গোটা ব্যবস্থাটিকেই হাস্যকর করে তুলেছে এবং একথা বলার অপেক্ষা রাখে না শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচিকে কেবলমাত্র চাকুরি পাওয়া বা বেতন বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলেছে। এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। শিক্ষকতা যদি একটি পেশা হয় তাহলে সেই পেশার জন্য নির্বাচিত হওয়ার পরই প্রশিক্ষণ শুরু হওয়া দরকার, তার আগে নয়। একজন ছাত্র বা ছাত্রী আগে ঠিক করুক সে কোন্ পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চায়। যদি যে শিক্ষকতাকেই তার জীবিকা অর্জনের পথ হিসেবে বেছে নেয় তাহলে তার প্রথম কাজ হবে শিক্ষক নিয়োগের নির্বাচনী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া। নির্বাচিত হওয়ার পরেই চাকুরির শর্তানুযায়ী তাকে অন্তত দু-বছর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ডিগ্রি অর্জনের জন্য না হয়ে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক ও প্রশিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হবে যেমন ভাবে পরিচালিত হয় মেনেজমেন্ট, সিভিল সার্ভিস বা ওইরূপ বিশিষ্ট কর্মপ্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি। দু-বছরে যদি যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হয় তাহলে আরও এক বছর তাকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন একটি সম্মানজনক ভাতা, থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থা থাকা চাই।

এই ব্যবস্থা শুধু শিক্ষক শিক্ষণকে বাস্তবসম্মত ও প্রাসঙ্গিক করে তুলবে তাই নয়, মানবসম্মদের সীমাহীন অপচয় রোধ করতেও সমর্থ হবে। কোনো কিছু করার নেই অতএব B.Ed. পড়ো—এই বাতুলতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে।

(২) **কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ ঃ** কোঠারি কমিশনের সময় (১৯৬৪-৬৫) থেকেই এজাতীয় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আলোচিত হয়ে আসছে। যদিও বাস্তবে তা অস্বীকৃত-ই থেকে গেছে। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু আলোচনা সভা, কর্মশালা পরিচালিত হলেও সমগ্র শিক্ষকসমাজকে এই ব্যবস্থায় আনা সম্ভব হয়নি। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষক, শিক্ষিকারা একবার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর চাকুরিজীবনে তাঁর আর দ্বিতীয়বার প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ ঘটে না। শিক্ষা পর্ষদগুলি তাঁদের পাঠক্রম বা পাঠ্যসূচির উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন ঘটালে কিছু কর্মশালা আয়োজিত হয়, কিন্তু তাতেও মোট শিক্ষক সংখ্যার একটি অংশমাত্র অংশগ্রহণের সুযোগ পান। কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করে কোঠারি কমিশন প্রতি পাঁচ বছরে প্রত্যেক শিক্ষক, শিক্ষিকার অন্তত দুই থেকে তিন মাস প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার সুপারিশ করেছিল। জাতীয় শিক্ষক কমিশন (National Commission on Teaching; 1983-85) এই জাতীয় প্রশিক্ষণের জন্য 'শিক্ষক কেন্দ্রের' প্রস্তাব দেয় যেখানে শিক্ষক/শিক্ষিকারা নিয়মিত মিলিত হবেন, মতামত বিনিময় করবেন, অভিজ্ঞ শিক্ষক/শিক্ষিকাদের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। আচার্য রামমূর্ত্তি রিভিউ কমিটি (১৯৯০) কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণকে শিক্ষক/শিক্ষিকার বিশেষ চাহিদা বা প্রয়োজনভিত্তিক করার উপর জোর দেন। একই সঙ্গে এর মূল্যায়ন ও অনুসারী কর্মসূচী (follow up scheme) গ্রহণের কথাও বলেন।

এই কারণেই প্রতিটি জেলায় District Institute of Education and Training (DIET) স্থাপন, ২৫০টি College of Education কে Colleges of Teacher Education (CTE)-এ উন্নীত করা, ৫০টি Institute of Advanced Studies in Education (IASE) (ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ তার মধ্যে একটি) স্থাপন এবং রাজ্য শিক্ষাগবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ (SCERT) গুলিকে আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ সারা দেশ জুড়ে গ্রহণ করা হয়েছে। আনন্দের কথা আমাদের রাজ্যও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এখন দরকার সুচিন্তিত কর্মসূচি গ্রহণ ও তার যথাযথ রূপায়ণ। যেহেতু শিক্ষক-শিক্ষণ একটি অবিরাম প্রক্রিয়া তাই শিক্ষকদের নিয়মিত ও অবিচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতেই হবে। শুধু নিত্য নতুন জ্ঞান অর্জনই নয়, সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

(খ) প্রশিক্ষণের পাঠ্যসূচি ও পাঠক্রম ঃ

প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় তার নিজের মতো করে B.Ed. যা পূর্বে B.T. নামে অভিহিত হত তার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করে থাকে। বর্তমানে NCTE (National Council for Teacher Education) সারা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ কাঠামো ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উদ্যোগী হয়েছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে গত পঞ্চাশ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাদের রচিত পাঠক্রম বা পাঠ্যসূচির বিশেষ রদবদল ঘটায়নি। Compulsory Subjects এর মধ্যে শিক্ষানীতি, দর্শন ও ইতিহাস এর পাশাপাশি Method Subject হিসেবে ছাত্ররা তাদের পছন্দমতো দুটি বিষয় নিয়ে পড়ার সুযোগ পায়। পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি রচনার তাত্ত্বিক দিক নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাই না, কারণ সে বিষয়ে আমার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। কিন্তু এই পাঠক্রম যে কাঙ্ক্ষিত ফল এনে দেয়নি তার প্রতিফলন পাই যশপাল কমিটি রিপোর্টে (১৯৯৩) "In the context of constructing a new self image of the teacher, pre-service training is a key but elusive area of

reform. Past attempts to improve teacher training programmes and institution have met with rather limited success. ....Inservice training too in most plans has assumed the character of a ritual devoid of academic substance or the capacity to stimulate."

স্বাভাবিক কারণেই পরবর্তীকালে কিছু রদবদল ঘটানো হয়েছে, যদিও তা কতটা কীভাবে কার্যকরী হয়েছে তা আমার জানা নেই। আমি শুধু কিছু প্রাসঙ্গিক দিক নিয়ে আলোচনা করতে চাই যা শিক্ষক-শিক্ষণের দুর্বল দিক বলে আমার মনে হয়।

(১) শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ঃ বর্তমান পাঠক্রমের সর্বাপেক্ষা দুর্বল দিক শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের অভ্যাস। দশ মাস প্রশিক্ষণের মধ্যে মাত্র একমাস শিক্ষার্থী প্রতিটি Method subject এর জন্য ২০টি পাঠদান করলেই যথেষ্ট যদিও বাস্তবে ১৫-১৬টির বেশি হয় না। Practice Teaching এর আগে কয়েকটি Demonstration Lesson হওয়ার কথা। সব জায়গায় হয় কি না জানি না, হলেও তা হয় একটি কৃত্রিম শ্রেণিকক্ষে বাস্তবের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই। এই কৃত্রিম পাঠদানের প্রতিফলন দেখতে পাই Practice Teaching-এও। ব্যতিক্রম যে ঘটে না তা নয়। কিন্তু তা আমার আলোচ্য বিষয় নয়। একজন শিক্ষার্থী B.Ed. পাঠকালে যেভাবে পাঠাদন করেন, B.Ed. পাশ করে যখন বাস্তব শ্রেণিকক্ষে ফিরে যান তখন Practice Teaching-এর লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। আমার মনে হয় প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় বা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একটি Demonstration School থাকা আবশ্যিক যেমন অতীতে David Hare Training College-এর Demonstration School ছিল Ballygunge Govt. High School. এই স্কুলে অধ্যাপকেরা নিয়মিত পাঠদান করবেন যা দেখবে B.Ed. শিক্ষার্থীরা। প্রতিটি ক্লাসের পর Trainee এবং Teacher এর মধ্যে Critical discussion ও Evaluation হবে। একই ভাবে শিক্ষার্থীরাও ক্লাস নেবেন যা সহপাঠী ও অধ্যাপক উভয়েই দেখবেন এবং একইভাবে ক্লাসের পর তার মূল্যায়ন ও আলোচনা হবে। অর্থাৎ Demonstration এবং Practice Teaching দুটোই চলবে পাশাপাশি স্বাভাবিক পরিবেশে। যদি B.Ed. পাঠক্রমের কার্যকাল হয় দু-বছর তাহলে অন্তত ৬ মাস এই ব্যাবহারিক দিকটির জন্য নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে Demonstration School গুলি বিশেষভাবে প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। এজাতীয় পাঠদানের যেন উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে। দ্বিতীয়ত এই পর্বের মূল্যায়ন পদ্ধতিও হবে ধারাবাহিক—সমগ্র পাঠদানকাল জুড়ে। একদিনে পাঁচ মিনিটের শ্রেণিদর্শনের মাধ্যমে নয়—যা বর্তমানে হয়ে থাকে।

(২) বৃত্তিগত নিপুণতা বৃদ্ধি (Development of professional Skill) ঃ

প্রতিটি বৃত্তি বা পেশার কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে এবং একজন সফল ব্যক্তি তাঁর পেশায় তখনই সফল হন যখন ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি তিনি অর্জন করতে সমর্থ হন। এই বৈশিষ্ট্যগুলি কেবলমাত্র অনুকরণের মাধ্যমে অর্জন করা যায় না। এর জন্য নিজস্ব ভাবনাচিন্তা, পেশার প্রতি অনুরাগ, সততা থাকা প্রয়োজন। ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদা, মানসিকতা, সামাজিক অবস্থান ভেদে শিক্ষকের পাঠদান কৌশল, আচরণ ইত্যাদি পাল্টাতে হয়। এই জায়গায় বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষণ কর্মসূচি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। যশপাল কমিটির মতে, "....Sadly lacking both in perspective and means to equip teachers with the capacity to understand children and their learning processes in a professional manner."

অতি ভাববাদী ধারণার পরিবর্তে সফল শিক্ষকদের মাধ্যমেই কেবলমাত্র "Skill development programme" সফল করা সম্ভব। এ কাজে visiting teacher' এর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। "The

emphasis of this programme should be on enabling trainees to acquire the ability for self-learning and independent thinking."—Learning without Burden (1993).

(৩) নেতৃত্বের গঠন ও পরিচালনা গুণ বৃদ্ধি **(Development of leadership and Managerial Skill) ঃ**

বর্তমান বিশ্বে 'Teachers are leaders'. তারা শুধু শ্রেণিকক্ষের নেতা নন তারা সমগ্র ছাত্রসমাজকে নেতৃত্ব দেন। ছাত্রদের চরিত্রগঠনে, কর্মসম্পাদনে শিক্ষককে নেতার ভূমিকা পালন করতে হয়। অথচ এই শিক্ষণ কর্মসূচিতে নেতৃত্বগঠনের উপাদান থাকে না বললেই চলে। অন্যদিকে এই শিক্ষক/শিক্ষিকা থেকেই প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা নির্বাচিত হন। যাঁদের প্রধান কাজ বিদ্যালয় পরিচালনা। পরিচালনার জন্য দরকার এমন কিছু বৃত্তিগত অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি যার জন্য প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। Natinal Curriculum Framework for school Education, 2000 এর মতে 'Headmasters and Principals of Schools have to play the role of managers and facilitators in the entire process of curriculum implementation and, therefore, they have to be suitably trained too." অর্থাৎ সহশিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক উভয়েরই পৃথক পৃথক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি থাকা প্রয়োজন। প্রধানদের কোনো প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে বলে জানা নেই।

(গ) সমাজ পরিবর্তনের বাহক **(Agent of Social Change) ঃ**

মানবসভ্যতার ইতিহাসে শিক্ষককুল চিরকালই সমাজ পরিবর্তনের বাহক হিসেবে সমাদৃত হয়ে এসেছেন। সমাজের যা কিছু অগ্রগতি তার পিছনে রয়েচে কোনো-না-কোনো শিক্ষকের অবদান। একজন ছাত্র/ছাত্রীকে কীভাবে গড়ে তোলা দরকার তাও নির্ধারণ করেন শিক্ষক। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকটি অবহেলিত রয়ে গেছে।

N.C.F. 2005 এর মতে, "Most teacher education programmes provide little scope for student-teachers to reflect on their experiences and thus fail to empower teachers as agent of change." তাই empowerment of teachers ভীষণ জরুরি।

পরিশেষে সংক্ষেপে বলতে চাই শিক্ষক-শিক্ষণ কর্মসূচিকে বাস্তবানুগ ও ফলপ্রসূ করতে হলে—এর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানো দরকার। Bachelar of Education এবং Teacher's Training এই দুটিকে এক করে দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। প্রথমটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি স্নাতক স্তরের বিষয় হিসেবে বিবেচিত হোক যেখানে দ্বাদশ শ্রেণির পরই ভর্তি হওয়া যাবে। অন্যটি কেবলমাত্র নির্বাচিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিষয়গত দক্ষতা, উপস্থাপনা কৌশল, নেতৃত্ব গঠনের প্রক্রিয়া, পরিচালনার কৃৎকৌশল প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠান হবে। এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় থাকুক State Council for Teacher Education নামক পৃথক স্বাধীন সংস্থা যারা NCERT, NCTE, UGC ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সংস্থা এবং SCERT, DIET, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি রাজ্যস্তরের সংস্থাগুলির সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ রেখে শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রগুলিকে স্বাধীনভাবে পরিচালনা করবেন। পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি রচনা ও প্রয়োগ, শিক্ষক নিয়োগ, পাঠ্যপুস্তক রচনা ইত্যাদি সমস্ত কিছুর দায়িত্বে থাকবেন।

RIGHT TO EDUCATION– THE MANDATE AND AFTER

—R. G. Mukherjee

1. Introduction : Certain developments during the early part of 2006 aroused popular expectation that the long-awaited Right to Education Bill would be placed before the Parliament in its Monsoon Session that year. But a big surprise was in store for the nation which came in the form of letter dated 21st June, 2006 from the Secretary, department of Elementary Education and Literacy, Govt. of India, to the Principal Secretary, School Education, Govt. of West Bengal. This letter conveyed the Union Govt.'s decision to the effect that no central law would be enacted; instead, the different state governments would the required to make their own laws according to their judgment, but following the draft Model Act, a copy of which was sent along with the letter. We call this a surprise because in none of the initiatives takes by the Union Governments, both under NDA and UPA, in this respect since the 86th Amendent of the Constitution of India in 2002 contained any hint of such a move on their part.

2. Recounting the course of events : The events are well known, yet brushing up our memory may be helpful. At the international level, education was accepted as a human right in the United Nation's Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 1948. Article 26(1) of the Document stated, "Everyone has the right to education." When the Indian Constitution was adopted in 1950, education, instead of being recognized as a Fundamentals Right, found place in the part of Directive Principles of State Policy. The relevant Article required the State to make effort to provide free and compulsory education to all boys and girls upto the age of 14 years within a decade, that is by the year 1960. Presumably, this relaxation was a move to allow the newly independent State some breathing time. Decades come and went, target dates continued to be extended, promise to enhance budgetary allocation for education was renewed time and again. But till today, the promises were not kept and the goal remained unattained. The inevitable result is that about 40 core of our citizens are unlettered and the number of out of school children (both unenrolled and dropout) baffles enumeration. The official explanation for this shameful failure is lack of funds. But eminent social scientists believe that with sincere effort, treating Universalisation of elementary education as a top priority issue, it is not possible for the State to collect the necessary financial resources. What is lacking in fact is political will!.

The pathetic picture of such a vast section of the population living in ignorance has now become a matter of grave concern at the international as well



শতবর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীতের একটি মুহূর্ত।

as national level. In 'Learning : The Treasure Within', the Report of UNESCO's International Commission on Education for the Twenty first Century, chaired by Jacques Delors, one finds the following observation : "In confronting the many challenges that the future holds in store, humankind sees in education an indispensable asset in its attempt to attain the ideals of peace, freedom and social justice. As it concludes its work, the Commission affirms its belief that education has a fundamental role to play in personal and social development." The Commission sees education 'as one of the principal means available to foster a deeper and more harmonious form of human development and thereby to reduce poverty, exclusion, ignorance, oppression and war.' Similar anxiety has been expressed by UNICEF in its different reports since the mid 1990's in which it has drawn attention to the possible consequences of this staggering number of people deprived of educational opportunity. Such a situation, UNICEF **warns,** thwarts national development, impairs democratic process and becomes the greatest danger for world peace. Urgency was felt at the global level to adopt time bound, collaborative action programme to reach the objective of universal education. In the wake of the well known Dakar Declaration, Education For All has become a familiar slogan. Further, nations of the world, including India, are now committed to the Millennium Development Goals. The Dakar Framework for Action (April, 2000) committed the world community to attain the following goals :

a. Expanding and improving comprehensive early childhood care and education, especially for the most vulnerable and disadvantaged children;

b. Ensuring that by 2015 all children, particularly girls, children in difficult circumstances and those belonging to ethnic minorities, have access to and complete free and compulsory primary education of good quality;

c. Ensuring that the learning needs of all young people and adults are met through equitable access to appropriate learning and life skills programmes,

d. Achieving a 50% improvement in levels of adult literacy by 2015, especially for women, and equitable access to basic and continuing education for all adults;

e. Eliminating gender disparities in primary and secondary education by 2005, and achieving gender equality in education by 2015, with a focus on ensuring girls' full and equal access to and achievement in basic education of good quality;

f. Improving all aspects of the quality of education and ensuring excellence of all so that recognised and measurable learning outcomes are achieved by all, especially in literacy, numeracy and essential life skills.

In the same year (i.e. 2000), the Millennium Development Goals were adopted with special stress on universal primary education and the elimination of gender disparities in primary and secondary education as the vital factors for eliminating extreme poverty.

Simultaneously with these pledges at the global fora, popular demand for access to education continued to gather momentum within the country. As a matter of fact, the message of 'knowledge society' has percolated down to all strata of society. The desire of the common people to get educational opportunities for their children spread over all the parts of the country. To cap all this, came the historical verdict of the Hon'ble Supreme Court in the famous case of Unnikrishnan vs. the state of Andhra virtually giving elementary education the status of Fundamental Right. This enthused the people and triggered off intense public agitation including 'Shiksha Dharna' demanding amendent of the Constitution for recognizing elementary education as a Fundamental Right. Ultimately the Indian Parliament adopted the 86th Constitution Amendment in the year 2002 which runs as "The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6-14 years in such manner as the State may, by law, determine" (Art. 21).

The entire nation welcomed this long-awaited measure. Yet, a small but significant omission in the amendment created a little despair. In the earlier provision relating to the Directive Principles of State Policy (Art. 45), there was no mention of any minimum age. The new Article has kept the children below 6 years of age out of this Right. Even a central organization like National Council of Educational Research and Training (NCERT) has regretted this deviation in the following words; "..... it is unfortunate that the zero to 6 age- group has been excluded from the purview of Article 21."

3. Main significance of this Amendment

It may be helpful for our discussion to try to understand the real significance of this Amendment :

a. Before this amendment was passed, access to education was not a justiciable right of the people, nor was it a legal obligation for the State. This amendment transformed the picture. It has now become a Constitutional duty of the State to provide free education to all children belonging to the age-group specified. Failure to discharge this responsibility cannot be defended by any explanation. Hurdles, if any, including dearth of resources, will have to be overcome by the State itself. The Right of the people must be guaranteed by all means.

b. The world 'Free' generally refers to absence of tuition fee in school. But its real connotation is must wider. 'Free education' in effect requires the State to arrange an education system in which there will be no financial pressure of any kind on the parents or other members of the family for sending their children to school. Some other conditions are also necessary to be fulfilled to make access to education meaningful. For this we may refer to the observations of NCERT

in its document published in 1988 under the title 'National Curriculum for Elementary and Secondary Education - A Framework'. It says, "Education being a powerful instrument of social transformation, the value of quality of opportunity has to be demonstrated both by ensuring equal access to educational facilities and by ensuring that the conditions of learning provide equal chances of success to all"[3].

c. It is also necessary to have a clear understanding about the word 'compulsory'. Compulsion on whose part? Is it the obligation of the child or its guardian to whom the Constitution gives the right, or is it the Constitutional responsibility of the State whom the Constitution has directed to provide educational facilities? The obvious answer is that it is an inalienable duty of the State. But in the situation prevailing in our country today, even he obvious needs to be asserted. It has to be realized that those parents who do not send their children to school are not unwilling, but unable to do so. Multifarious socio-economic barriers have plunged their lives into grave crisis. The sheer need to survive forces them to depend at least partly on the income of their children. Any attempt to impose penalty on these poor parents is a cruel joke indeed! It is, therefore, the State's responsibility to solve the socio-economic problems of this deprived section of the citizens and empower them to fruitfully use their Right to Education. But such a situation cannot be brought about only by the State's education policy. To quote NCERT, "If 'free' education is understood as 'removal of constraints' to educaiton, then we must realize the importance of other sectors of the State's social policy for supporting and facilitating the achievement of UEE."[4] The implication is clear. If liberalization of economic policies results in deepening poverty of the masses, if thousands of peasants find no other option but to kill themselves, then whose children will come to school?

d. Another question to which we must find answer is: to whom does the word 'State' refer? Is it the Central Government or the state governments, or both? A safe interpretation may be that the 'State' means the total system that includes both the Central and the state governments.

But a few questions are still pertinent. Given the allocation of power and resources in our federal structure, who should shoulder the main responsibility? Who should provide leadership in performing this enormous national task? Who should ensure availability of funds? The irrefutatble answer is: the Central Govt. It enjoys Constitutional right to adopt plans for running the affairs of the country and to collect and utilize resources for their implementation. It is the Central Govt. that determines whether the nation shall move towards economic self-reliance or surrender to the pressure of the developed countries, whether the prescriptions of globalization will be swallowed bidding good bye to the cherished idea of welfare state ! The state govts. are helpless victims of these decisions. They do

not have the power to rescue the people when the hard blow of free market economy leads to crisis in domestic agriculture and industry and brings untold misery in the life of the common people. The state govts. have work with very limited and inelastic sources of revenue. It is very difficult for them to fill their coffer without imposing tax-burden on the poor. In fact, sparing the poor amounts to inviting poverty for the government. And this grave situation is faced by all the states of the country. According to economists, this is the direct result of the policies being followed by the Central Govt. The Central Govt. must, therefore, guarantee the flow of funds required to establish people's right to education.

e. Although not specifically mentioned in the 86th Amendment of the Constitution, offering the same quality of education to all children is an accepted part of the State's responsibility. This has been stated unambiguously and unconditionally in a number of documents issued by the Union Govt. In fact, one of the three pillars of Sarba Shiksha Abhijan launched by the Central Govt. is good quality education for all. A few more comments will be made be on this aspect in the later part of this discussion.

4. Initiatives taken by the State :

a. When the 86th Amendment was going to be finalized, the Central Govt. run by the National Democratic Alliance appointed an Expert Group headed by the noted economist Prof. Tapas Kumar Majumdar. The Group was asked to prepare an estimate of expenditure that would be needed during the Tenth Five Year Plan for arranging Universal Elementary Education. The Group carefully examined different aspects of the matter and submitted a valuable report in January 1999, Naturally, with lapse of time, the financial part of the recommendation has lost its relevance. Here we want to focus on the Group's observations relating to undifferentiated type of education for children belonging to different sections of the society. The following comments are worth quoting : "Looking at the Fundamental Right to elementary education as a justiciable legal right of all the people, the Group made the basic decision to calculate the cost of real formal schooling and did not accept the position, often urged on it implicitly or even explicitly, that the cost estimate should be reduced by assuming that only the cheaper variants of non-formal or part-time education needed to be provided for the millions of children who have remained out of school." In the concluding part of the Report, the Group remarked, "To conclude, most of the operatrional part of this report rests on the simple premise that the granting of the right to elementary education, as a justiciable fundamental right of all citizens of India up to the age of 14 years, implies that all children including those who have so far been deprived of the opportunity of schooling, have equal entitlement to a period of formal and normal schooling that the state has already made available to the

average school - going child. The Expert Group, therefore, looked at innovative alternative schooling forms but did not favour any different and less costly mode of schooling, whether formal or non-formal, for the deprived children which is sometimes advocated, even if reluctantly, on the oft-repeated ground of the shortage of resources in the hands of the state."[5]

At this point, it may be relevant to touch upon the basic idea behind open schooling system. We have to establish and conduct open schools for those persons, not children, who for their age, occupation, family condition or any other socio-economic or physical handicap are not in a position to join formal schools. But this alternative system can never be accepted for imparting fruitful elementary education to boys and girls belonging to the age group of 3 to 14 years. The open school is not suitable even for the youth who move on to the next stage of education without break. But unfortunately we see that during the last one decade or so, a few experts working in the educational research institutes of the Central Govt. are propagating the idea that the formal school system is outdated, useless, and should be abandoned; instead, the open system is qualitatively much better and is the future for the nation. That this is the intention of the Union Govt. is amply clear from the fact that the Expert Group had to withstand some sort of pressure for accepting the cheapter variety - euphemistically called 'cost - effective' - as the basis of its estimating the cost of universalisation of elementary education. It is interesting to note that even NCERT, an organ of the Central Govt. has not hesitated to express concern at the Government's steady withdrawal from its responsibility and increasing thrust towards cheaper alternative version of education. In this context it has cautioned us 'to be vigilant about the pressures to commodify schools and application of market-related concepts to schools and school quality.'[6]

b. The next initiative on the part of the Central Govt. came in the wake of the 86th Amendment of the Constitution. Implementation of this new provision of the Constitution is not possible without enacting a suitable law. The then Union Govt. under the N.D. Alliance placed a draft Bill in the Parliament for discharging its Consitutional responsibility relating to Right to Education. The attitude of the Govt. was reflected in the numerous flaws and infirmities in the draft. The Bill faced strong criticism and had to be withdrawn and replaced with fresh drafts for a number of times. The major points of objection to those drafts are noted below:

· That the Bill was prepared in an undemocratic manner. No meeting of the Central Advisory Board of Education (CABE) was convened in spite of strong demand from different sections of people and several state governments.

· That the Bill did not provide for any specific responsibility of the Central Govt. to extend financial assistance. The relevant section of the draft read,

"Central Government may render financial and other assistance to state governments .... In the discharge of their functions under this Act.," Use of the verb 'may' obvisously kept open the scope for not rendering help.

· The draft provided for at least three different kinds of schools, thus seeking to legitimize parallel expensive elitist education system along with the free education that the State is bound to arrange for all. This provision, if enacted, would lead to glaring class difference in the field of education.

· The list of disadvantaged groups included as many as 9 categories, whose children shall receive special attention. For determining economic backwardness, 'living below the poverty line' was chosen as the only criterion. Obviously, there is a big fallacy in this approach. The reality is not that all families living above that line are well-off. In many cases families are placed above the poverty line simply because their children are engaged in wage employment to supplement family income and are thus debarred from attending school. A much more justifiable criterion is 'economically weaker section' of the socity.

· The Bill sought to introduce some cheaper substandard system of education for the hitherto neglected children thus violating the principle of equality of opportunity.

· The Bill included a clause to impose penalty in the form of time on parents of out of school children. It is a cruel joke because the poort people are really not unwilling, but unable to send their wards to school due to financial handicap.

· The Bill continued provisions that would in effect amount to legitimization of child labour, thus defeating the purpose of the 86th Amendment.

· The chapter on the "process and control of education" revealed the dangerous attitude of the Central Govt. to encroach upon the right of the state governments in framing curriculum. The Bill made NCERT's curriculum mandatory for the states, but surprisingly kept the private schools out of this compulsion.

5. <u>The Changed Scenario</u>- While the issue of Right to Education was pending before the Parliament, the Lock Sabha elections were held and the BJP-led NDA govt. was replaced by the Congress-led UPA at the centre. A Common Minimum Programme was adopted by the new coalition govt. as its pledge to the people. This is the basis of the left force's support to the govt. from outside without which the govt. cannot survive.

The bunch of promises offered in the Common Minimum Programme (CMP) aroused new hopes among the people of the country. It was recorded in unambiguous terms that the Govt. would spend 6% of the GDP for education of which at least half would be earmarked for primary and secondary levels. A few days after the new Lok Sabha was formed, the Hon'ble President of India in his address to the Parliament on 7th June, 2004 reiterated the govt.'s pledge

in this respect. He also proposed imposition of an education cess on all central taxes for discharging the State's responsibility of reaching high quality basic education to all our citizens. People's expectations naturally got a new fillip.

This was followed by prompt action by the Govt. A draft Bill on Free and Compulsory Education as required by the Constitution was circulated to the stage govt. The Central Govt. took the democratic path and reconstituted the CABE. Its first meeting was help on 10th - 11th August where the draft was discussed threadbare. There was sharp difference of opinion on several aspects of the Bill leading to heated debate. Many members thought that the Bill has clearly exposed the difference between the Govt.'s promises and actions. It was felt that though the Govt. has changed what has remained unchanged is its lack of political will. Failing to reach a conclusion, the meeting decided to set up a committee under the chairmanship of Sri Kapil Sibal, minister of state for science and technology, for preparing a new draft of the Right to Education Bill in the light of the opinions expressed in the meeting. In June 2005, the Kapil Sibal committee placed its report along with a fresh draft of the Right to Education Bill. However, the Sibal committee did not undertake a total revision of ther Bill. It kept itself confined to only its essential aspects. The basis principles that guided the committee in this task are noted below :

1. Right to Education means that the State must provide full time formal education of statisfactory and undifferentiated standard for every child and empower it to complete elementary education.

2. Right to Educatron also means that it is obligatory for the State to remove all types of barriers - social, economic, linguistic, cultural, physical - that stand in the way of children's meaningful participation in and successful completion of elementary education.

3. Right to Education must be seen not only as a means to satisfy the needs of the education system or of the child, but also as the way to attain the other Constitutional goals like equity, justice, democracy, secularism, and social integration.

A few other recommendations of the Sibal committee are also very relevant. These are quite similar to our ideas. We may briefly note some of these -

1. Although the committee's terms of reference were limited to children of the age group 6 to 14 years, the committee kept mark of its goodwill and responsibility by taking the liberty to consider with due importance the phase of Early Childhood Care and Education (ECCE). It recommended to integrate ECCE with Primary Education as far as possible. Effective implementation of this scheme may, to some extent, make up the gap of the 86th Amendment Act in respect of children below 6 years of age.

2. The Siblal committee has deeply examined the question of mobilising fund for the purpose of UEE. At the outset, it has quoted a relevant part of National Education Policy, 1986/92. We may also reproduce that here "The National Policy on education, 1968, had laid down that the investment on education be gradually increased to reach a level of 6 per cent of the national income as early as possible.

<u>Since the actual level of investment has remained far short of that target</u>, it is important that greater determination is shown now to find the funds for the programmes laid down in this Policy. While the actual requirements will be computed from time to time on the basis of monitoring and review, the outlay on education will be stepped up to ensure that during the Eighth Five Year Plan and onwards it will uniformly exceed 6 per cent of the national income...."

After this, the committee has mentioned the UPA Govt.'s pledge in the Common Minimum Programme and the Hon'ble President's speech in the Parliament which has already been referred to in the present paper. This Sibal committee, by analyzing the accounts of the financial year 2003-2004 has shown that in that year public expenditure on elementary education was a meagre 2% of the GDP. Again, of this amount 88% came from the sick coffers of the states while the expenditure by the Central Govt. accounted for only 12%. This tale of shameful failure was perhaps too embarrassing for the Central Govt. to put up with. So now the committee has to talk about the possible revenue of Rs.6,975 crore as additional income.

The Sibal committee requested National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA)* to make an estimate of the possible amount of expenditure during the eleventh Plan period. NIEPA gave four alternative estimates on the basis of different assumptions. The picture is given below :

Sl. No.	Premise	Estimated expenditure during 11th Plan period (Crore of rupees)
1.	Teacher : Pupil ratio = 1:35, Central school salary scale	4,36,459
2.	Teacher : Pupil ratio = 1:35, average of salary scales in the states	3,93,307
3.	Teacher : Pupil ratio = 1:40, Central school salary scale	3,46,299
4.	Teacher : Pupil ratio = 1:40, average of states salary scales	3,21,196

But the Sibal committee did not accept NIEPA's estimate as correct and complete, The committee observed that the estimate was based on presumption on a few vital matters that are subject to change. The more important thing was that NIEPA's estimate had omitted the additional expenditure that the Central or the state governments will have to incur for giving effect to the provisions included in the Bill for empowering the economically weaker section. The committee, therefore, wanted to arrive at a flawless estimate of expenditure in course of finalizing the draft through discussion.

This realistic analysis has revealed the positive attitude and sincerity of purpose which are really praiseworthy. On the question of financial responsibility of the Central and State Governments too, the committee has reminded the fundamental obligation of the Central Govt. This part of the report deserves to be quoted –"The very substantial financial implications of the recommended provisions may have to be borne almost entirely by the Central Govt. as financial condition of all state governments is unsatisfactory." [emphasis by the committee itself]. We can expect hardly anything more from a committee headed by a minister of the Govt.

However, the committee has admitted one of the limitations of its procedure of work. Several members of the committee had strongly argued for obtaining public opinion on the draft through regional conferences and internet before giving it a final shape; The report has stated that this could not be arranged for shortage of time. But one wonders whether the time taken by the committee was really too short – from August 2004 to June 2005 !

The CABE draft prepared by the Sibal committee contained a good number of positive provisions. The expression 'weaker sections' replaced the 'poverty line' idea as criterion for selection of people deserving special attention. Child labour was defined to include children who are unable to attend school due to their engagement in household chores in addition to the wage – workers. 'Free education' was clearly defined as an arrangement where the child would not be required to pay any fee to the institution and also to spend money in any other form that may impede the child's participation in elementary education and its completion. Perhaps the most remarkable feature of this draft was the provision regarding the Central Govt.'s financial responsibility. Judging its importance, we quote this section –Sec. 9. "Responsibility of the Central Government – Provision of Free and Compulsory education shall be the concurrent responsibility of the Central and appropriate governments with the Central Government's responsibility consisting of the following :

1. Provision of financial assistance to state governments in accordance with such formula regarding sharing of costs of implementation of this Act,

as the Central Government may determine from time to time in consultation with them......"

There are four other subsections to this section which are not so relevant here and hence are not reproduced. It is true that the provision quoted above does not impose full financial responsibility on the Central Govt. Neither does it give any specific idea about the amount of money to be spent by that Govt. Yet we find relative progress over the previous draft on two counts - First, the verb 'may' has been changed to read 'shall', implying that the Central Govt.'s responsibility is not optional, but compulsory. In the second place, the quantum of financial assistance from the Central to the state govts. shall not be determined unilaterally by the Central Govt. This will be based on consultation with the latter. It is perhaps idle to cherish very high hope about the outcome of this process of consultation. But in the present situation, given the class position of the Govt., expecting something better than this would also be equally unrealistic.

Subsequent events followed normal course. A comprehensive draft of the Right to Education Bill, as recommended by the Sibal committee, was sent to the state govts. on August 26, 2005. The school education department of govt. of West Bengal sent its considered opinion on the draft on 19th September. In these circumstances, it was naturally presumed that the Bill would be finalized after receiving the reactions form the different states and placed before the Parliament. But it was just at this juncture that events took an unexpected and unprecedented turn. The message of the change of track was brought by the letter dated 21st June from the Secretary of the Central Govt. to which reference has already been made in the very second sentence of this article. We must, therefore, look into the contents of the letter sent by the Secretary, Department of Elementary Education and Literacy, Govt. of India.

The letter states that the comprehensive Bill relating to Right to Education was sent to the states on 26th August 2005. But reactions to it have been received from only a few states. After holding further consultations on this matter, the following proposals are placed:

- Instead of one central legislation, a model Bill will be sent to the states. Those states which have not yet enacted any law in this respect will pass their laws and those states that already have such Acts will suitably modify them in the light of the proposed model Bill.
- It is also proposed that in the matter of revenue expenditure in any state. Free and Compulsory Elementary Education shall be given priority only after law and order.

- The Central Govt.'s financial assistance will depend upon adoption of suitable legislation – newly enacted or amended – by the respective states. Those states that will fully adopt the model Bill in enacting or amending their laws will continue to receive SSA grant on 75:25 basis during the 11th Plan period. But the States that will fail to follow the model Bill without any deviation will get money on 50:50 basis as per existing agreement.

A copy of the model Bill was forwarded along with the letter with the request that the state govt. would carefully examine the provisions proposed in the Bill and send their considered opinion within 3 weeks.

The model Bill contains several positive provisions that deserve detailed discussion. The third chapter of the Bill deals with responsibility of the state for ensuring right to education. In this context, the Bill uses the term "Appropriate government." In see 2(1(c), "Appropriate government" has been defined to mean:

i. The state government in the case of territory comprised in a state;
ii. The government of a Union Territory, in the case of a Union Territory having its own legislature;
iii. The Central Government, in the case of other Union Territories.

'Provided that in relation to schools and institutions run by the Central Government, the appropriate government will be the Central Government regardless of their location.'

We cannot but raise in clear terms a few pertinent questions on the statements contained in the central secretary's letter dated 21st June and also about the draft model Act.

In the first place, the letter has stated that the decision of not making a central legislation and farming a model Act instead was taken after holding consultation. We would like to know when, with whom was the consultation held, and following what procedure. Was this proposal placed at any meeting of the CABE? Which democratic method was adopted for the basic deviations made from the Sibal committee's recommendations? Are the actions sufficiently transparent without these pieces of information?

Secondly, while the states are given the power to make legislation, pressure is put on them to adopt the model Bill in its totality by proposing lower financial assistance in case of failure. Can such indirect compulsion go with the idea of autonomy?

Thirdly, will the Central Govt.'s financial responsibility remain confined to the SSA account only? If so, what happens to the pledge uttered in the

Common Minimum Programme and the promise given by the hon'ble President on the floor of the Parliament? How does the Govt. account for the fund collected through the education cess? Is the Govt.'s normal budgetary allocation swallowed by the time-bound SSA project?

Fourthly, the stipulation that the state govts. in their plan of expenditure shall keep education in the second place only after law and order is not just an advice. It is mandatory in so far as it has been incorporated as a part of the model Bill in section 5(1), non-compliance with which will mean Central fund at a reduced rate. Is it not blatant encroachment into the limited financial autonomy that the states enjoy?

In the last place, will the decision to frame a model bill instead of a Central Act and also to tag such conditions, be placed in the Parliament for approval? If not, where from will this scheme derive legal validity? It may be noted that although no Right to Education Bill was pending before the Parliament, the issue of making the appropriate Act was very much a part of its agenda !

It seems necessary now for the citizens to spread the debate around these questions as widely as possible and demand reply from the Central Govt. Simultaneously it is our duty to mobilize public opinion on this matter giving priority to the following demands :

1. We whole-heartedly support the move to give the states the power to enact legislation in the field of education. In fact, people of West Bengal have always strongly opposed the decision to include education in the concurrent list of our Constitution. We want the proposed arrangement to be a permanent feature. At the same time we assert that there must be no conditionalities attached with this right of the state govts., which in effect are tantamount to curtailing their autonomy.

2. The entire financial responsibility for ensuring the Constitutional Right to Education for All must be borne by the Central Govt. Many experts have established this requirement and their arguments are irrefutable. The Kapil Sibal Committee also has taken such a position in unambiguous terms. Central Govt.'s retreat from this task will have devastating effect on the nation's development. This just cannot be allowed to happen.

3. Achieving Universalisation of Elementary Education does not depend only on the govt.'s education policy. It is deeply influenced by the policies followed by the govt. in other social sectors. If effective measures are not adopted for abolishing extreme poverty, the desired spread of education will remain an idle dream. Only the Central Govt. has the responsibility and the power to build up a favourable social situation for this. Therefore, the orientation of the Central

Govt.'s financial policies must be turned from the neo-liberal free market system to the concept and practice of welfare state.

4. Whatever scheme the Central Govt. may decide upon to honour the mandate given by the 86th Constitutional Amendent must be backed by a piece of legislation of the Parliament. This cannot be done through administrative order alone.

6. **National Knowledge Commission :** It is heartening to note that in holding the views expressed in the foregoing paragraphs we can draw strong support from the first Report of the National Knowledge Commission. We may quote a few observations of the Report to clinch the issues. Reagarding the model Right to Education Bill, the Report says that the "NKC has persured the Bill and consulted with a wide range of experts and educationists. It feels that the model bill is flawed for a number of reasons, and most importantly that such legislation must be enforced by the Central government following upon the commitment made in the Constitutional Amendment Article 21 A." (Emphasis ours). Supporting the case for a central legislation, the Report suggests that "such an Act may be passed 'along the lines of the Panchayati Raj (Amendment) Act, requiring the states to eanct Right to Education Bill within a specified time period, and with the primary financial responsibility for this resting with the central government". (Emphasis ours). It has also pointed out htat it is quite possible for the central govt. to provide the bulk of the additional funds required to ensure the Right to Education.

Coming to the point of justiciability, the report has observed that 'in the model bill sent to state govts, the onus is placed on parents or guardian of the child. The responsibility of the government, at different levels must be recognised and made justiciable'. The Report even suggests the setting up of a 'redressal mechanism' with an appropriate procedure for helping 'students or parents in case their right is not upheld'.

The Report felt the necessity to itnegrate 'children of the disadvantaged, landless and minority communities... along with children with disabilities or special needs.' Emphasizing the need to provide the same type of schooling for children from different background, the committee did not favour the model bill's approach. It commented, "The model bill has the potential of creating a parallel and discriminatory system of schooling which can result in stratification of the education system for children from disadvantaged communities and backgrounds, because it requires only provision of non-formal education in such case, rather than mandating the provision of regular schooling".

Long five years have elapsed the enactment of the 86th Constitutional Amendment. It is distressing indeed to take account of the nation's achievement after the mandate.

References :

1. Learning : The Treasure Within - Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty first Century, UNESCO Publishing, 1996, p-13.
2. National Curriculum Framework, 2005 - NCERT, New Delhi, p. 66.
3. National Curriculum for Elementary and Secondary Education - A framework, NCERT, New Delhi, 1988, p. 4.
4. National Curriculum Frame 2005, NCERT, New Delhi, p. 9.
5. Expert Group Report on Financial Requirements For Making Elementary Education A Fundamental Right, Para 6, 1.
6. National Curriculum Frame 2005, NCERT, New Delhi, p. 10.
7. First Report of the National Knowledge Commission, 2006. Government of India, 2006. pp. 38-39.

---

*This Institute has subsequently been elevated to the status of a University and come to be known as National University of Educational Planning and Administration (NUEPA).

FREEDOM IN EDUCATION

—Sakti Pada Bhattacharyya

Human civilisation is threatened today with the greatest crisis in its history. The tremendous success of both technological and economic adventures in the eighteenth and nineteenth crenturies ushered in a new era in human history- an era of immense possibilities. Success breeds complacency. But that easy optimism and self complacency of the nineteenth century has been rudely shattered by the two gigantic upheavals in the first half of the twentieth and the third world war is supposed to be knocking at the door of our history. Humanity seems to be drifting towards an atomic war with all the inexorabilities of it Greek tragedy. It is understood by all that the atomic war will put our present civilization practically to an end. But men appear to be helpless - he is helpless before the Frankenstein created by him. Today, the creator has been attacked by his own creation and that is the tragedy of thecontemporary history of mankind. The scientific and technological achievement of man is haunting him like a nightmare days in and days out and he does not know the way out of it. We are thus to day in a vicious circle. The optimism of the nineteenth century is replaced by the darkest pessimism in the middle of the twentieth. Is that pessimism the projection of the ominous shadow of the Death and Destruction that is going to devour the whole of human creation and civilization.

The crucial question of day is - what should be the purpose of education? The persons who advocate freedom in education must regard freedom of individual man and woman as the supreme value and their purpose of education is to create free men and women. Any attempt of create students in accordance with an*a priori* pattern involves educational regimentation which means the end of freedom in education. Education and knowledge should enable men to unfold their own potentialities. In this respect, we should remember the famous Kantian dictum - treat men not as a means but as an end. Man is an end in himself and education is simply a means to help him to develop his own faculties. Men are not equal temperamentally and intellectually. Men are likely to respond differently to a given environmental stimulus. Efforts to create standardised men and women through education is to block the road to progress. Education should furnish men with data and with logic but conclusion should not be forced upon them. The emotional, temperamental, and intellectual differences in men and women should not be destroyed, but on the other hand, these differences should be given fullest scope to unfold and develop themselves. Dead uniformity may be the ideal in mechanics, but man is a biological entity and the laws of biolgoy

and those of mechanics are different. In the biological, social field, the law of unity in diversity should operate which is different from the principle of dead uniformity.

The usefulness of technical and specialised knowledge cannot be overestimated. But earning is not the sole aim of learning. Learning without the possibility or capacity of earning is an absurdity and learning for the sole purpose of earning is a vulgarity. Learning has got a human and not only an economic value. Education will make a man free, balanced, decent and cultured. For this the technical knowledge alone is not sufficient and the necessity of what is generally called "useless knowledge" is paramount.

The syllabus and carriculum of education therefore, should be a balanced one. There cannot be any freedom in education unless every aspect of an individual man gets the scope of development. Considering this point, we can suggest this formula as a tentative recommendation : -

Gymnasium for the body, music for the mind and science for the intellect. Plato recommended only gymnasium for the body and music for the soul. But in these days of science and industrialism we cannot but add the third item, namely science for the intellect. The word science here must be given a wider connotation to include social sciences as well.

Everywhere the originality of the students should be encouraged and attempts should always be made to develop their free thinking. In an academic institution no theory should be placed before them as a final one. Freedom in education knows no finality. Different viewpoints should be brought before them and their thinking power should be stimulated. Similarly in a technical institution every attempt should be made to develop the original thinking of the students. Attempts must not be made to produce stereotyped technicians.

Freedom in education demands discouragement of cramming and stimulation of one's own original power. The ideal of the freedom in education can be realised only if the teachers value their ideal and try to create students accordingly. The teacher should treat his students as an end and never as means. The teacher should always try to realise the ideal of freedom in education through his teaching. A teacher must not demand blind faith from his students but should stimulate the questioning spirit of the students. One role of the teacher is, in fact, not to provide satisfactory solutions of all problems, but to raise a critical spirit in the minds of the students so that they can try to solve problems independently. A teacher should not take the place of a mediaeval "Guru" but he should be the friend, philosopher and guide of the students. The practical problem, therefore, today is to create such teachers. One must first of all educate

the educators. The question of pay of the teachers is a pressing one which, if remains unsolved, may render the whole scheme of freedom in education no better than a castle in the air.

It is a matter of great regret that now-a-days neither the teachers nor the students put any seriousness on the extra-curricular activities. They are sometimes regarded as susperfluous. But this tendency must be given up altogether. In fact, the ideal of freedom in education can be realised more through these extra-curricular activities of the students than through the routine work with the text-books.

The ideal of freedom in educaiton cannot be fully realised if education is regarded as something confined to the normally accepted educational institutions. Educations, in fact, is a social process. Society has created schools. "Education in its broadest sense is the means of their social continuity of life." Education does not mean the cultivation of scholastic studies. Education is much more than that. A man receives only a part of his education from the schools and colleges. The other part - perhaps the major part - he receives from the society at large. Therefore the ideal of freedom in education can be realised only in a free society.

Education with the ideal of freedom is perhaps the crying, need today. True education alone can enable a man to take an individual attitude instead of being a screw in the gigantic machine called the Mass. Today the unscrupulous demogogues are using men like 'X' and 'Y' in our algebraic calculation. When the purpose is solved they forget the men as we forget our 'X' and 'Y' which assist us so much in solving problems. True education which will create free men and not stereotyped mass can be regarded as the panacea of the evils, the modern world is suffering from. Of course no patent medicine is likely to cure the patient. "Theory is grey, but ever green is the tree of life." Today the whole world is in a crisis- the humanity is in agency and the human civilization is in anguish. True education with freedom as its ideal can alone save the present civilization from total extinction.

"The world is weary of the past,
Oh! might it die or rest at last."

CURRICULUM AND COMMUNITY

—A. K. Bhattacharya

The success of an educational system depends on how prescribed educational curriculum are handled in the classrooms, and a good curriculum may in practice turn out to become ineffective and inefficacious if the classroom situation - including material resources - fail to cope with the demands of the curriculum. Experts suggest and authorities prescribe curricula for educational institutions without paying much attention to this aspect, and consequently student's success at the Board's examinations and later, in the employment market differ widely on the basis of the school they attended. Thus a good urban school differs from an ordinary school in the suburbs or in remote rural areas, although both the schools are under the curricular control of the same Board of Education.

Inequality Among Schools

The Education Commission,1964-66 wanted proper development of all schools and, for the purpose, recommended the introduction of a system of neighbourhood school. But even today we are thinking of OPERATION BLACKBOARD which shows how the pious hope of the Education commission has been dashed. Inequality of educational facilities offered by institutions of different types (residential, non-residential etc.) and functioning in different locations (urban, rural etc.) still persists. In spite of the suggestion offered by education committees and commissions for minimising the qualitative difference between educational institutions little can yet be claimed to have been done in this regard. Curricular changes have brought much credit to the "good" and "rich" institutions while the rest are still being disgraced under one name or another.

Curriculum Misused

When a curriculum is imposed from above without prior survey of (1) the diverse socio-economic conditions of localities where schools are functioning, (2) the demands of the commonalty that dream of no miraculous change in the life of their children by virtue of the education they receive, and (3) the nature of resources that are available to the learners in each locality, the effect of the curriculum will vary from one institution to another. In the Madhyamik examination every year, it is a common experience to find that majority of the sent up candidates of some schools pass in the first division with no one awarded a "fail" while in some other schools the success list is almost the opposite. This is a pointer to the fact that curriculum designers sometimes fight shy of the diversity plaguing the educational scenario for lakhs of school-going teen-agers.



শতবর্ষ অনুষ্ঠানে প্রাক্তনীদের সঙ্গে মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী শ্রী সুদর্শন রায়চৌধুরী, মাননীয় পূর্তমন্ত্রী শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী আশিস কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

The worth of a curriculum depends on the curricular transaction taking place in the class-room through teacher-pupil interaction. The teacher is both an individual - a product of his socio-economic environment – and a professional who has taken up teaching as the only source of income. The pupils - children and teen-agers - are highly susceptible to influences of what they are offered verbally or materially, and grow up under those influences. If a school fails to provide adequate material support to the curriculum that it follows, the teachers there cannot but dilute the curriculum to a mere collection of the syllabi of a few subjects which are to be handled in the class-room with the sole purpose of teaching the learners how to write answers to certain given questions in order to pass examinations. Guardians also feel satisfied – extremely satisfied – at this minimum achievement of their children, and have scarcely any time, energy or enthusiasms to think how far an improved or modified curriculum has improved or affected the education of their wards. Students pruchasing education at almost a "throw-away price" in not-so-good institutions grow up conscious of their limitations in comparison to those who are fortunate enough to attend "good" and "rich" schools.

Indina Society and Educational Curriculum

Dr. Shib K. Mitra, Director of the National Council of Educational Research and Training, New Delhi, once wrote (see NCERT : Reflection on curriculum, 1984, p. 4) : "If curriculum has to respond meaningfully to children coming from .... Various diverse communities living in very different kinds of historical, geographical and cultural conditions, it is obvious that a centralized model of curriculum making cannot be very much of a success". He further emphasized the rural-urban divide in the Indian society and noted with regret : "it is difficult to do justice to both rural and urban India in one curriculum".

The divide in the Indian does not rest with the parameters of caste, religion or ethnicity only. These division, can be, and are being, tackled successfully with political good will and constitutional safeguards. But there is an additional divide in the same ethnically defined community; it is the division between the "haves" and the "have-nots", and it bodies ill for any educational curriculum imposed from abvoe curricular improvements and innovations become effective in institutions according to the local clientele's attitude and facilities available there. This trend and its effect have been summarised in the following words of Dr. Shib K. Mitra : "Those parts of the country which are advanced educationally tend to accept innovations more readily and organize suitable programmes more quickly with the result that the gap between the more advanced and less advanced parts of the country increases".

Consequently India is faced with the perennial "problem of increasing egalitarianism on the hand and, on the other, increasing inequality".

NPE and Material Improvement of Schools

Effective curriculum transaction in the class-room situation presupposes a perfectly harmonious tuning of the curriculum with the teaching/learning atmosphere prevailing in the school. The National policy on Education - 1986 contains certain commitments with regard to the curriculum for Non-Formal education : "Effective steps will be taken to provide a framework for the curriculum on the lines of the national core curriculum, but based on the needs of the learners and related to the local environment" (para 5.10). But this is a universal need of school-going children reading in hundreds and thousands of primary and secondary schools in the remote rural areas. Both these learners and their teachers need a curriculum which is based on these learners' needs and related to the local environment, to handle it effectively, efficiently and with interest and enthusiasm.

The NPE-1986 similarly makes it obligatory for the authority to supply adequate audio-visual aids to the non-formal education centres" "Modern technological aids will be used to improve the learning environment of NFE centres" (para 5.9). These are equally needed for children in the rural primary and secondary schools to make curricular activities interesting and enjoyable to them. That curricular activities are not to be left to the "resourcefulness" of the helpless teacher facing as many as 50 or 60 or even more sutdents in class-room with little material support (viz. improved audio-visual aids, language-laboratory for L_2, properly furnished and well-maintained class-rooms, teacher-pupil ratio to the tune of 1 : 20, teachers not over-burdened with five or six periods of work a day etc.) for the work he is entrusted with can hardly be refuted. The programme "Operation Blackboard" is also a pointer to that. A school needs to be provided with the minimum material support for improved curricular transaction and the "minimum" is not necessarily always the minimum (see NCERT "Operation Blackboard", 1988).

Communicated Subject-Matter

It was as early as in 1916 when John Dewey put forth his ideas on the nature of subject-matter. In informal education, he wrote, "subject-matter is carried directly into the matrix of social inter course. But in formal teaching, this is not so. The teacher here has to be careful in handling the subject-matter of a formal course of teaching with an eye to "its interaction with the pupils" present needs and capacities". According to Dewey numerous developments in science and technology have "created an immense bulk of communicated subject-matter", and about this communicated subject-matter in educational curricula, he is of the opinion : "The amount heard or read is of no importance" if it does not grow naturally out of some question with which the student is not concerned. The subject-matter can become meaningful to the learner "provided the student has a need for it and can apply it in some situation of his own";

otherwise the student is obliged to learn "for school purposes, for purposes of recitations and promotions" (Democracy and Education, Chapter-14). In 1938 he reiterated his belief that "attentive care must be devoted to the conditions which give each present experience a worth while meaning"; he criticized the traditional schools as they "tended to sacrifice the present to a remote and more or less unknown future" (Experience and Education, Chapter-3).

A curriculum staffed with "communicated subject-matters" presupposes a school environment that is rich in resources both human and material to make the teaching / learning process based on the content of the curriculum a living experience for learners. Well-known residential schools spend lavishly on infrastructure to provide all facilities for implementation fo the well-designed curriculum with an eye to the planned development of their inmates' "body, mind and soul". Ordinary schools fail to catch up with this progress and concentrate exclusively on transmitting verbal information to, and developing mathematical skill in, the children.

What is needed

The need of the hour is therefore an all out effort to make the curriculum rightly effective in hundreds and thousands of primary and secondary schools. For the purpose it is necessary to enumerate not only the future academic needs of the learners in each region / area and the employment potential of educational programmes, but also to identify and enlist the resources that can be made available to learners. A survey of these factors is urgently needed to precisely describe the objective of an educational programme as well as to efficiently specify the contents of a curriculum that will work.

PUPIL-PUPIL RELATIONSHIPS IN OUR SCHOOLS

—Kulada Prasad Chaudhury

Relationship seems to be the magic word for the phase fo civilisation through which we are passing at the moment-Proper Relationship appears to be answers to most of the big questions which civilisation poses today : How to ensure World Peace ? Proper relationship between nations is the answer. How to stimulate Industrial Out-put? Proper relationships between management and labour is the suggested solution. How to tackle the rapidly increasing problems of delinquency, neurosis and psychosis? Try to have the individual relationships properly set, is the line of approach recommended. Similar examples can be multiplied to almost any extent.

It is unfortunate that human relationships are lying at a very low Ebb in the present world. Pthological human relationships appear to be a necessary concomitant of Industrial Civilisation. The impersonal nature of human relationships in industrial societies and the substitution of non-material values by material ones necessarily degenerate relationships between its members. According to Hindu Scriptures, we are now in the midst of '*Kaliyuga*' ; the etymological meaning of the word is 'Quarrel'. No body can deny that most of our relationships are based on quarrel or competition in some form or other. At the same time we are painfully realising that we live in and through human relationships. It is our relationships which make our life meaningful and that it is for them we live.

There is no field in which human relationships are more important than in that of Education. It is believed that the process of education consists in interactions (mutual relationships) between the educator and the educand - Education is the modification of human behaviour which results from such interactions. The effectiveness and desirability fo the resulting education depend upon the intensity and the nature of the interactions responsible for bringing it about. Life can be viewed as series of interactions developing desirable or undesirable behaviours in people, in accordance with the nature of interactions in and through which they live. In formal education, we try to plan the interactions so that they might be wholesome and complementary to one another, resulting in the development of desirable behaviour among the educands. Educational institutions, now-a-days, are considered as places, where relationships between the members are specially planned with a view

to develop certain special types of behaviour in them. But even though 'relationship' is the core of education, our schools are being increasingly infested with the same types of pathological-relationships which could be found in the society in general. Like those in society our school relationships are gradually losing their personal character and are becoming more and more impersonal in nature. When a relationship develops in our educational institution, in most cases, it is not two human being who meet with their feelings for the satisfaction of mutual needs, but it is two members of the same institution meeting for the realisation of an objective assigned by the institution. For example, when Mr. 'X', the teacher and Master 'Y' the pupil, meet in the class, the basis of the inter-relationship is the consciousness of their roles as teacher and pupil of the institution respectively - Mr. 'X' and Master 'Y' as persons are lost, as both derive their roles from the institution; both of them act as impersonal agents in this relationship. Impersonal relationships do not have the warmth of personal relationships; they do not result in the direct satisfaction of needs of persons involved in the relationship : At best, they are based on such sense of values as duty, justice and the like. On the other hand personal relaltionships are outcome of direct human needs. They result in direct satisfaction of the persons involved and are based on love, co-operation and such other human virtues. Imagine, for example, a person in ancient India had the realisation of a truth and he had an urge from within to share his realisation with others; another person had the urge to realise the same truth, but he was unable to do so without some help. When a relationship was established between the two, it could be described as a personal relationship. Mother-child relationship can be cited as a typical example of personal relationship. In an impersonal relationship, an individual is often under stress and strain; he has to repress and restrain himself for the impersonal role (e.g. as teacher or pupil of an institution) which he is called upon to play. Such relationships are not conducive to the growth of human personality and human happiness.

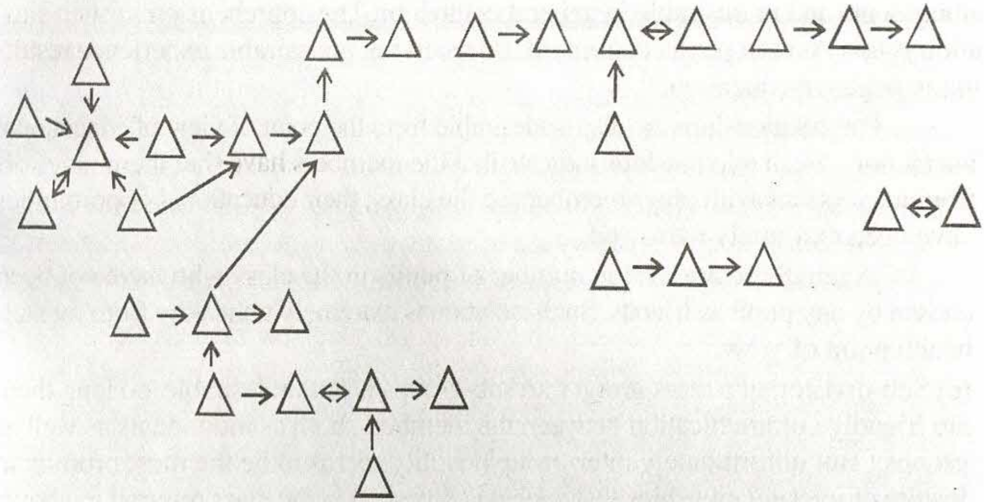
It is felt that rapid increase in mental ill-health and alarming growth of aggression and such other undesirable behaviour in the modern world are mostly due to the impersonal relationships in and through which one has to live in an industrial society. "Education is a field where impersonal relationships are least desirable. They are ineffective as educational experiences and often result in negative education rather than in positive one. The success of an educational institution largely depends upon organising its relationships in personal level. But what is the situation in our schools at the moment?

We respond to the demand of relationships as Headmaster, Teacher, Pupil etc. and not as human individuals. Impersonal relationships are at its worst, when affinity to the institution which is the basis of the relationship is weak. It is regrettable that in Indian schools though we have relationships in impersonal level, there is no deliberate effort to strengthen the affinity of its members to the school; rather (unknowingly) steps are taken to undermine the affinity which naturally develops in such situations. Again, impersonal relationships cannot work, unless such values as sense fo justice, devotion to duty and the like are properly developed. As India did never have the tradition of impersonal relationships, she did not specially develop the values mentioned above; besides, being in the cross-currents of transition. She has almost lost the values which she had and had not given thoughts to develop new values to suit the new type of relationships. This has made our personality extremely unsuitable for the development of impersonal relationships in satisfactory level. Our only salvation lies in the scientific planning of our educational relationships. With this end in view, let us try to analyse our school relationships.

For the purpose of analysis school relationships may be classified as below : (a) Pupil-pupil relationship (b) Pupil-teacher relationship (c) Teacher-teacher relationship (d) Headmaster teacher relationship. This classification is by no means water-tight; one type of relationships have necessary repercussions on the others; they also overlap; one type of relationships cannot be planned without reference to the others. We should be concerned with the total pattern of relationships in schools. It is only for convenience of discussion that the scope of the present article is confined to pupil-pupil relationship.

Pupil-pupil relationships in schools are by no means less important than pupil-teacher relationships. As pupil-pupil relationships are more personal in nature, as they are more need-centred and as they take place more or less in the same level, they are more effective from the point of view of education. It is a trusim that everybody learns more from his peers than from his superiors or elders : self and mutual education by pupils are accepted principles in modern education. The teacher plays the role of a general leader and planner. Moreover, pupil-pupil relationships constitute the bulk of relationships in schools. Hence they should be planned with the greatest care.

The following diagrammatic (Sociometric) presentation of pupil-pupil relationships in class VII of a girls School in Calcutta should give us some idea about the existing state of affairs in the field.



A study of the above Sociogram reveals the following :

(a) The class of 30 pupils is disintegrated into as many as 10 small groups, limiting the scope for free interactions among the members of the class : Limitations in free interaction necessarily reduces the possibilities for education. For example, no single purpose, no general attitude, no general system of values, can be developed in the group as a whole. Number of interactions and their variety would also be necessarily lesser in such a situation.

(b) Analysing further the characteristics of the sub-groups we find that there are 3 'Star-group' (two or more pupils chosing one pupil as friend). 3'Pair-groups' (two pupils mutually chosing one another as friends) and 4 'Chain-groups' (more than two pupils, one being friendly to the other, without any reciprocity of relationship).

Formation of star-groups in classes, are not undersirable in themselves, unless pupils selected as stars possess undesirable behavioural traits and unless co-operative inter-relationships between the star-groups and the other groups are hindered. Enquiries in regard to the class in question revealed that, pupils at the centre of attraction in two of the star-groups (out of three) were poor in school

---

1. The Sociogram has been drawn on the basis of the answer to the following questions to the pupils :

   We are going toe re-arrange the sittingarrangements in the class :

   (a) Name the friend whom you would like most to sit next to you.

   (b) Name the pupil whom you would like least to sit next to you.

   The information given by you would be kept strictly confidential.

2. Key to the Sociogram :

   (a) Δ = A pupil, (b) → = Acceptance as friend, (c) –*= Rejection as friend,

   (d) ⟷ = Mutual acceptance as friend, (O) *–*= Mutual rejection as friend.

attainments and undesirable in general behaviour. The apprehension in such situation is this that the pupils concerned are receiving undesirable experience resulting in negative education.

Pair relationships are also undesirable from the point of view of educaitonal interaction : Such relationships indicate that the members have shut themselves off from interactions with other members of the class; their educational opportunities have been extremely narrowed.

Again there are a large number of pupils in the class who have not been chosen by any pupil as friends. Such isolation is extremely unhealthy from mental-health point of view.

(c) Sub-division of a class group into sub-groups is not undesirable, so long there are friendly communication between the members, both as individuals as well as groups : But unfortunately inter-group hostility seems to be the most prominent feature of inter-relationships that is being carried on in the class referred to above. Seven groups (out of ten) with memberships of twenty three (out of thirty) are involved in hostile relationships. In fact, mutual aggression and hostility between pupils become apparent even to a casual visitor to our schools : Predominance of such relationships, reduces our schools to places of negative education, rather than that of positive education.

We have presented an example of pupil-pupil relationships in one class in a school, but it is believed that pupil-pupil relationships in schools in general are not different from what has been presented in the example. In short, though successful education depends largely upon satisfactory pupil-pupil relationships, no attempt has yet been made to plan them on scientific basis inspite of the realisation of the fact that they are at a very low ebb. An analysis of cuases of the unsatisfactory pupil-pupil relationships existing in our schools should give us insight into the manner in which they might be planned. Class-groups in our schools cannot become closely knit, because they do not have enough opportunities for co-operative activities between themselves. In our class-room situations it is the teacher who interacts with the pupils as a group (impersonal relationship) who remain more or less passive in the interaction. For the purpose of developing co-operative interactions between pupils inside the class situation, it is necessary to reorganise oru class activities - the class should be divided into a number of problem solving groups in which each member should have scope for contribution according to his interests and abilities; the composition of the groups should also change freely so that every member of the class might have opportunities for interaction with every other member. Activities outside the class-room should also be planned according to the same principles. Increase in the integration of the class as a group would necessarily mean increase in the number of desirable and varied interactions between the members resulting in better and more effective education.

Absence of opportunities for free co-operative inter-relationships as described above leads to the formation of star-groups. Formation of star-groups

necessarily limits the scope of free interaction; they are anti-democratic. They are most unhealthy when stars are pupils with undesirable behaviour. Negative attitude to school authorities resulting in negative attitude towards approved school activities, are greatly responsible for this type of situation. Besides, if the pupils have little opportunities for manifesting themselves through approved school activities and if school activities do not offer enough scope for leadership to many, stars might be selected from pupils who excel in activities outside those approved by the school. Improving teacher-taught relationships, diversifying school activities, allowing scope for leadership to many and intensifying co-operative activities between pupils seem to be the cure for the malady.

Inter-group hostility is another alarming feature of our school relationships. Far from being co-operative, most of out pupil-pupil relationships are hostile in nature. As is well-known, aggressive behaviour is a necessary manifestation of repression. The school situations and school relationships frustrate the child too much; activities in schools have no relation to the felt needs of pupils; most of their actions are constraint actions - they are actions undertaken either under the threat of external punishment or at the prospect of external reward. Under such a situation, aggression in any form against anybody is psychologically satisfying. Again some of our school practices and activities encourage hostility between pupils. Teachers are constantly in the habit of comparing one pupil against the other as a means of simultating desirable behaviour among them, not being conscious that such practice develops jealousy and hostility among the pupils. We have accepted competition as an incentive to desirable behavior even in educational instituions. We openly stimulate competition by prize distribution, mark-reading-parades and the like without being conscious of the hostility they generate. With an extra competitive society rearing the children and with school experiences, as they are, it is only natural that our school relationships will be marked with aggression.

Pair-group relationships are due to extreme insecurity among pupils in schools. Pupils find the demands of the school (both intellectual and social) too much for them; the school situation frightens them and they try to escape from it by building up exclusive relationships with another pupil.

Many of the pupils fail even to do that and they are the isolates. Isolation from peer group results in mental ill-health which stands on the way to proper assimilation of educational experiences and produces undesirable behaviour.

The above discussion should convince us of the urgent necessity of scientific planning of pupil-pupil relationships in our schools. Similar necessity for planning other school relationships could also be shown.Teacher's Training Colleges should particularly rise up to the challenge and should equip the teachers in training with sufficient theoretical and practical knowledge, to enable them to function as scientific planners of school relationships.

PSYCHOLOGY OF MANPOWER MANAGEMENT IN PROVERBS

—Ramesh Chandra Das

Manpower management is a vital subject that concerns scientists in almost every sphere of productive work. Mechanisation, with the advancement of technology, is gradually, and also quite rapidly in some cases, replacing human labour but, as Rao[4] observes, "In the last analysis, it is the human being who has to operate these instruments of production. Unless he is euipped with the necessary skills and is motivated to play his appropriate role in production and organises himself properly for the purpose with due regard to economic considerations, the developmental facilities that are created will not be utilised either economically or at their optimum capacity."

This brings in the question of management of manpower. It is truly said that "... while capital and technology are both essential for growth, an eually important element is the way the human factor is harnessed for the prupose." [4] Manpower management is the scientific and economical way of optimum use and handling of human resources and involves planning, organising, co-ordinating, directing, controlling and supervising the human forces in whatever activity project with an eye to increased production[7].

Though manpower management is relatively a new science it is interesting to note that its importance did not escape the notice of the people of olden times who expressed their considered views on this vital topic in the form of proverbs and sayings which have come down to us through generations. That these proverbs and sayings have stood the test of time and connote truths of perennial nature indicates that they had their foundation in acutal experience and observation of human behaviour by thousands of people through the ages. It has been rightly observed that a folk expression "appears to rise straight from a deeply rooted experience" and is "the product not of a single great individual talent but of successive generations."[2] In the present article we shall refer to some such proverbs and sayings on different aspects of manpower manangement selected from the collection made by Smith and Wilson."

(a) Individual Differences vs. Job Requirements - Selection, Training and Placement:

Varying congenital and environmental factors are responsible for individual differenes. Thus all are not capable of doing every kind of job and also the degree of capability of doing the same job differs from individual to individual.

Similarly, different jobs also have different requirements. Hence the need for selection to ensure optimum performance and maximum job-satisfaction. The manpower managers are, therefore, to see that "in filling up jobs the square peg is placed in the square hole and the round peg in the round hole"[4]. That individuals differ in respect of their capabilities and fitness for different jobs and different jobs have different requirements has been emphatically propounded in the following proverbs. Some of them also indicate that everyone has a limit to his capacity.

1. All things fit not all persons. 2. One cannot gather grapes of thorns or figs of thistles. 3. A great shoe fits not a little foot. 4. You cannot make a horn of a pig's tail. 5. A carrion kite will never be a good hawk. 6. One cannot make a falcon of a buzzard. 7. No like is the same. 8. So many men so many minds. 9. Every shoe fits not every foot. 10. Some are wise and some are otherwise. 11. Tastes differ. 12. Of a thorn springs not a fig. 13. Two of a trade seldom agree. 14. No living man all things can. 15. A man can do no more than he can.

Such proverbs suggest that managers should be very much particular in filling up vacancies and in so doing they must take into account the requirements of the job as well as the characteristics of the individual which have got to match to bring for the optimal production with maximal work satisfaction. The following proverbs indicate that hazards will follow if the selection is wrong. A wrongly placed person will not only himself not work and be dissatisfied but also vitiate the whole atmosphere and dampen the morale and spirit of his co-workers by his bad influence.

1. A round peg in a square hole. 2. One ill weed mars a whole pot of pottage. 3. Ill weeds grow apace.

Hence the need for careful selection of personnel. Scientific tools and methods should be employed for this purpose. But undoubtedly the best procedure is to test the individual by an actual trial, wherever it is possible. The following proverbs have this implication.

1. He that hires the horse must ride before

2. You never know what you can do till you try

3. Try before you trust.

However, mere selection of the right type of persons is nsot enough. As every job demands some specific skills and attitudes and as the latent possibilities of a person require adequate exercise for their fullest fruition some provision for training of the selected persons has got to be made. Besides,

adequate training courses for persons intending to enter related job areas should also be arranged for young persons so that they may later on, after completion of their training, successfully perform their duties when they will be actually employed in work. In fact, youth is the best time for training, for it is now when the individual is most receptive and vigorous. All this is advocated in the given proverbs.

1. The best needs breaking and the optest child needs teaching. 2. Learn young, learn fair.

The need for specialisation is being keenly felt with the advancement of science and technology. Hence this should be kept in mind in the matter of training and specialised courses should, accordingly, be offered to appropriate candidates. The need for specialisation has been hinted at in the following proverb :

Jack of all trades and master of none

It also necessary that after proper training and placement the individual training and placement the individual worker should be given ample scope for regular application of his knowledge and skill, for, otherwise, he is likely to degenerate and slip into inefficiency. This is the theme of the following proverbs.

1. Iron not used soon rusts. 2. Iron with use grows bright. 3. Use makes mastery 4. Use makes perfect.

Idleness or underwork, like wrong placement, is again bad for mental health. It fans up dissastisfaction and leads to indiscipline that vitiates the entire environment of the place of work. This is implied by the following proverb :

An idle brain is the Devil's workshop.

(b) Administrative Hierarchy and Division of Work :

For systematic and smooth work, it is necessary that responsibilities should be fixed up and a definite line of command chalked out. Rao[4] rightly holds that "Decision-making is the most crucial factor in successful management. There must be a line of command which, in turn, should be linked up with a definite authority that can take decisions… It is also important that responsibility is clearly located and accountability individualised." If everything is everybodies affair and each one is a master the entire business is sure to be spoil. And this has been nicely upheld in the following proverbs.

1. There is no accord, where every man would be a lord. 2. Where every man is master the world goes to wrack. 3. Everybody's business is nobody's business. 4. Where the grooms and housefolders are all alike great, very

disastrous will it be for all that dwell int hem. 5. Too many cooks spoil the broth.

(c) Managerial Approach to the Subordinate Staff :

Human relations are a significant factor which determines the quality and quantity of production in any undertaking whatsoever. Much of the efficiency of this factor depends on the approach of the managers to the subordinate employees.

The people of position should realise that their personal behavior counts much in shapping the attitude of their subordinates. Hence they should behave in the way they want their subordinates to. This caution has been sounded in the following proverbs.

1. Like cow, like calf. 2. Like father, like son. 3. Like king, like people. 4. Like lord, like chaptain. 5. Like master, like man. 6. Like breeds like. 7. A good husband makes a good wife. 8. A good wife makes a good husband. 9. When the head aches, all the body is the worse. 10. Lawmakers should not be law-breakers. 11. Practise what you preach. 12. He preaches well that lives well. 13. Example is better than precept.

Thus the manager should set examples by their own behaviour so that the subordinates may feel inspired and reciprocate. They should realise that everybody has a dignity and expects an honourable treatment. Rough behaviour begets anger and distrust, while love and sweet words stimulate obedience. This is exactly what the following proverbs strive to indicate.

1. Civility costs nothing. 2. God woads cost nought. 3. One never loses anything by politeness. 4. Love begets love. 5. Love makes one fit for any work. 6. He that respects notis not respected. 7. Give everyone his due. 8. Live and let live. 9. Honours change manners.

In judging the attitude and performance of the subordinates, it is highly desirable that the managers should show enough patience, and restrain themselves from taking an extreme view of the occasional lapses of their subordinates remembering that none is all good or all bad for all times. Sympathetic dealing with imperfections and warm appreciation of merits will help build up a healthy atmosphere for work. This is the import of the proverbs recorded below.

1. Anger and haste hinder good counsel. 2. Be still and have the will. 3. Bear and forbear. 4. Let bygones be bygones. 5. To err is human. 6. Every man has his fault. 7. Every man has his gift. 8. Every man is a fool sometimes and none at all times. 9. Forgive and forget. 10. No garden without its weeds.

The managers should not be adament and dogmatic and should have an openness of mind. They should accept a counsel if it is sound even though it comes from the subordinates. In dealing with cases of confrontation they should hear both the parties and then come to a decision accordingly. They should think twice before they give a verdict and must not do anything which will lead to developments that may go beyond their control. They should also not suffer from a false sense of prestige and, if necessary, should go one step forward if the aggrieved subordinates are hesitant and unwilling to approach them. This is the significance of the following proverbs.

1. If the cousel be good, no matter who gave it. 2. Hear all parties. 3. There are faults on both sides. 4. There are two sides to every question. 5. It takes two to make a quarrel. 6. First think, and then speak. 7. Second thoughts are best. 8. Kindle not a fire that you cannot extinguish. 9. If the mountain will not come to Mahomet, Mahomet must go to he mountain.

Managers should not take note of petty matters and small faults, for if they do so and thus interfere with the subordinates almost at every step they are sure to create difficulties which could very well be avoided and loss respect and become unpopular. This caution has been sounded in the following proverb :

Masters should be sometimes blind, and sometimes deaf.

But it is at the same time important that such of the small faults as have great disciplinary implications and pose a potential danger must not go unnoticed. They should be sharply, and of course tactfully, dealt with without delay. This seems to be the contention of the following proverb.

He that corrects not small faults will not control great ones.

Managers should remember the plain fact that management cannot function without cooperation of the subordinates. In fact, an enterprise is a joint venture of both the managers and the managed. In this sense none is insignificant however small his role and status may be. The following proverbs emphasise the need of cooperation.

1. The great and the little have need of one another. 2. If great men would have care of little ones, both would last long. 4. Great weights hang on small wires. 4. Many hands make light work.

(d) Work Schedule, Rest and Supervision :

Work should follow a schedule. One should be required to do one thing at a time. Change of work is sometimes a godo form of rest and recreation

without being detrimental to production. Over-work not only affects output adversely but also tells upon the health and morale of the worker. The following proverbs bespeak of these principles of psychology.

1. One thing at a time. 2. Changing of works is lighting of hearts. 3. In a long journey straw a weighs. 4. The last straw breaks the camel's back. 5. A hired horse tired never. (The last one is obviously a sarcastic comment.)

Supervision is an important duty of the management. So they should keep their eyes open and be observant. They should be out on rounds and also participate in the work at times. This will alert the workers and also encourage and inspire them. If the managers sometimes associate themselves with the workers in the work it will also give the latter an additional sense of self-importance. The following proverbs bear out this significance.

1. Command your men, and do it yourself. 2. One eye of the master sees more than ten of the servants. 3. The eye of the master will do more work than both his hands. 4. Every one is a master and a servant. 5. If you want a thing do it yourself.

(e) Motivation and Incentives :

One of the most important, and alos perhaps the most difficult, functions of the management is to motivate the workers. If the workers are not willing to work the output is sure to suffer. Willing workers, on the other hand, will produce even more than is expected of them. All this is advocated in the following proverbs.

1. If the lad go to the well against his will, either the can will break or the water will spill. 2. Nothing is impossible to a willing heart. 3. A man may lead a horse to the water, but he cannot make him drink.

Bread has been found, quite naturally, to be the best incentive for work. Hence if the management want more from their employees they must give them a better wage and wider amenities. Mere promises will not do. They have to do something concrete and substantial in this respect. This point has been forcefully presented in the proverbs that follow.

1. Actions speak louder than words. 2. Better fed than taught. 3. Bread is a binder. 4. Give and take. 5. A good dog deserves a good bone. 6. He that serves a good master shall have good wages. 7. That is good sport that fills the belly. 8. Great gain makes work easy. 9. Great pain and little gain will make a man soon weary. 10. All griefs with bread are less. 11. The hand that gives, gathes. 12. When meat is in anger is out. 13. Mills will not grind if you give them no water. 14. Pain is forgotton

where gain follows. 15. Service without reward is punishment 16. Labour is high where love deth pay. 18. Corn him wall, he'll work the better.

The last proverb, viz. '*Corn him well, he'll work the better*' perhaps also reflects the landless and poor agricultural labours' greater interest in food grain than in money as wages and also their interest in a substantial share in the crop they raise in their employers' land. This point has been elaborately discussed by the present writer[1] in his book 'Agricultural Psychology'. The *proverb 'To feed like a farmer'* also seems to have this implication.

Like good wages, freedom in work also promotes the sense of responsibility, encourages originality, and brings about identification with the management. For some, freedom and appreciation count more than money. This is the theme of the proverb.

Liberty is more worth than gold

Interest is another factor which not only motivates a man in his work but alos helps him a lot in adjusting himself with the work environment. A disinterested workers does not pull on well with his colleagues and vitiates the total atmosphere. Thus everything should be done to create interest in the workers for the work assigned to them. This implication of interest has been highlighted in the proverb :

Who likes not his business, his business likes not him.

Management is itself a skill as held by Smith[5] who defines it as "the application of skill in the control of things or persons". Thus there is need for selecting the right type of persons to be entrusted with managerial responsibilities. Potential managers should be picked up when they are sufficiently young so that they may be prepared for the job through intensive training in the science of management with due regard to both its theoretical and practical aspects. This point has been nicely put forward by Gellerman[3] who holds that "It may take years, even decades, to equip a man with the depth and breadth of comprehension that top management requires. But it is also to a company's advantage to have its executives arrive in positions of command while they are still young enough to handle their jobs with vigour and some prospects of longevity… Hence the need for some kind of early identification' device, through which young men whose potential (if any) for senior managerial responsibilities is just emerging can somehow be singled out from their peers."

That good managers must have sufficient experience of doing the work they are now required to supervise is implied by the following proverb :

One must be a servant before one can be a master.

Proverbs such as those mentioned above have thus a tremendous bearing on the vital issue of manpower management that concerns human labour geered to production of some kind or the other.

References

1. Das, R. C. - Agricultural Psychology, Scientific Book Agency, 22, Raja Woodmunt Street, Calcutta, 1975.
2. Encyclopaedia of the Social Sciences, Vol. V. The Macmillan Company, New York, 1953.
3. Gellerman, S. W. - Behavioral Science in Management, Penguin Books 1975.
4. Rao, V. K. R. V. - Education and Human Resource Development, Allied Publishers, Bombay, New Delhi, Calcutta, Madras, London, New York, 1966.
5. Smith, M. - An Introduction to Industrial Psychology, Cassell and Compsn Ltd., London, 1952.
6. Smith, W. G. & Wilson. F. P. - The Oxford Dictionary of English Proverbs, Oxford, The Clarendon Press, 1970.
7. Webster's Third New International Dictionary, G. Bell & Sons Ltd., London, 1961.

SELF-LOVE

—Dr. Jnanandra Chandra Das Gupta

Besides the wish to be loved, and the wish to love, we come across another form of interest which is commonly called self-love. In self-love the subject 'loves' himself instead of any object outside himself. One may object to our use of the term 'love' to express all kinds of interest. It may not sound very convincing to deduce the existence of self-love as we deduce the existence of love. We can say that the mother feeds the child because she loves him. But can we similarly say, we eat because we love ourselves? The need to eat is so self-evident that is appears superfluous to account for it by a further hypothesis of self-love. The truth is that interest in the self is so very ingrained and deep-seated that we usually act to serve our self-interest without any conscious recognition that we are so doing. Because the act appears immediate and instinctive we tend to overlook the fact that there must be some psychological basis for such action. We do not feel that there is any harm in using the term self-interest and self-love interechangeably, if we carefully describe the types of likings and wishes that should come under the term 'self-love'.

Self-love, Love-Giving and Wish to be loved distinguished with reference to emphasis placed of subject on object in subject-object relationship.

We may try to understand the nature of the wish to love, wish to be loved and self-love particularly in terms of subject-object relationship, and the psychological emphasis laid on the subject and the object in each of them. In love–both in the wish to love and the wish to love and the wish to be loved–there is subject–object relationship. The subject in both the forms of love relates to the object which lies outside himself. In self-love there is no object outside the self. The self plays the part of both the subject and the object. If by object one means an object lying outside the self, in self-love there is no object-relationship. This may be true in the extreme form of self-love. In milder form, there is some sort of object-relationship, but of a very weak character. A person sometimes feels the need of others' praise and admiration to realise and enjoy his self-importance. The object who praises, admires and worships, is of not any particular importance to the subject. The value of the object lies in so far it glorifies the subject.

We know of a telented woman artist. She had marked artistic abilities and possessed what may be regarded as a masculine intellect. She was not good

looking but she was a charming conversationalist. She displayed no deep and steady feeling for any man. She, however, encouraged a good many men to gather around her and admire her. She apparently enjoyed admiration but was not ready to fall in love. She was not therefore attached to any particular man. She appreciated their presence to hear from them that she was a great artist, and was annoyed if any of them was long absent. She herself said about her own mentality "I do not love anyone, I love myself".

Let us consider the nature of love and self-love from the standpoint of emphasis placed on the subject or the object. It may be said that in the wish to love, the subject loses himself in the object. The entire emphasis is therefore laid on the object. This statement, however, requires a certain modification. In the act of love-giving there are two parts. The one is the affective awareness of the need of the object on the part of the subject, the other is the act of rendering help to the object. A part of the mind becomes really projected and identified with the object while another part remains with the self which at the right moment renders active assistance to the object of love. Or to be more accurate, the mind alternates between the object and the subject. It assumes the role, for example, of the helpless child requiring assistance and again the role of the parent rendering active assistance, in a very quick succession to each other.

Through identification a subject becomes aware of the need of the object and coming back to him, he offers the type of assistance needed. It should be been that such psychological return of the self is not to the unrelated self or to the self in self-love, but it is a return to the self deeply related to the object. The subject remains all through full of the object, its specific need and the type of assistance it requires. In this way, the stress remains throughout on the object.

In the wish to love, the subject in his intense moments of identification with the object, forgets himself. The subject hardly feels the existence of the subject apart from the object. But in reality, both the self and the object lying outside the self are present in the wish to love, though the object enjoys almost exclusive importance in the eyes of the subject.

In self-love, in its extreme form, there is no object outside the self and the exclusive emphasis is laid on the self. In milder forms of self-love, where there is some sort of object-relationship, the object is important only to exalt the value of the subject. The psychological emphasis in such a case is mostly on the self. In the wish to be loved the attention is distributed between the self and the object. If the subject wishes to be loved by the object, both the subject and the object are important in the eyes of the subject. In some cases of the wish to be loved, the love-object assumes special importance. The emphasis is placed there more on the object than on the self, giving probably the wish a more tender character.

A young lover regards his love-object as something unique and irreplaceable. He wants the love of the love-object and for the time being, no one else's. A young man focussed his entire attention on a woman whose love he sought. The woman, however, did not reciprocate his love. The youngman felt entirely unhappy and miserable. When he was told, why he should not love some one else–more qualified and better suited to him - he replied that it was impossible. He could not think of any other woman as his love-object. If she did not love and marry him, he would rather remain unmarried for the rest of his life. In other words, he wants to be loved by that particular woman and by no others. That is why Bernard Shaw called love (of the type we are referring to) as the process of exaggerating the value of one woman against others.

In some cases of the wish to be loved, the self appears more important than the object. The attention of subject is turned more towards gratification of the need for love than to the person who gratifies such need. Such people are soemtimes called 'Lovers of love' instead of lovers of a person. The wish to be loved in such cases almost borders on self-love and sometimes it becomes difficult to distinguish between the two. There is again a group of men, who in our language, are called 'love-beggars'. They look for the mother in almost every woman and try to assume the role of a child in relation to each of them. They like, in fact, to enjoy their role of children but they do not usually attach any exclusive importance to a particular love-object. In a number of instances, exceptions have been found and some persons have clung to 'one woman's as the mother-substitute. Children themselves, however, hold a very curious position. In their eyes, the mother very often enjoys a unique kind of importance. No one can really fill her place in his life. Yet in the wish to be loved, the child emphasises himself and he, quite often, treats the mother as a means for his convenience. In other words, he considers the mother more important than others but less important than himself.

Self-love may be better designated as self-stressed feelings and attitudes

The essential thing in self-love is the emphasis that is laid on the self in one's wishes and activity. We are thus tempted to designate what is commonly called self-love as self-stressed feelings and attitudes of a person. Whenever a person does anything with self or self-interest in his mind, proximate or remote, he displays there his self-stressed feelings and attitudes. It may be best expressed with the help of a sanskrit word (Ahamkara). The polarity of self-love is the wish to love which may be described as tender object-mindedness or tender object-minded feelings and attitudes. The wish to be loved comes in between the two for in it the emphasis is distributed between the self and the love-object in varying proportions.

Subtraits of self-love

1. Seeking for physical pleasures (x)

The self-interest of men is first expressed in their cravings for pleasures, notable amongst which are the pleasures of eating, the pleasures of bodily comfort and the pleasure of sex. The craving for pleasure is selfish in nature. In the seeking of pleasure, there is, in varying degrees, the consciousness of the self. In moments of intense pleasure, self-consciousness becomes minimal, though never absent. The craving for pleasure, at least for pleasures of a certain quality, has been classed as an auto erotic phenomenon in Psycho-analysis. The baby indulges in auto-erotic pleasures i.e. pleasures of sucking, defecation, etc. very early in life when it does not know itself as the subject as distinguished from the world as the object. There have been evidences both from the field of clinical psychology and child pshychology, to demonstrate the presence of such a stage in the child's life. Such auto-erotic pleasures are pursued with a degree of self-consciousness when the baby has grown into a child and finally into an adult. Introspection will unmistakably reveal that in adults there is a degree of awareness and stress on 'I' and 'mine' almost in all their enjoyments and pleasures, which were auto-erotic in nature. In other words, auto-erotic pleasures take a narcissistic colour in adults. This psychological truth justifies our inclusion of questions on the seeking of pleasures in the battery of inventory of self-love.

It is not difficult to see that the craving for physical comfort or eating is selfish in nature. Sex sometimes goes with love and the selfish character of the sex may not be always conspicuous. A sex act, it should be noted, usually satisfies both the male and the female. A woman in love may submit to a sex act to please her lover. In that case her sex activity is more an act of love than of self-love. When, however, a person considers his or her partner as a means of sextual gratification, it is his or her own pleasure that he or she is thinking of.

Narcissism

Nest we shall mention what may be called and classified as narcissism.

Narcissim, named after the legendary hero, Narcissus who loved his own beautiful body, may be regarded as a form of self-love. Freud equated the entire self-love to Narcissism. We have understood Narcissism in a much more limited sense than that of Freud. We have kept closely to the account of Ovid and the story of Narcissus in our use and understanding of the concept of Narcissism.

It may be enquired what psycho-analysis has meant by marcissism. The concept of narcissism, it should be remembered, has undergone a number of changes in psycho-analysis. The essential thing in narcissism, to use the words of Freud that he wrote in 1922 is "the sexual instinct which, instead of external

objects, has taken the subject's own ego as the object." Originally the ego, in the eyes of child, is mostly his bodily-ego which, with age, begins to represent both his mind and body. In his earlier writings narcissism stands for the libidinal components of the self-preservative instincts'. Gradually Freud came to the conclusion that "the instincts of self-preservation are also of libidinal nature".

It does not seem to us necessary that narcissism should be given an entirely sexual meaning, though there are significant aspects of narcissism which are pronouncedly sexual in character. We should, however, remember that Freud did not conceive sexuality in its usual narrow sense.

Subtraits of self-love

II. Bodily Narcissism (Y)

We have considered narcissism under two heads - narcissism in the bodily sense and narcissism in the mental sense. Narcissism in the bodily sense, is displayed in love for one's body expressed through the care taken of the body. A person who loves himself in the bodily sense will like to dress well and neatly and will enjoy looking at himself often in the mirror. The interest in physical culture, in looking beautiful is usually prompted by the desire to attract attention. It may be that by drawing attention one wants love of the object which will partially satisfy one's wish to be loved. A young woman seeks the love of a particular person by trying to look attractive and beautiful in his eyes. In such a case the particular person assumes a good deal of importance in her eyes, and the narcissistic interest in the physical appearance becomes subordinated to her wish to be loved. Nonetheless, we should not overlook the marked narcissistic wish in her behaviour.

The attention of the object may further be sought in the form of praise, admiration and even worship. In such cases the self is, in the eyes of the subject, much more important than the object. In an extreme form of narcissism the subject altogether withdraws his interest from the world and shows an extreme form of self-absorption. He does not care for others' love and attention, he does not value others' praise and admiration, he does not even want to be worshipped. He is interested only in himself. Narcissus spent his days looking at his own image in the water of a lake showing supreme indifference to women and also to men. Narcissus in absorbtion with himself did ot even pay any heed to the love of Echo, a beautiful young woman. A woman who dresses only for herself shows such a narcissistic attitude. Narcissism in this extreme form is somewhat pathological. In all mental diseases the object-relation is disturbed and the graver forms of mental diseases viz., Schizophrenia, Paranoia and Melancholia are markedly narcissistic in character.*

* Sigmund Freud - Collection Works, Vol. V, P. 124

Subtraits of self-love

III. Mental Narcissims (Z)

In mental narcissims, of which we have already spoken, one values one's mind and its varied achievements. Careful reflection will show that the mental narcissism stands largely for ambition of the modern men. Ambitious men seek praise, honour and fame. They choose their respective fields to acquire distinction, but the underlying motive remains in all cases almost the same. Some of them want to be great in power, some in knowledge and others in wealth. The important motive that underlies all such wishes and efforts is the need to further one's own self-importance, and in most cases also to enjoy a sense of mastery and power.

Ambition and self-assertion

It is necessary here to draw a distinction between self-assertion to experience a sense of mastery and power, and ambition to feel one's own importance. It should be mentioned at the outset that self-assertion and ambition quite often go together.

Through self-assertion one sometimes likes to feel both power and importances and ambitious persons sometimes seek power over and above their feeling of self-importance. The distinction really holds good between the feeling of self-importance and the sense of mastery and power.

Self-assertion comes often very close to self.* It is, therefore, necessary

---

* This has not escaped the penetrating eyes of Freud. He has gone further in almost identifying the one with the other. He has mentioned three libidinal Types (Collected Works Vol. V, P. 249) of which the narcissistic type is one. "The main interest" of this type, he writes, "is focussed on self-preservation, the type is independent and not easily overawed. The ego has a considerable amount of aggression available, one manifestation of this being a proneness to activity... People of this type impress others as being 'personalities' they readily assume the role of a leader..." In short, such people, to use our language, are assertive i.e. they have both the power and the inclination to lead. Freud regards them as narcissistic because of their power and interest in the self-assertion and activities. True, quite often it has been observed that the persons who are very self-assertive are also very narcissistic in nature. Their action and activities are undertaken to enhance their narcissistic value and importance.

The gentleman is a reputed lawyer, aged about 50. He is keenly intelligent and a fairly educated man. He is a vigorous-personality, and he is domineering, active, aggressive and restless in nature. In his talk he displayed that he valued his own opinion most and he thought very highly of his own judgment, and he further showed considerable contempt for judgment of most of the other lawyers. He gave an impression that he was somewhat paranoid in nature. In this case there is a close clear relationship between the self-assertion and the narcissism of the gentleman.

to consider self-assertion at some length, and then to make a distinction between this and self-love. McDougall considers self-assertion as an instinct. In the account of Murry self-assertion has been expressed as a two-fold need of dominance and acheivement. The need of dominance may perhaps be distinguished from the need of achievement in the following manner. In dominance one wishes to exert one's mastery over other human beings; in achievement one wants to exericse his mastery in the realm of things and ideas.

The child begins his life with his active and dynamic urge for such things - as nourishment, loving care and attention. As he grows a little older, he does not remain satisfied merely by getting them; he seeks conquests and achievements. It begins with his effort to sit, stand and walk, to bathe himself and to feed himself. With the successful execution of each act, he feels a sense of power and achievement and is satisfied with himself because he could do it. When the child is praised, in addition to his sense of power, he will feel proud i.e. a sense of importance. It may be said that through most acts of self-assertion, man experiences both a sense of power and a sense of importance.

A baby of six months was vigorously kicking. Her auntie clapped her hands and said to cheer up the baby "It is so fine, it is so good". The face of the baby immediately brightened, and she kicked more vigorously till she was tired. The baby originally undertook the kicking, shall we say, for the pleasure of exercising the muscles and enjoying a sense of power. As soon as she was appreciated, the baby showed unmistakable signs of pride and displayed greater energy in her action. The 'self' of the baby became noticeable in her activities.

The craving of a man for fame and ambition is prompted mainly by his desire to appear great in the eyes of others and thereby to gratify his need for self-importance. It may also be, in some cases, that the notice, is a person to whom his self is very important. If his ambition has an obvious social purpose, his self.may not appear so conspicuous. Such ambitions are sometimes called aspirations. Society may be a good deal indebted to such persons for their idealistic service.But their idealism is a kind of narcissism, worship of their superego and ego-ideal, if not their ego. Super-ego and ego ideal have been formed out of ego and the life of a person dominated by his ego-ideal stresses the self and its point of view. Such a life is often very rigid in character and fails to take adequate account of the need of others and their point of view. It is not, however, meant that the feeling and activity of an ambitious person are entirely dominated by the consideration of his ego and super-ego, and there is no place for love in his life. As far as ambition is concerned, an ambitious person often shows marked self-centredness but this need not be a bar to his being a loving father and a fond husband. Excessive ambition, however, stresses self too

much at the cost of other tender emotions. The craving for fame and ambition has, therefore, been called mental narcissism by us.

Subtraits of Self-love

IV. Ego-centrricity (K)

Besides the seeking of pleasure and narcissism both in a bodily and in a mental sense, self-love in some minds expresses itself as ego-contricity which represents an attitude of mind.

The centre of the universe in the case of a child is his self. The truth of ego-centricity of children has been gathered from the numerous observations of children's behaviour, especially in their play and conversations by a number of investigators of child's mind and child's behaviour. Babies of six months do not often notice the presence of other babies. Children of 18 months mostly play alone. This stage is followed by what is known as "parallel games", each playing side by side without any attempt at co-operation with each other. This is true of children between 2 and 3 years of age. Children of this age sometimes assume the role of onlookers, i.e. they just watch others play. When they are four or five years of age, they sometimes play in small groups. Yet their attitude to their playmates may be likened to their attitude to their criket ball or bat. Piaget has found that nearly half of the spontaneous speech of a 6½ years old is an ego-centric language by which he means repetition, monologue and collective mono-logue, "All these have this in common that they consist of remarks that are not addressed to anyone, or to any one in particular, and they evoke no reaction adopted to them or the part of anyone to whom they may chance to be addressed". Piaget concludes, "It would seem that upto a certain age we may safely admit that children think and act more ego-centrically than adults... True, when they are together they seem to talk to one another a great deal more than we do about *what they are doing* (our italics) but for the most part *they are only talking to themselves* (our italics)".

The above evidence of children's ego-cenricity has been taken mostly from their play behaviour and conversation, the latter being mainly the expression of their intellectual life. But careful reflection will show that play and conversation are as much the expression of intellectual as of the affective life.

Jersild and Ritzman have shown on the basis of their observation of a sample of children between 2 and 2½ years of age that 77% of all the personal pronouns used in their speech were in the first person. Among children between 3½ and 4 years of age the use of the first person pronouns was reduced to 50%. We do not know if, or how much, this percentage will be reduced if we

observe the conversation of still older children. Some reduction of percentage in the use of the pronouns in the first person is likely because of a further reduction of the stress on the self and also because of the awareness of the requirement of the polite conversation on the part of a grown up boy or girl. A stage will, however, be reached beyond which there will be no further reduction. At all stages of life the self, in the eyes of the owner, enjoys a substantial degree of importance.

Children, however, display two characteristics in their "ego-centricity" which particularly mark them off from adults. With them the stress on the self is usually much greater. The other important characteristic of children is that they show little consideration of the needs and feelings of others. They suffer, as if, from some sort of psychic blindness, from an incapacity to enter into the feelings and emotions of another person. They show a blissful unconcern about others. To a child, he is the end, others have been born as if for him, for his pleasures and for his convenience.

It has been found that as a child grows in years, he sheds more and more his ego-centric attitude to life. He learns to see other's point of view and to treat other human beings not merely as means but also as ends in themselves. It has been, however, found that men do not all mature in the same way or to the same degree. Some, even in their adult years, continue to display self-love and ego-centricity in a large measure. They are like children, with one difference. A young child loves himself almost exclusively. Even in his wish to be loved he remains, in his eyes, more important than his mother. At this age we may almost say, his weakness prompts him to love himself and he is not strong enough to love others. As he grows up and attains psycho-physiological maturity, the urge to love dawns and blossoms in him and he is found to spontaneously love others. An adult displaying self-love, thanks to his psycho-physical growth, must, however, know something about love. Yet if he shows incapaicity to love, it is quite probably because of some active endopsychic resistance in him. He cannot, however, morally feel happy at the deficient growth of his capacity of love. He, therefore, tries to justify himself by showing a certain cynical distrust in the existence of love in this mortal world.

Summary

To summarise, the self-stressed feelings and attitudes which are commonly called self-love have been subgrouped under four heads, (1) Seeking of pleasure which has been expressed by the symbol 'X', (2) Bodily narcissism which has been called 'Y', (3) Mental narcissism,'Z', (4) and Ego-centricity 'K'.

Primary and Secondary Self-love

It has been frequently observed that a person, frustrated in love, displays a heightened self-feeling which is very often mixed in character. On the one hand, he feels compassion for himself, on the other, he disparages himself. In other words, his love frustration excites both his self-love and self-hatred.

The self-love born out of frustration has been sometimes called secondary narcissism. According to Freud, love is preceeded by a stage of primary narcissism out of which probably all love grows.

In his own language, "The ego itself came to be regarded as a reservoir of what was described as narcissistic libido from which the libidinal cathexer of objects flowed out and into which they could be once more withdrawn".

There is no doubt that self-love is ingrained in men. When we love others, the feeling of self-concern functionally weakens and the psychological emphasis on the self is considerably shifted to the object. But it is adults who are usually capable of object-minded love in an appreciable degree. During childhood the main emphasis is almost always on the self which shows itself either in the form of self-love or the wish to be loved.

Value of Self-love in life

We may naturally like to understand the value of self-love in the life of a man. In a general way it may be said that it is because of self-love, a man lives and prospers. The matter will appear clearer if we imagine a person who has no self-love and tries to consider how he will behave in a number of vital situations. Such a man, if he exists at all, will not care to take necessary nourishment, he will not take proper care of his body, he will not work to earn his living, he will not even try to save himself when he is ill or when he is confronted with danger or an accident. He will, in short, display supreme indifference to his physical and mental well-being. We may, of course, enquire when we come across some such indifference in a number of pathological cases - whether such indifference is produced by the lack of self-love or by the presence of self-hatred and self-destructive tendencies. It has been found that in many such cases self-love has been neutralised and rendered ineffective by the presence of a powerful self-hatred expresed often as a deep sense of guilt.

A woman-student of a College, aged about 24, frustrated in love, displayed a very great indifference to her physical and mental well-being. She ate little, very occasionally bathed, did not sutdy at all. The failure in love caused in the woman a deep narcissistic wound. She was not good looking and she was despised by her mother on that account. The failure of love further confirmed

that she was an unloveable wicked thing. She ended her life by finally committing suicide.

While in actual cases the motives may be so, it is theoretically possible to imagine a person who just at a particular point of time ceases to love himself. If that happens, such a person cannto continue to live since he will find no longer and psychological energy to "struggle for his existence". The possession of some amount of self-love is a sign of mental health. It provides necessary psychic energy to live and to live well. But while a moderate amount of self-love is good and healthy, excessive self-love is likely to render a person asocial, if not positively antisocial, in character. It is doubtful whether a very selfish person does justice to himself. We are not thinking of the reactions of othe rpeople who may be dissuaded by the selfishness of a person to extend their sympathy and support to him. A person who loves only himself, does not know how to love others, does not enjoy others loving him, will hardly find in life its deep emotional value and significance. A very selfish person lives virtually in the prison of his self. Amongst a crowd of men he lives a lonely and isolated life. Mental health connotes a certain amount of selfishness. It is no wonder that the grave forms of mental diseases are all narcissistic disorders.

Let us now try to understand the value and implication of what has been said above by referring to what we have called X, Y, Z and K.

The possession of moderate amount of X, Y and Z i.e. craving for pleasure bodily narcissism and ambition is healthy. Let us first take the craving in men for pleasure and comfort. We naturally expect of a man enjoying a good mental health that he should like and enjoy eating, want some amount of physical comfort, and care for sex-pleasure. But excessive greed for food, too great a fondness for bodily comfort, or nymphomania will be regarded as morbid. There is something wrong with a person who suffers from such excesses. It has sometimes been found that anxiety, a chronic fear that one may not get things of pleasure at all, doubt in one's capacity for enjoyment greatly enhance the need and the value of the object.

During the famine of 1942 in India rice was scarce and it sometimes altogether disappeared from the market. Those people who could still afford to buy were found to consume much more rice than what was usual for them innormal times. A gentleman expressed the situation in the following words- "I am eating as much as I can because I do not know what will happen to-morrow". Logically the piece of reasoning is faulty but as we judge the motive of over-eating we find that the fear that one may not get it at all sleems to increase the hunger for the food and consequently the value of the object. The enhancement of the value of the object in the eyes of the people can also be seen from

another fact. Those people who could afford were ready to pay almost any price for rice. Judging objectively we may say that they had to because there was no other way to procure rice for their consumption. But a very curious thing was that most of them felt great satisfaction when they wre able to procure rice at a very high price. Rice, because of its scarcity, became not only costly but also psychologically precious. With the increase of the need, the value of the object that satisfics the need is also enhanced.

It may be said that excessive greed for anything is not good, since firstly, too much concentration on an object or a group of objects shuts the mind from the varieties of joys and pleasures of life and secondly, it assumes too selfish and asocial a character.

Let us now consider bodily narcissism. A healthy bodily narcissism is expressed when a person sufficiently takes care of his body, of his health and appearance, enjoys looking smart and well-clad, likes occasionally to look at himself in the mirror or at his own photos. In other words, a mentally healthy person accepts himself in the bodily sense of the term and acts accordingly. This love for one's body will, however, assume morbid proportions when a person is solely or excessively pre-occupied with his body. When, for example, a woman changes hee saree every hour, and spends most of her time looking at herself in the mirror, likes her to be photographed too often and in too many poses, everything is not going well with her. The attention she pays to her appearance and the excessive care she takes of her body and her dress is sometimes compulsive in nature.She cannot help attending but the attention is not of pure delight. It is often attended with a considerable amount of anxiety. Besides, as we have pionted out earlier, such a person misses many joys in life and varieties of feelings and emotions. She, in fact, lives in a windowless, apparently golden, cage of all-absorbing self-love. Such a woman, failing to establish a satisfactory human relationship, falls only upon herself.

Now about ambition. Society considers a moderate degree of ambition in man as normal. A parent bitterly complained that his son was lazy and had no ambition in him. His attitude towards ambition will be shared by most of the parents. Most fathers want their boys to be ambitious. When ambition is, however, too high for one's abilities, the more reflective section of the population will probably consider such ambition as excessive and morbid. But what should we think of ambition which yokes a person to a single-minded devotion to a cause viz., amassing wealth, all-absorbing pursuit of science or art, accepting the work of political reforms as one's mission in life etc.? A person, wedded to such a vocation, will have almost nothing else in life. Such life eminently serves a social purpose but it is not possible to escape the question - 'Does such a person do

sufficient justice to himself?' Darwin in his boyhood loved to read poems. As he grew old, he found no time to read poems; he remained busy with his work of research and discovery. At an old age he once again opened a book of poems but was unable to find any delight in the reading of poems. He was sad for the loss of his capacity for enjoying poems and it may be said that his power had been atrophied through disuse. Do not such things happen in the lives of most of the too ambitious persons? Most of them have no time for love, for their children, music and poetry, clouds, the rising and setting sun or a moonlit night. Society gets many things from them but they take rather little from society. They are in so much hurry, so much absorbed in the single-minded pursuit of their mission or vocation. This is, indeed, a very basic question but we do not know any satisfactory answer to the question. But we see most men to-day value personal ambition more than contentment, social progress more than human happiness. May be, there is some morbidity in such an attitude, but the feeling is too wide spread to be called unnatural.

It may be relevant for us to point out one thing here. Like craving for pleasure and bodily narcissism, ambition is not probably a primary need of man. Sometimes ambition, particularly when it is excessive, arises out of frustration of the wish to be loved. In the wish to be loved the subject attaches importance to himself and to the love-object. When, however, he fails to get love, two psychological consequences follow. He shifts the almost entire emphasis to himself. He makes up his mind to acquire fame which, when acquired, will enable him to enjoy a feeling of self-importance. He silently says, as if, in so many words, "I see, I have not been loved; all right, I must so distinguish myself that I shall at least be respected". It was perhaps Byron who put the psychological process in a nutshell. He said that the first impulse of man is to be loved, failing that, he wants to be famous. The anger evoked by the frustration of the wish to be loved is satisfied when the love-object is made to worship the subject and thus losing her importance looks small. But such substitute gratification of the wish to be loved through fame hardly satisfies the longing of a person who, in his innermost mind, craves for love. Byron at the height of his fame threw away the life of a poet declaring that man had not been born only to scribble. Poet Tagore at the height of his glory and fame wrote, "It was my long expectation that the deepest hunger of the soul will find its final and supreme satisfaction-not in wealth, nor in fame but only in some amount of love. Indeed that was what I longed for." Love alone can satisfy the hunger of love. It is true that once a man is ambitious, the unsatisfied ambition always keeps his mind in a considerable tension. But ambition, even when it is gratified, never fully satisfies the mind and it often reveals to a thinking person the emptiness and insignificance of all ambitions and their gratification.

About K, the ego-centricity of the mind. An ego-centric mind considers self as the darling, values self more than others and self-love more than love for others. It shows somewhat cynical distrust in love and love services. It believes that in the time of danger, a person will care only for himself, or a mother loves her child because the child is a part of her body. While the possession of X, Y and Z in a moderate amount has been recognised as a sign of health, it is difficult to judge in the same way of men's ego-centricity. Its regressive character is too marked to escape one's notice. It may, however, be possible that K in a small amount will be shared by most men, but let us wait for our experimental findings to tell us if we can say so. No doubt the self is to some extent important to all of us, to some more, to some less and a person who sees and says that cannot certainly be regarded as morbid.

In X, Y, Z there is some objective reference, however, weak; but in K there is hardly any object - the sole stress is on the self. It is quite possible that the extent of K, when large, will reveal the morbid self-love of a person and his proneness to neurotic difficulties and probably also to unhappiness.

গান্ধীজীর শিক্ষানীতি ঃ প্রেক্ষিত একুশ শতকের ভারত

—সূর্যাংশু ভট্টাচার্য

যখন সুযোগ ছিল তখন গান্ধীজীর শিক্ষানীতি ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় স্থান পায়নি। এমনতো নয় যে গান্ধীজী হঠাৎ করে তাঁর শিক্ষাচিন্তা ভারতবাসীর সামনে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি দীর্ঘসময় নিয়েছেন নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। জাকির হোসেন কে নিয়ে কমিটি গড়েছেন। আর্যনায়কম দম্পতির মতো মানুষদের শান্তিনিকেতন থেকে নিয়ে গেছেন। একটা নতুন শিক্ষানীতি এভাবেই গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে বহু ব্যক্তিত্ব জড়িয়ে আছেন। বিজন ভট্টাচার্য সাধনা ভট্টাচার্য সেই শিক্ষা নীতিকে ফলিত রূপ দিতে চেয়েছেন। মানভূমে মাঝেহিরা গ্রামে চিত্তভূষণ দাশগুপ্তের নেতৃত্বে গান্ধীজীর নয়া শিক্ষানীতিকে কেন্দ্র করে সংগঠন গড়ে উঠেছে ১৯৪০ সালে। নানা মতের মঞ্চ কংগ্রেস সেই ১৯৩৮ সালেই সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে স্থির করেছে যে ভারতবাসীকে শিক্ষায় সচেতন ও স্বয়ম্ভর করতে গান্ধীজীর শিক্ষানীতিকেই প্রয়োগ করতে হবে। অথচ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে যে শিক্ষাব্যবস্থা আসমুদ্র হিমাচলে প্রযুক্ত হল তাতে ধীরে ধীরে গান্ধীজীর নয়া শিক্ষা পদ্ধতি অপসৃত, বরণ করে নেওয়া হল ভারী শিল্পনীতির সঙ্গে পাশ্চাত্যর শিক্ষানীতিকেই। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে কিছুটা গান্ধীজীর ভাবাদর্শের বুনিয়াদী শিক্ষা, বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ প্রচলিত ছিল। তার পরে সরকারী প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে নিভিছে 'দেউটি'। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বাণীপুরে বুনিয়াদী শিক্ষা নিয়ে চর্চা চলছিল। এ ধরনের অনেক কেন্দ্রেই বুনিয়াদী শিক্ষার বদলে সাধারণ প্রচলিত শিক্ষা চালু হল।

যারা বুনিয়াদী শিক্ষার পক্ষে ছিলেন তারা সরকারী বিরূপতায় ম্লান হলেন। বুনিয়াদী শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার তেমন কোন চেষ্টা আলোড়ন তোলেনি, যাঁরা গান্ধীবাদী তাঁরা গান্ধীতত্ব নিয়ে গবেষণা করেছেন, গান্ধীজীকে তাঁদের জীবিকার ভিত্তি করেছেন কিন্তু কদাচ গান্ধীজীর শিক্ষানীতিকে বাস্তবায়িত করতে হাত লাগাননি। ব্যতিক্রম অবশ্যই মাজিহিবার মতো কিছু আশা-বিন্দু । স্মরণ করি ডেনমার্কের মনীষী গ্রুণ্ডভিগ (১৭৮৩-১৮৭২) কে যাঁর সমাজ চিন্তা গান্ধীজীর সমাজ চিন্তার সমধর্মী। বিষয়টি আলোচনার যোগ্য এবং তা নতুন পথে সামর্থ্য যোগাতে সক্ষম। গান্ধীজীর কাম্য ছিল এমন ভারত যে ভারতে প্রতিটি মানুষ স্বয়ম্ভর—প্রতিটি গ্রাম হবে স্বয়ম্ভর। গান্ধীজীর এই কামনা রাষ্ট্র যন্ত্রের তথাকথিত উন্নয়নের তাগিদে হারিয়ে যেতে বসেছে। ফলে ভারতে আজ সম-ধর্মী সমাজের বদলে ভোগধর্মী সমাগ কায়েম হতে যাচ্ছে। বুনিয়াদী শিক্ষার কথা বাদ দিলেও যে পশ্চিম বিশ্বায়ণের সমর্থক শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতে চালু হয়েছে তার এক প্রান্তে বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে প্রাথমিক-মাধ্যমিক শিক্ষা অন্যপ্রান্তে বাৎসরিক পাঁচ লক্ষ টাকার বিনিময়ে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে পুণের কাছে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস নেতা শারদ পাওয়ারের নামাঙ্কিত বিদ্যালয়। এই দুই ধরণের বিদ্যালয় থেকে যে ছাত্র-ছাত্রী বেরিয়ে সমাজের দায়িত্ব নেবে তাদের কি কোনো মিলনবিন্দু আছে? বিদ্যালয় শিক্ষাই ভারতকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করে দেবে। অথচ কথা ছিল ভারতে থাকবে বহুধরণের নয় এক ধরণের Common School System। এই বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থাই Common school system ভারতে প্রচলিত হতে পারতো। তা হলে ধন বৈষম্য আর ভারতে ভেদ তৈরী করতে পারতো না। গান্ধীজীর কল্পনাতো ছিল ধন বৈষম্যহীন সমাজ। আমরা সবাই রাজা'—একথা ভারতের মানুষের ভাবার আর আজ সুযোগ আছে নাকি? 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্র জীবন' এই ভাবমন্ত্র তো কেবল গান্ধীজীর শিক্ষানীতি ভিত্তিক Common school system ই দিতে পারে, অন্য কোনো শিক্ষানীতি সে ভাবধারা ভারতে প্রবাহিত করতে অক্ষম।

ভারতের প্রয়োজনির অনন্যতা গান্ধীজী অনুধাবণ করেছিলেন। নানা জাতি নানা ভাষিক নানা ধর্মের নানা সংস্কৃতির মানুষকে ভারতে একত্রিত রাখতে হলে চাই জাতিয় সংহতির চেতনা, ধর্মনিরপেক্ষতার মানসিকতা, চাই অস্পৃশ্যতা বর্জন, চাই পরমত সহিষ্ণুতা, চাই অহিংসাকে জীবনে প্রয়োগ। অন্য কোন দেশের জন্য শিক্ষার এমন ধরণের লক্ষ্য নির্দ্ধারণ প্রয়োজন নয়। গান্ধীজী তাই তাঁরা শিক্ষানীতির কয়েকটি মূল সূত্র রচনা করেছিলেন—

(ক) প্রীতি (সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব)

(খ) মুক্তি (অপরের উপর, জীবনধারণের জন্য, নির্ভরতাহীন, স্বাবলম্বন)

(গ) অভিব্যক্তি (নানা সৃজনশীল কর্মের মধ্য দিয়ে নিজেকে বিকশিত করা)

(ঘ) অহিংসা (রিপুকে প্রেম প্রীতি ভালোবাসার পথে নিমজ্জিত করা)

(ঙ) সত্যাগ্রহ (সত্যের প্রতি আগ্রহ, অসত্যের অন্যায়ের প্রতিরোধ)

(চ) সাফাই (পরিবেশ চেতনা, সৌন্দর্যের চর্চা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা)

শিক্ষার যে সব তত্ত্ব আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তার মধ্যে জন ডিউই, কিলপ্যাট্রিক রুশো, পেষ্টালৎসী, জন ফ্রেডারিক হার্বার্ট, ফ্রেজারিক ফ্রয়েবেল, মারিয়া মণ্টেসরি, হেলেন পার্ক হার্ষ্ট প্রধান। তাঁরা যে সব মূল্যবান তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন তার মূল কথা মানব শিশুর বিকাশের নানা প্রত্যয়। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে গান্ধীজী যে শিক্ষানীতির চর্চা করেছেন তা হলো পূর্বসূরীদের তত্ত্বকে অঙ্গীকৃত করে ভারতের প্রয়োজন সাধিত হবে এমন এক বাস্তব তত্ত্ব। সুতরাং অন্য তত্বকে অস্বীকার করার কথাই গান্ধীজী উচ্চারণ করেননি। তিনি কেবল ভারতের প্রয়োজন যে শিক্ষা তার দিকে লক্ষ্য রেখেই বুনিয়াদী শিক্ষার তত্ত্ব তৈরী করেছেন। একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে ভারতবাসী যদি অহিংসা না হয় তবে এত বিভিন্নতার মধ্যে এক জাতি হিসেবে বাস করতে পারবে না। এই অহিংসা পাশ্চাত্য শিক্ষা ধারায় কোথাও নেই। আছে বুনিয়াদী শিক্ষাধারায় পাশচাত্যের সমাজে অহিংসা হওয়ার তেমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই, যেমন আছে ভারতের মতো 'বিবিধের মাঝে মিলন মহান' সমাজে। উপরন্তু গরীব দেশের জন্য গরীব মানুষেরা যোগাতে পারে এমন কম খরচের শিক্ষার কথা গান্ধীজী ভেবেছিলেন। এমন শিক্ষা যা বেকার তৈরী করবে না। এই বুনিয়াদী শিক্ষাইতো ভারতের উপযোগী। এবারে দেখা যেতে পারে আধুনিক শিক্ষা ধারার সঙ্গে গান্ধীজীর শিক্ষানীতিকে মিলিয়ে দেওয়া যায় কিনা। আমারতো মনে হয় চেষ্টা করলে গবেষণা বহাল রাখলে এই দুই ধারার মধ্যে মৌলিক কোন পরিবর্তন না করে 'মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে'। বিশ্বায়নের যুগে পৃথিবী যেমন আমাদের দ্বারে উপস্থিত হয়েছে তেমনতো পৃথিবীর উপস্থিতি গত শতকের বিশের ত্রিশের দশকে দেখা যায়নি। সুতরাং সেই বিশ্বায়ণের নিরিখে আজকে বুনিয়াদী শিক্ষার রূপান্তর করতে হবে বৈকী। সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে না পারলে কিছুই টিকে থাকে না। সুতরাং পরিবর্তীত পরিস্থিতিতে বুনিয়াদী শিক্ষার মূল ধাঁচা মূল লক্ষ্য ঠিক রেখে বুনিয়াদী শিক্ষার এখানে সেখানে সংযোজন এবং পরিমার্জন করতেই হবে। এ কাজটা তখনই সম্ভব যখন বুনিয়াদী শিক্ষা এক প্রখর গবেষণার বিষয় হিসেবে সরকারী পর্যায়ে গৃহীত হবে। যেমন বৃটিশ কাউন্সিলের সবর্দা গবেষণার বিষয় কিভাবে নানা ধরণের অ-ইংরেজদের ইংরেজি ভাষা শেখানো যায় তেমনি বুনিয়াদী শিক্ষা নিয়ে নিরন্তর গবেষণা করে যেতে হবে। শোনা যায় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় ২০০ রকমের বিভিন্ন উচ্চারণের ইংরেজি ভাষা আছে। এ বিষয়ে ইংরেজরা খুবই উদার। বুনিয়াদী শিক্ষাকে অপরিবর্তনীয় অপরিমার্জনীয় মনে করার মতো কূপমণ্ডুকতাকে প্রশয় দেওয়া আর নিজের পায়ে কুড়ুল মারা একই কথার নামান্তর। আমাদের উদার হতে হবে।

বুনিয়াদী শিক্ষা নিয়ে যেমন অজ্ঞতা রয়েছে তেমনি রয়েছে মৌলবাদী মনোভাব শিক্ষাতত্ত্ব হিসেবে যেহেতু বড়ো করে গড়া হয়নি বুনিয়াদী শিক্ষাকে। তাই বুনিয়াদী শিক্ষণ নিয়ে মূঢ়তার ছড়াছড়ি। আমি একজন বিশিষ্ট শিক্ষককে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি কি জানেন জানতে চেয়েছিলাম। ৮৫ বৎসর বয়স্ক এই শ্রদ্ধেয় শিক্ষক গান্ধীজীর দর্শনে বিশ্বাসী। সেবাগ্রামে ৮ দিন কাটিয়েছেন গান্ধীজীর সান্নিধ্যে। অথচ তিনি প্রযুক্ত অবস্থায় বুনিয়াদী শিক্ষাকে দেখেননি। এমন দুর্ভাগ্যের যোগফল হচ্ছে বুনিয়াদী শিক্ষার হতাশাজনক পরিণাম। আমাদের এই অবস্থা থেকে ফিরে তাকাতে হবে। বুনিয়াদী শিক্ষার নবায়ন করে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। চাই নব-আবিষ্কার।

প্রাসঙ্গিকভাবে, এইবারে, বুনিয়াদী শিক্ষা নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যেতে পারে। দেখা যেতে পারে বুনিয়াদী শিক্ষার কাঠামো ও উদ্দেশ্য ঠিক রেখে বুনিয়াদী শিক্ষাকে আধুনিক শিক্ষার মূলস্রোতে আনা যায় কিনা।

বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্যক্রম কর্মকেন্দ্রিক। এ বিষয়ে পাশ্চাত্যের শিক্ষাতাত্ত্বিকদের সঙ্গে গান্ধীজীর শিক্ষাতত্ত্বের বিরোধ নেই। কেন্দ্রস্থ কর্মের মধ্য দিয়ে শিশুর শিক্ষা সম্পন্ন হবে। এই কর্ম কখনো কখনো কোন শিল্পের রূপ নেবে। তাই বুনিয়াদী শিক্ষা শিল্পকেন্দ্রিক—ক্র্যাক্ট সেণ্টার্ড। পাঠ্যক্রমের কেন্দ্রে থাকতে পারে বয়ন বা কৃষি। থাকতে পারে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ অথবা তথ্যযন্ত্র। থাকতে পারে অত্যাধুনিক কোন শিল্প যা সংশ্লিষ্ট বসতিতে সহজ এবং সুলভ। পাঠ্যক্রম সেই শিল্পকে কেন্দ্র করে শিশু শিক্ষায় নানা বিষয়কে আনবে—সেই বিষয় গুলোর সঙ্গে সম্যক পরিচয় অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে। ধরা যাক চরকা কেন্দ্রিক বয়ন শিল্পের কথা। এই বয়ন থেকে অনেক বিষয় আসবে, যেমন—

বয়ন শিল্প → জমি/মাটি → বৃক্ষ রোপণ/বৃক্ষের বৃদ্ধির পর্যায় → ফল → তুলো → আহরণ পদ্ধতি → সংরক্ষণ পদ্ধতি → নানা প্রকারের তুলো → তুলো থেকে সুতো—সুতো কাটার যন্ত্র → কুটির শিল্প/বড় শিল্প→ সুতো রঙ করা → নানা ধরণের তাঁত → কাপড় তৈরী → নক্সা → রক্ষণ → বিক্রয়। কুঁড়ি থেকে যেমন ফুলের পাপাড়ি প্রকাশিত হয়। তেমনি বয়নকে কেন্দ্র করে নানা বিষয়ের উন্মেষ হতে পারে। জন ডিউইতো বহু পূর্বেই বলেছেন যে প্রকৃত শিক্ষা কর্মসম্পাদন ছাড়া আসে না। মন্টেসরি ও শিশুর সক্রিয়তার উপর জোর দিয়েছেন। বুনিয়াদী শিক্ষা সক্রিয়তা ভিত্তিক (Activity Centred)। এই পদ্ধতির বিশেষত্ব হচ্ছে নানা বিষয়ের অনুবন্ধ (Correlation)। তবে একাধিক শিল্প/কর্ম/ বিষয়কে যদি কেন্দ্র করা যায়—যা পরিকল্পনা করে নেওয়াই যেতে পারে—তবে পরিবর্তনশীলতা ও নতুনত্ব পাঠ্যক্রমে আনা সম্ভব। এভাবে পাঠ্যক্রম বাস্তব ও আধুনিক হয়ে সক্রিয়তার ব্যপ্তি ঘটাতে পারে। ফলে শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশে সুযোগ বাড়বে। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে বুনিয়াদী শিক্ষাকে প্রাসঙ্গিক ও শিক্ষার মূলস্রোতে আনার জন্যে নানা পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। ভাবা যেতে পারে—

(ক) পাঠ্যক্রমে প্রয়োজনে, শিশুর বয়স অনুযায়ী, একাধিক শিল্পকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। শিক্ষার অঙ্গনে শিশুকে সৃজনশীল করার যথেষ্ট সুযোগ দিতে হবে। শিশুরা নানা ধরনের কাজ করার ফল হবে—(i) শিশুর ইন্দ্রিয় গুলোর সমক্য চর্চা (ii) নানা কৌশল আয়ত্তকরণ (iii) ব্যবহারিক কর্ম দক্ষতা অর্জন (iv) শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে প্রত্যয় (v) শ্রেণীর অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব/সম্প্রীতির সম্পর্ক (vi) শৃঙ্খলাবোধের সঞ্চার (vii) মূল্যবোধ আয়ত্ব করা।

(খ) খেলাধুলার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে। খেলাধুলা হবে উদ্দেশ্যমুখী, সুপরিকল্পিত ও গঠনমূলক। লক্ষ্য হবে স্বাস্থ্যের উন্নতি, শৃঙ্খলা জ্ঞান ও ব্যক্তিসত্তার বিকাশ।

(গ) নৃত্যগীত, অভিনয়, বিতর্কসভা, পত্রিকা, সাহিত্যসভা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ এই ধরণের কৃত্যালীর মধ্য দিয়ে শিশুর নান্দনিক সম্ভাবনাগুলোর বিকাশ। এই ধরণের কর্মের মাধ্যমে শিশুর আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ আসে। নেতৃত্বে গড়ে উঠে। ব্যক্তিত্ব তৈরী হয়।

(ঘ) নির্মাণ ও সৃজনকে পাঠ্যক্রমের অঙ্গ করতে হবে। শিশুর সৃজন প্রবৃত্তি ও অহং-সত্তা এর ফলে সুগঠিত হবে। শিশু কল্পনাপ্রবণ হবে। কল্পনার সঙ্গে কাজ যুক্ত হয়ে আনন্দ সৃষ্টি করবে।

(ঙ) বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানকে বিদ্যালয় কৃত্যালির মধ্যে আনতে হবে। এই সব কৃত্যালির মাধ্যমে শিশু শিখবে সহযোগিতা, আত্মত্যাগ, পরমতসহিষ্ণুতা, দলবদ্ধতা, সৌভ্রাতৃত্ব, নানা ধর্মের মিলনের প্রাসঙ্গিকতার কথা।

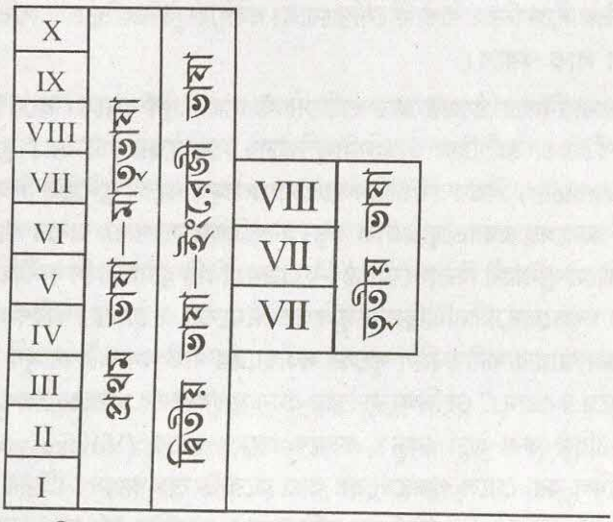
(চ) প্রকৃতির সঙ্গে নিয়ত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। ভ্রমণ, চড়ুই-ভাতি, গ্রাম পরিক্রমা প্রভৃতির বহুমুখী অভিজ্ঞতা শিশুরা লাভ করবে।

তাছাড়া নানা বিষয়ে প্রজেক্ট ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহে পূর্ণ করবে। প্রজেক্ট হচ্ছে লক্ষ্য ভিত্তিক কাজ সে কাজ সক্রিয়তা শারীরিক ও মানসিক বাড়ায়। নেতৃত্বের চর্চা হয়। স্কুলের কাজের প্রজেক্ট (School Government) শিশুর গণতান্ত্রিক চেতনাকে সমৃদ্ধ করে। বুনিয়াদী শিক্ষার কার্যকারিতা নিয়ে কথা হচ্ছিল। পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার সম্পাদক জনাব আবদুর রাউফ সাহেবের সঙ্গে। তিনি এককালে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পাঠ নিয়েছেন। তিনি বুনিয়াদী শিক্ষানীতির সমর্থক। স্মৃতিচারণ করে রাউফ সাহেব বললেন, "আমি ছিলাম স্কুল গভার্ণমেণ্টের স্বাস্থ্যমন্ত্রী। কারণ আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে স্কুলে যেতাম। আমার দায়িত্ব ছিল স্কুলের সব ছাত্রের দাঁত নখ পরীক্ষা খুব করে দেখা। এ কাজটি আমি আনন্দের সঙ্গে করতাম।" যে শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন সার্থক ভাবে ছাত্রদের অংশ গ্রহণের সুযোগ—সেই শিক্ষাব্যবস্থাকে খারিজ করা হবে কেন? এভাবে গ্রামের কাজে (Village government) ছাত্রদের সার্থকভাবেই সামিল করা গেলে পঞ্চায়েতের কাজ করে উৎসাহ আসে। এইসব শিক্ষণীয় বিষয়গুলোর মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, আত্মনির্ভরতা অধিনায়কত্ব, সংহতির চর্চা হয়। ছাত্ররা সেই সঙ্গে জানতে পারে সমাজজীবনের বৈশিষ্ট্যগুলো।

বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গ যে প্রজেক্ট তাকেও গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে। কেবল বৌদ্ধিক বিকাশ নয় প্রজেক্ট করতে গিয়ে শারীরিক বিকাশ ও সহজ লভ্য বুনিয়াদী শিক্ষায় শরীর ও মনের বিকাশ তুল্যমূল্য। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বৌদ্ধিক বিকাশের উপর জোর সমধিক বলে শিক্ষা অনেকটাই একপেশে। বুনিয়াদী শিক্ষায় কোন একপেশে বিকাশের প্রশ্রয় নেই। এবারে আলোচনা করা যেতে পারে প্রজেক্টের বৈচিত্র্য কেমন হতে পারে। প্রজেক্ট রচনায় নিম্নলিখিত সূত্রগুলো স্মরণ রাখা যেতে পারে—(ক) মূর্ত্ত থেকে অমূর্ত (খ) সহজ থেকে জটিল (গ) জ্ঞাত থেকে অজ্ঞাত (ঘ) নির্দিষ্ট থেকে অনির্দিষ্ট (ঙ) বিশেষ থেকে সামান্য (চ) সমগ্র থেকে অংশ। এরকম আরো সূত্র/উপসুত্র তৈরী করা যেতে পারে। এবারে আলোচনা করা যেতে পারে প্রজেক্ট কাজ কিভাবে এগুবে, কি কি ধাপ পেরোতে হবে সেই ধাপগুলো হলো—(i) উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণ (ii) পরিকল্পনা গঠন (iii) সম্পাদনার নানা কাজ (iv) বিচারকরণ—অর্থাৎ লক্ষ্য অনুযায়ী কাজ ঠিক পথে ঠিক ভাবে এগুচ্ছে কি না (v) উপসংহার। নানা ধরণের প্রজেক্ট বিভিন্ন শ্রেণীতে দেওয়া যেতে পারে। যেমন—(ক) সৃজনমূলক (খ) রসানুভূতিমূলক (গ) সমস্যামূলক (ঘ) অনুশীলনমূলক।

বুনিয়াদী শিক্ষা ধারাকে কিভাবে সময়ানুগ করে সচল করা যায় সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আরম্ভ করার দায় আমাদের সকলেরই। বুনিয়াদী শিক্ষাকে বলা হয় গান্ধীজীর 'সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ

দান'। এই সম্পদকে রক্ষা করা, তাকে প্রসারিত করার দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে। আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে শিক্ষাতত্বে পেষ্টালৎসী বা ডিউই-র যে অবদান সেই অবদানের উত্তরসূরী মহাত্মা গান্ধী। তাঁদের সূত্র ধরেই নিরক্ষর হতদরিদ্র ভারতবাসীকে শিক্ষিত ও আধুনিক করার লক্ষ্য নিয়েই গান্ধীজী স্বল্প খরচে শিক্ষার-সার্বজনীন শিক্ষার ঢালাও ব্যবস্থা করেছিলেন। পরাধীন ভারতের সীমাহীন দারিদ্র্যের প্রেক্ষাপটে বুনিয়াদী শিক্ষাকে চালু করেছিলেন গান্ধীজী। এই বিচারে গান্ধীজী ছিলেন ভারতের কাছে একজন 'মিশায়া'—দেবদূত বিশেষ। এখন সময় অনেক এগিয়ে গিয়েছে। আমরা একুশ শতক পরিক্রমা শুরু করেছি। ভুবনায়ন শুরু হয়ে গেছে। দুটি বিষয়ে আমাদের বুনিয়াদী শিক্ষানীতির সংস্কার করতে হবে বলে মনে হয়। প্রথমত বুনিয়াদি শিক্ষার ভাষানীতি পরিবর্তন করে ত্রি-ভাষা নীতি গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষা অবশ্যই মাতৃভাষার মাধ্যমে হবে।



ত্রি-ভাষা সূত্র (কোঠারী কমিশন থেকে কিঞ্চিৎ পৃথক)

বিশ্বায়নের যুগে ইংরাজীভাষা শিক্ষাকে পরিহার করার কোন উপায় নেই। এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যে ছাত্র যদি মধ্য পথে ড্রপ্-আউট করে তবু দুটো ইংরেজি কথার মাধ্যমে পৃথিবীর নানা প্রান্তে রুজি রোজগার করে খেতে পারবে। তৃতীয় ভাষা হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষা। যে অঞ্চলে বাস সে অঞ্চলের ভাষা ছাত্রদের জানতেই হবে। তবে পাঠ্যক্রমের ভার যাতে বোঝা হয়ে না দাঁড়ায় সে জন্যেই কেবল তিন বছর তৃতীয় ভাষা শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। ভাষা শিক্ষার বোঝা যেন অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের শিক্ষার অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায় তা আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে, কারণ আমাদের লক্ষ্য স্বাবলম্বী মানুষ, বেকার মানুষ নয়। আমাদের লক্ষ্য স্বয়ম্ভর গ্রাম বা শহর। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এখন করব না।

এ কথা সত্য যে বুনিয়াদী শিক্ষার অভিনবত্ব হচ্ছে তার কর্মভিত্তিক শিক্ষা। মাত্র একটি শিল্প (craft) বা একটি ভাবনাকে (Project) কেন্দ্র করে আজকের আধুনিক শিক্ষা চলতে পারে না। সুতরাং একাধিক কেন্দ্র তৈরী করে অনুবদ্ধ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। বলা বাহুল্য এই বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষকের কল্পনা, আগ্রহ এবং যোগ্যতা বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষকের কল্পনা, আগ্রহ এবং যোগ্যতা বুনিয়াদী শিক্ষার অন্যতম প্রধান মূলধন। শহরাঞ্চলে শিক্ষার কেন্দ্রে যদি কোন যন্ত্রশিল্প থাকে তবে শিক্ষককে সেই যন্ত্রশিল্পে পারদর্শী হতে হবে। নইলে সে শহরাঞ্চলের বুনিয়াদী বিদ্যালয় অচল অনর্থক হয়ে যাবে।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে হাতে কলমে কাজ হবে, উৎপাদন হবে। তবু একথা মনে রাখতে হবে যে বুনিয়াদী বিদ্যালয়টি একটি শিক্ষা কেন্দ্র—কারখানা না। উৎপন্ন দ্রব্য থেকে বিদ্যালয়ের খরচে কিয়দংশ আসতে পারে, কিন্তু শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের মাইনের দায় সমাজকে সরকারকে নিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ভারতের কিশোর কিশোরীদের শিক্ষা দেওয়ার দায় সরকারের।

শেষে একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। সরকার যদি বুনিয়াদী শিক্ষা চালু করতে না চায় তবে আমরা কি করব? সেখানে আমাদের বক্তব্য হবে CBSE, ICSE, Delhi Board, আন্তর্জাতিক নানা পর্যদ যদি নানা পাঠ্যক্রম চালু করতে পারে, পরীক্ষা নিতে পারে এবং শংশাপত্র দিতে পারে এবং সরকার সেই শংসাপত্র গ্রাহ্য করতে পারে, তবে সর্বভারতীয় স্তরে Indian Board on Basic Education গঠিত হোক। বুনিয়াদী শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞ ও কৃতী শিক্ষাবিদদের নিয়ে পাঠ্যক্রমে তৈরী হোক। পাঠদান পদ্ধতি মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়গুলো সেই Board স্থির করে চালু করতে পারবে। এই ভাবে বুনিয়াদী শিক্ষাকে নিয়ে নতুন যাত্রাপথের সূচনায় গান্ধীবাদীরা আগ্রহী। আপাততঃ বুনিয়াদী শিক্ষার একটা সমান্তরাল ধারা চলুক না সরকার যদি বুনিয়াদী শিক্ষাকে শিক্ষার মূল স্রোত করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়।

একবিংশ শতাব্দীতে ভারতে শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু ভাবনা ও দুর্ভাবনা

—জ্যোতির্ভূষণ দত্ত

বিংশ শতাব্দীর শেষের প্রায় দুই দশক বিশ্বায়ন এবং অর্থনৈতিক উদারীকরণের নামে বিভিন্ন রাষ্ট্রে চলেছে নানা ধরনের নীতি নির্ধারণ এবং কাঠামোগত পরিবর্তনের চেষ্টা; তীব্রতরভাবে এখনও তা চলছে। মুখ্যত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে প্রযুক্তিবিদ্যায় সমৃদ্ধ শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, বিশ্বব্যাঙ্ক এবং বিশ্ববাণিজ্যসংস্থা প্রভৃতি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি এই বিশ্বায়ন প্রচেষ্টার প্রচার ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেকাংশেই শিল্পোন্নত দেশগুলির সাথে সহায়কের ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বর্তমানকালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভূতপূর্ব অগ্রগতির ফসল পৃথিবীর সর্বত্র অবাধে চলাচলের মাধ্যমে সব রাষ্ট্রের উন্নতির হার এবং সমতা সুনিশ্চিত করাই নাকি এই বিশ্বায়ন এবং উদারীকরণ কর্মসূচির লক্ষ্য।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থাৎ অর্থনৈতিক আদানপ্রদান এবং সেইসঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের প্রক্রিয়া তো অনেক দিন থেকেই চলছে। ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের পর সেই প্রক্রিয়া অনেক ব্যাপক হয়েছে। কিন্তু নয়া বিশ্বায়নের সাথে এই প্রক্রিয়ার পার্থক্য আসমান জমিন। অন্যদিকে আন্তর্জাতিকতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ অথবা বিশ্বচেতনা প্রভৃতি ধারণাগুলির সাথে আমাদের পরিচয় অনেকদিনের এবং মানবসভ্যতার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এগুলির গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু এই ধারণা এবং নয়া বিশ্বায়নের ধারণা সমার্থক নয়। আন্তর্জাতিকতা ভাবনাটির মধ্যে আদর্শবাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি পৃথিবীর শান্তি, মৈত্রী এবং উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং মানবসভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রেরণা যুগিয়েছে, নয়া বিশ্বায়নের উদ্যোগের পেছনে উক্ত আদর্শবাদ বা মূল্যবোধ কাজ করে না। প্রকৃতপক্ষে ধনী শিল্পোন্নত দেশগুলির পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার অনিবার্য সংকটমোচন ও প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এবং অতি মুনাফালাভের স্বার্থে নয়া এই বিশ্বায়ন দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের নতুন এক প্রকৌশল।

এই নয়া বিশ্বায়নের প্রধান রূপকার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। এই নয়া বিশ্বায়নের অমানবিক চক্রান্ত এবং সাম্প্রতিক কার্যকলাপ স্মরণ করলে স্বাভাবিকভাবে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়। একদিকে নয়া বিশ্বায়নের নামে সাম্রাজ্যবাদ এবং আর একদিকে ঐতিহ্য রক্ষার অছিলায় মৌলবাদ বর্তমান বিশ্বের সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে এবং তাদের জীবনযাত্রার ওপর আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। সন্ত্রাসকে দুপক্ষই অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করছে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমেরিকার আগ্রাসন আসলে সাম্রাজ্যবাদী অভিযান ছাড়া আর কিছু নয়। নয়া বিশ্বায়নে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানকেই সার্বজনীন এবং সর্বশক্তিমান বলে ধরা হচ্ছে, সেই প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে বাজার এবং বিশেষ করে মূলধনের বাজার। অনেকে মনে করেন যে বিশ্বায়নের প্রবক্তারা মুক্ত বাজারকে সব জায়গায় ছড়িয়ে দিতে চান। সেই দিক থেকে বিচার করলে নয়া বিশ্বায়নের মতাদর্শকে বাজার বা বাজারকেন্দ্রিক মৌলবাদ বলা চলে। কিন্তু আসলে এই মৌলবাদ মুক্ত বাজার চায় না। সে চায় যে জ্ঞানের বাজার, গবেষণার বাজার—মুষ্টিমেয় বহির্জাতিক কোম্পানির কুক্ষিগত থাকবে। আন্তর্জাতিক

বাণিজ্য সংস্থার (যা গ্যাট চুক্তি থেকে উদ্ভূত) মেধাসত্ত্ব-এর ধারণাগুলির মর্মার্থ এটাই। নয়া বিশ্বায়ন চায় মূলধনী মহাজন (দেশী একচেটিয়া এবং শিল্পোন্নত দেশগুলির বহুজাতিক সংস্থাগুলি) বিশাল থাবা মেলে একের পর এক গরিব দেশের সম্পদ গ্রাস করবে। বনানী, ভেষজ, সংস্কৃতি এবং শিক্ষার উপর আধিপত্য বিস্তার করবে। অন্যদিকে অনুন্নত উন্নয়নশীল দেশের জনসমষ্টি উন্নত দেশগুলিতে গিয়ে যাতে অভিবাসী (immigrant) না হতে পারে তার জন্য অভিগমন (immigration) সংক্রান্ত আইনকানুন কঠোরতর করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এই বাজারকেন্দ্রিকতা একমুখী বিশ্বায়নের বাজারকেন্দ্রিক মৌলবাদীদের তথাকথিত মুক্ত বাজার, সত্যিকারের মুক্ত বাণিজ্যের কাছে প্রহসন মাত্র। বাজারি মৌলবাদ প্রায়শ আশ্রয় করে ধর্মীয় মৌলবাদকে। বাজারি মৌলবাদ যেমন বাজারকে বিকৃত করে শিল্পোন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়, ঠিক তেমন ভাবেই ধর্মীয় মৌলবাদও যে ধর্মকে আশ্রয় করে গজিয়ে ওঠে, সেই ধর্মকে বিকৃত করেই নিজেকে প্রসারিত করে।

পুঁজিবাদী দুনিয়া সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অর্থনীতি, দর্শন, সামাজিক মতাদর্শ, সামরিক ধ্যানধারণা এবং অস্ত্রশস্ত্র সবকিছুই বিশ্বের হাটে বিক্রি করতে বেরিয়ে পড়েছে। ক্রেতা অনিচ্ছুক হলে গালটিপে আদর করে অথবা গলাটিপে ভয় দেখিয়ে বিক্রয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। কারণ তাতেই নাকি পুঁজিবাদী বিশ্বের প্রাণভোমরা বাঁচবে, এবং পৃথিবীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়ন পৃথিবীর যে কোনো দেশে বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বে শুধু অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করছে তাই নয়, যে কোনও দেশের আঞ্চলিক সংস্কৃতির ও জাতীয় শিক্ষার পক্ষে তার পরিণতি হয়ে উঠেছে অত্যন্ত বিপজ্জনক। জাতীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষা, জাতীয় মূল্যবোধ এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি এর ফলে প্রবল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। ভোগবাদ ও পণ্যমোহের উৎকর্ষ বৃদ্ধি এই চ্যালেঞ্জের একটি অংশ মাত্র।

বিশ্বে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস, যার অপরিহার্য অঙ্গ শিক্ষার ইতিহাস, অনেক দীর্ঘ। সেই ইতিহাস প্রলম্বিত হতে হতে সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের অবয়ব গ্রহণ করেছে। কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে আমেরিকান থিম ও আমেরিকান আধিপত্য। সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন ভোগবাদ ও পণ্যমোহের বিস্তারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ চরিতার্থ করছে। এক্ষেত্রে শিক্ষাকেও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই শিক্ষার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ব্যক্তিবর্গকে, মননজগতের কারিগরদের, নয়া বিশ্বায়নের আগ্রাসী বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে জানতে হবে। কারণ এই আগ্রাসন নির্ধারণ করছে সমাজকাঠামো, সামাজিক চরিত্র, আরো নির্দিষ্ট করে বললে মানুষ ও মানবিক চরিত্রবৈশিষ্টগুলি এবং মানুষের সম্পর্কগুলি।

শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়া বিশ্বায়নের গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলগুলি নীচে সূত্রাকারে উল্লেখ করা যায় ঃ

(ক) 'পরিষেবা'-রূপী শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশি ও বিদেশি পুঁজি ট্রিলিয়ান ডলারের (আনুমানিক ৪৭ লক্ষ কোটি টাকা) একটি শিল্পক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছে এবং সেখানে অনুপ্রবেশের জন্য তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে আশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণ আছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যকরণ ও ব্যক্তিমালিকানাকরণ শুরু হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ নীতির মাধ্যমে ভারত সরকারও এই প্রক্রিয়ায় উৎসাহ যোগাচ্ছে।

গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রও এই প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। উচ্চশিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রবণতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটা ভাবাই স্বাভাবিক যে গ্রামাঞ্চলের ভূস্বামীগণ বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং শহরাঞ্চলের বড় পুঁজি উচ্চশিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে পুঁজি লগ্নির সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর থেকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হচ্ছে এবং জনমানসে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অবনমন ঘটছে।

(গ) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম-এর অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে এবং স্বাধীনোত্তর যুগের শিক্ষা কমিশন ও কমিটির সুপারিশে জাতীয় শিক্ষার যে ধারণা ও কর্মসুচিকে অগ্রাধিকার দিতে বলা হয়েছে, নয়া বিশ্বায়নের প্রভাবে জাতীয় শিক্ষার সেই ধারণাটাই দ্রুত গতিতে বিলুপ্তির পথে।

(ঘ) কল্যাণকর রাষ্ট্রের অপরিহার্য দায়িত্ব বিবেচনায় সরকার আর শিক্ষাকে জনগণের অত্যাবশ্যক পরিষেবা হিসাবে গুরুত্ব দিতে চাইছে না। ক্রয়যোগ্য পণ্য হিসেবে শিক্ষা গ্রহণের দায় পরিবারের উপর বর্তাচ্ছে।

(ঙ) শিক্ষা ক্রমশ মহার্ঘ পথ্য হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে, মানুষ গড়ার প্রক্রিয়া হিসাবে নয়।

(চ) পেশাদায়িত্ব (Professionalism) এর অছিলায় বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজবিমুখ, জাতীয় ঐতিহ্য বিরোধী, ভোগসর্বস্ব এবং অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন এক নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি করছে। একে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে সভ্যতার অমানবিকীকরণের প্রক্রিয়াগুলি বলবান হবে।

(ছ) 'গ্যাট' চুক্তি নির্ভর Patent Law বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গবেষণার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে এবং আগামী দিনে এই বাধা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করবে।

(জ) শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি দায়িত্ব হ্রাসের ফলে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য দ্রুত বৃদ্ধি পাবার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে।

(ঝ) শিক্ষার ক্ষেত্রে সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার ব্যাপারে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে।

(ঞ) বিদেশি ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির গুণগত মান সম্পর্কে অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি দেখা দিচ্ছে। কিন্তু অন্যদিকে সেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে এবং সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অবনমন ঘটছে।

(চ) মাতৃভাষা পঠনপাঠনের বিষয়টি অবহেলিত হচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে দৈন্য দেখা দিচ্ছে। কারণ মাতৃভাষাই তো আমাদের চিন্তনের প্রধান মাধ্যম। এর মাধ্যমেই আমাদের বোধ, অনুভূতি, চেতনা ও মানসিকতার বিকাশ ঘটে।

প্রসঙ্গত ভারতবর্ষে শিক্ষার পরিমাণগত বৃদ্ধি, গুণগতমানের উন্নয়ন এবং সমানাধিকারের বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন। স্বাধীনতালাভের ৬০ বছর পরেও আমাদের দেশে ৩৪% নিরক্ষর মানুষের বাস, যদিও পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১৬% মানুষ এখানে বসবাস করে। ১৯৪৭ সালে ভারতে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষের সংখ্যা ছিল জনসংখ্যার মাত্র ১%। বর্তমানেও এ বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত উন্নতি সম্ভব হয়নি। বর্তমানে গোটা দুনিয়ায় উচ্চ শিক্ষায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৩ কোটি ৭৮ লক্ষ। ভারতে আছে তার ৮.৬ শতাংশ মাত্র। শিক্ষার উন্নয়ন সূচকে বিশ্বের ১২৯টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১০৫ তম। সুতরাং শিক্ষার সর্বস্তরে পরিমাণগত বৃদ্ধির বিষয়টিকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। ২০০২ সালে ৮৬ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের সব শিশুর জন্য প্রারম্ভিক শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাংবিধানিক এই অধিকার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রস্তুত Right to Education Bill এর ভবিষ্যৎ এখনও মেঘাচ্ছন্ন।

ভারতবর্ষে নিরক্ষরতার সমস্যাটি অনুধাবন করার জন্য দুইটি তালিকা যুক্ত করা হল ঃ

তালিকা - ক (পৃঃ ১৯৩)।

তালিকা - খ (পৃঃ ১৯৪)।

বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরে কেন্দ্রিয় সরকারের বাজেটে শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দ হয়েছে ৩৮,৭০২.৮৭ কোটি টাকা। মোট ব্যয় বরাদ্দের মাত্র ৫.১৫%। বিদায়ী বছরের তুলনায় ৯,১১৪.১৬ কোটি টাকা বেশি। স্মরণ করা যায় যে কেন্দ্রিয় সরকারের মোট বরাদ্দের অন্তত ১০% শিক্ষাখাতে বরাদ্দের সুপারিশ বহুদিনের। সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে আজও পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

বলাই বাহুল্য, শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের প্রশ্নে পরিমাণগত বৃদ্ধির বিষয়টি যেমন গুরুত্বপূর্ণ গুণগত মানোন্নয়ন এবং সমানাধিকার-এর প্রশ্নটিও (equity) সমানভাবে গুরুত্বের দাবি রাখে। কিন্তু পরিমাণগত বৃদ্ধির পরিমাপ করা যত সহজ গুণগত মানোন্নয়ন এবং সমানাধিকারের মূল্যায়ন করা তত সহজ নয়। উক্ত বিষয় দুটির মূল্যায়নের প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল। বহুবিধ উপাদানের সাথে ঐ বিষয় দুটির উন্নয়ন নির্ভরশীল। শিক্ষার গুণগত মান প্রধানত নির্ভর করে শিক্ষার নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সেগুলি যথাযথ রূপায়ণের উপর। দেশে দেশে এবং যুগে যুগে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিন্ন হবে এটাই স্বাভাবিক। সাধারণভাবে শিক্ষাকে "মানুষ গড়ার প্রক্রিয়া" হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু মানুষের তো নানা ধরনের মডেল আছে। যেমন শারীরিক দিক থেকে বলবান কিন্তু মানসিক দিক থেকে দুর্বল মানুষ, সামাজিক দিক থেকে দায়বদ্ধ ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ, জ্ঞানী কিন্তু কর্মবিমুখ মানুষ ইত্যাদি। কী ধরনের মানুষ গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত করা হবে তা প্রতিফলিত হয় শিক্ষার নির্ধারিত লক্ষ্য, পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্যসূচির মধ্যে। শিক্ষা ব্যবস্থার সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী? পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচির মধ্যে কোন্ লক্ষ্যগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে ? —এসব বিষয়গুলির ভিত্তিতেই শিক্ষার গুণগত মান নির্ধারণের সূচক নির্ণয় করা সম্ভব হতে পারে।

শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ ত্রিবিধ পরিবেশের সাথে সার্থক অভিযোজনের জন্য সামর্থ্য, দক্ষতা, অভ্যাস, মানসিকতা, মূল্যবোধ এবং প্রয়োজনীয় আচরণবিধি অর্জন করে থাকে। এই পরিবেশগুলি হল—প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ এবং নিজস্ব মনোজগতের পরিবেশ। এই অভিযোজন সংক্রান্ত সামর্থ্যের নিরিখে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সাধারণভাবে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। এদের মধ্যে সমাজে প্রচলিত এবং সমাজের অগ্রগতির স্বার্থে প্রয়োজন বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজের জন্য শিক্ষার্থীকে প্রস্তুতিকরণের সাহায্যে একদিকে শিক্ষার্থী ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের দায়দায়িত্ব পালনে যোগ্য হয়ে ওঠে এবং তার কাঙ্ক্ষিত জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে এই প্রস্তুতির ফলে সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বুনিয়াদ দৃঢ় হয় এবং সমাজের উন্নয়নশীল গতিশীলতা সুনিশ্চিত করা সম্ভব হতে পারে।

কিন্তু শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর অর্থনৈতিক সামর্থ্য অর্জনের প্রচেষ্টার মধ্যে শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচি সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। পরিবারে এবং বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপক্ষে সার্থক অভিযোজনের জন্য ও দায়দায়িত্ব পালনের জন্য শিক্ষার্থী যাতে বিভিন্ন ধরনের সামর্থ্য, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জন করতে পারে এবং সামগ্রিকভাবে মানবিক পরম্পরা, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের সৃজনশীল ধারক ও বাহক হিসেবে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে—শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠ্যক্রম এবং কর্মকাণ্ড নির্ধারণে সেই বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষাকে মানুষ গড়ার প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করলে, শিক্ষার উপরিউক্ত দায়বদ্ধতাকে কোনভাবেই উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গেই বলা হয় Man becomes man only by education.

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো শিক্ষার্থীর জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সৃজনশীল আকাঙ্ক্ষা, সম্ভাবনা ও প্রতিভার বিকাশ সাধনের কর্মসূচি।

শিক্ষাক্রমে এই ধরনের কর্মসূচি ব্যক্তিকে সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে শুধু সাহায্য করে তাই নয়। এর ফলে সভ্যতার মানবিক উন্নয়ন সম্ভব হয় এবং ব্যক্তি সার্থকভাবে ও আনন্দদায়কভাবে সৃজনশীল মানবজীবন যাপনের যোগ্য হয়ে উঠতে পারে এবং সেইসঙ্গে সে তার সম্ভাবনা ও প্রতিভা স্ফূরণের সুযোগ পায়।

শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের প্রশ্নে পরিমানগত বৃদ্ধি ও গুণগত উন্নয়নের সাথে সাথে সমানাধিকার (Equity) এবং সামাজিক ন্যায় (Social justice) এই বিষয়গুলিও সমানভাবে গুরুত্বের দাবি রাখে। প্রত্যেক সরকারের কিছু সাংবিধানিক দায়িত্ব থাকে। রাষ্ট্রের সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা যেমন প্রয়োজন, সেই সঙ্গে সরকারকে সমতা ও সামাজিক ন্যায়ের বিষয়টিকেও অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। তাই আধুনিক কল্যাণমুখী রাষ্ট্রকে আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীকে কিছু বাড়তি সরকারি সুযোগ সুবিধা দিতে হয়। শুধু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং বিশেষভাবে শিক্ষাসংক্রান্ত সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে পৃথিবীর কল্যাণমুখী (Welfare) রাষ্ট্রগুলি অনেকদিন এই নীতি অনুসরণ করেছে। বিংশ শতাব্দীর ন'য়ের দশক পর্যন্ত অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে বিপর্যয়ের পূর্ব পর্যন্ত আমাদের মত গণতান্ত্রিক দেশে সরকার এ' ক্ষেত্রে চারটি মৌলিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে ঃ

(ক) শিক্ষার মৌলিক কাঠামোকে সংগঠিত করা;

(খ) শিক্ষায় বেসরকারি উদ্যোগের উপর রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব বজায় রাখা এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করা ;

(গ) সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশকে ভরতুকি দিয়ে অল্প খরচে অথবা বিনা খরচে শিক্ষা পরিষেবা প্রদান করা;

(ঘ) শিক্ষার মূল ক্ষেত্রগুলির উপর নেতৃত্ব বজায় রেখে দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজি এবং বেসরকারি সংস্থার ক্ষতিকর আধিপত্য থেকে শিক্ষাকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখা।

অর্থনীতি এবং শিক্ষাসহ বিভিন্ন পরিষেবার ক্ষেত্রে গত প্রায় দু'দশক এই নীতিগুলি দ্রুত বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে। মনে হচ্ছে, দেশের স্বনির্ভরতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার দায়িত্বও কালক্রমে বেসরকারি উদ্যোগের উপরেই নির্ভরশীল হয়ে পড়বে।

এই পরিস্থিতিতে সর্বজনীন শিক্ষা, জনমুখী শিক্ষা, শিক্ষার মাধ্যমে জাতিগঠন এবং মূল্যবোধের শিক্ষা ও মানবতাবাদী শিক্ষা প্রভৃতি বহুদিনের লালিত ধারণাগুলি কতদিন আর প্রাসঙ্গিক থাকতে পারবে এবং শিক্ষার গুণগত মানের সূচকই বা কী হবে? শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রক্রিয়া তাই এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের উদ্যোগ এবং বিনিয়োগ অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু বিগত প্রায় দুই দশক ভারত সরকার অর্থনৈতিক সংস্কারের নীতি, উদারীকরণ ও বেসরকারিকরণের নীতি গ্রহণ করে চলেছে এবং এই প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। কর্পোরেট সেক্টর শিক্ষাকে একটি বৃহৎ পরিষেবা শিল্প হিসেবে বিকাশ ঘটাতে তৎপর। এন.ডি.এ. সরকারের আমলে শিক্ষা ধারাবাহিকভাবে আক্রান্ত হয়েছে। নয়া উদার অর্থনীতি অনুসরণ করে ঐ সরকার যে শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছিল তাতে সমাজের দুর্বল অংশ শিক্ষার সুযোগ থেকে বেশি বেশি করে বঞ্চিত হয়েছে। অন্যদিকে ঐ সরকার যুক্তিনির্ভর, বৈজ্ঞানিক, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার দাবি উপেক্ষা করে 'বিশ্বাসনির্ভর শিক্ষা'র নামে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচিতে সাম্প্রদায়িকতার বিষ সঞ্চারিত করার চেষ্টা করেছে।

ঐ সময়ের আম্বানি-বিড়লা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট, পুন্নাইয়া কমিটির রিপোর্ট প্রভৃতি পর্যালোচনা

করলে স্পষ্টত অনুধাবন করা যায় যে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ এবং শিক্ষাকে বাণিজ্যিক স্বার্থে সংগঠিত করাই ছিল এন. ডি.এ. সরকারের প্রধান উদ্দেশ্যে।

ভারতে স্বাধীনতার পর ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন করে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা হয়েছিল। বিদ্যালয় শিক্ষায় ইংরেজির আধিপত্য কিছু হ্রাস করে মাতৃভাষাগুলির উপর বেশী মর্যাদা দেওয়া শুরু হয়েছিল। দেখা গেছে যে ১৯৪৮ থেকে গঠিত বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও কমিটিগুলি নেতৃত্ব দিয়েছেন ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ, ডঃ এল. এস. মুদালিয়র, ডঃ ডি. এস. কোঠারি প্রমুখ দেশের অগ্রগণ্য শিক্ষাবিদরা। কিন্তু এন.ডি.এ. সরকারের আমলে এই ধারাবাহিকতার যে পরিবর্তন করা হল তাতে শিক্ষার স্বার্থ কতখানি রক্ষা করার চেষ্টা ছিল? ইউ.পি.এ. সরকার বা সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা সরকারের আমলেও উদার অর্থনীতির নিয়মরক্ষার স্বার্থে কেন্দ্রিয় সরকার শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের জন্যই তৎপর রইল। শিক্ষা এবং অন্যান্য সব ক্ষেত্রে বিদেশি পুঁজির অবাধে প্রবেশের সুযোগ বাড়ছে। সেই সঙ্গে বৃদ্ধি করা হচ্ছে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব। কেন্দ্রিয় সরকার নিয়োজিত (২০০৫) 'জাতীয় জ্ঞান কমিশন' (National Knowledge Commission) এর তাই স্পষ্ট সুপারিশ, দেশব্যাপী প্রথম শ্রেণি থেকেই ইংরেজি ভাষা শেখানো হোক। জাতীয় শিক্ষা কমিশনের আরও সুপারিশ ঃ 'Language learning can not be separated from and must be integrated with, content learning. Therefore English should also be used to teach some non-language content subjects starting from class III in school." উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই জাতীয় জ্ঞান কমিশনের চেয়ারমান ডঃ শ্যাম পিত্রোদা। উনি শুধু টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব নন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং ইউরোপের বেশ কয়েকটি ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক-পরিচালক। এই কমিশনের সদস্য হিসেবে আছেন 'Industry and Liberlisation' পুস্তকের প্রণেতা শিল্প-বাণিজ্য জগতের জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি এবং অন্য একজন যিনি "One among the world's most respected business learders" হিসেবে সম্মানিত। বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় জ্ঞান কমিশনের ভাষা পঠনপাঠনসংক্রান্ত সুপারিশ কার্যকরী করা হলে দেশের শিক্ষিত অংশকে জীবনের শুরু থেকেই ইংরেজি ভাষার স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া সম্ভব হতে পারে। কিন্তু সামাজিক ও আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া যে বিরাট সংখ্যক ছেলেমেয়ে আমাদের দেশে আছে এই ব্যবস্থার ফলে তাদের পক্ষে বিদ্যালয় শিক্ষা সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হবে। শৈশবেই একটি বিদেশী, নিজের দৈনন্দিন জীবনের পরিবেশে অনুপস্থিত ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনের বিষয়টি অবশ্যই বিঘ্নিত হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে আমাদের দেশে 'বাড়ির-ভাষা' এবং 'স্কুলের ভাষা'র মধ্যে যে পার্থক্য সেটাই লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষালাভের পথে একটি বিরাট বাঁধা। ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যমে করলে তাদের অধিকাংশের পক্ষে লেখাপড়া শেখা অসম্ভব হয়ে যাবে না কি? শিক্ষার ক্ষেত্রে ঐসব শিক্ষার্থীর কাছে এটা এক ধরনের 'ভাষা সন্ত্রাস' হিসেবে গণ্য হবে। ইংরেজি প্রধান এই শিক্ষার ফলে নিজের ভাষা হারিয়ে যাবে, এই আশঙ্কা অমূলক নয়। নিজের ভাষার সাথে বিচ্ছেদ ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। এর ফলশ্রুতি হিসেবে সমাজ সম্পর্কে উপেক্ষা বা নিস্পৃহতা আসতে বাধ্য। এই প্রসঙ্গে N.C.E.R.T-এর একটি উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য.........."to deny or wipe out a child's mother tongue (s) is to interfere with the sense of self." স্মরণ করতে হয় যে ইংরেজ রাজত্বের ঔপনিবেশিক শিক্ষা আদৌ 'মানুষ গড়ার শিক্ষা' ছিল না।

ভারতীয় সংবিধানের ৮৬তম সংশোধনের মাধ্যমে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের সব শিশুর শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারের তালিকায় নিয়ে আসা হয়েছে। শিক্ষার এই অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে

স্বীকৃতি পেলেও একে বাস্তব রূপ দেবার জন্য প্রয়োজনীয় আইন কেন্দ্রিয় সরকার সংসদে পাশ না করে ২০০৬ সালের জুন মাসে রাজ্যে রাজ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হল Model Right to Education Bill, 2006, এর খসড়া। বলা হলো, যেসব রাজ্য আইন প্রণয়ন বা সংশোধনের ক্ষেত্রে এই Model Bill হুবহু গ্রহণ করবে তাদের ক্ষেত্রে সর্বশিক্ষা অভিযানের অর্থবরাদ্দ একাদশ পরিকল্পনাকালেও ৭৫ ঃ ২৫ ভিত্তিতে থাকবে। যেসব রাজ্য এটা করতে পারবে না তারা সর্বশিক্ষা অভিযান বাবদ টাকা ৫০ঃ৫০ ভিত্তিতে পেতে পারে। এইভাবে বর্তমান কেন্দ্রিয় সরকার অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার দায়িত্ব রাজ্যগুলির ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে এবং সেই সাথে শিক্ষার সমস্ত স্তরে বাণিজ্যিকীকরণের ও বেসরকারীকরণের পথ উন্মুক্ত করে দিচ্ছে।

National Knowledge Commission আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন সম্পর্কে ২০০৬, ২০০৭ এবং ২০০৮ সালে অনেকগুলি সুপারিশ করেছেন। এই সুপারিশগুলির মর্মার্থ অনুধাবন করার লক্ষ্যে ২০০৬ সালের প্রতিবেদনের প্রারম্ভিক কিছু বক্তব্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেখানে National Knowledge Commission-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে—"NKC's overarching aim is to transform India into a vibrant knowledge-based society. This entails a radical improvement in existing systems of knowledge as well as the creation of avenues for generating new forms of knowledge."

শিক্ষাকে জ্ঞান বিকাশের মাধ্যম এবং জ্ঞান সঞ্চালনের প্রক্রিয়া হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তাবে কারও আপত্তি থাকার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু প্রশ্নটা অন্যত্র—প্রথমত শুধু জ্ঞান বিকাশ কি মানবিক শিক্ষা বা মানুষ গড়ার শিক্ষার মাধ্যম হতে পারে? দ্বিতীয়ত এই জ্ঞান বিকাশের শিক্ষা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের ক্রমবর্ধমান প্রসারের ফলে শিক্ষা কতখানি সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে থাকতে পারবে? অধিকাংশ মানুষ যদি এর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে সর্বজনীন শিক্ষার ভবিষ্যত কী এবং শিক্ষা ব্যবস্থার কাছে সামাজিক ও আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা প্রায় সত্তর শতাংশ মানুষের প্রত্যাশা কী থাকতে পারে? এই ধরণের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ভারতে একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা সম্পর্কে এর মানবিক মুখ সম্পর্কে কিছু দুর্ভাবনার সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক।

আধুনিক ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর উক্তি—"The goal of education is to establish a non-violent and non-exploitating social and economic order." ১৯৮৬ সালের Nation policy on Education সম্পর্কে ১৯৯০ সালে যে রিভিউ কমিটি গঠিত হয় তার প্রতিবেদনে শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে প্রস্তাব করা হয়। "Towards an Enlightened and Humani Society"। ভারতে শিক্ষার আধুনিকীকরণ সম্পর্কে আর একটি উক্তি বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য—"Can we combine the progress of science and technology with the progress of mind and spirit also? We cannot be untrue to science because that represents the basic fact of life to-day. Still less can we be untrue to those essential principles for which India has stood in the past throughout the ages."। এই প্রসঙ্গে The Education Commission (1964-66)-এর ভারতীয় শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে একটি উক্তিও বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী করে—"We believe that India should strive to bring science and the values of the spirit together in harmony and thereby save theri way for the cultural emergence of a siciety which cater to the needs of the whole man and not only to a particular fragment of personality."।

বর্তমানে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন সম্পর্কে যে সব ভাবনা চিন্তা হচ্ছে এবং যে সব

উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে সেগুলি এবং বিশেষভাবে National Knowledge Commission-এর সুপারিশসমূহ কি উপরিউক্ত ধ্যানধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? যদি তা না হয় তাহলে উক্ত ভাবনাচিন্তার ভিত্তিতে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তাতে কি শিক্ষার মানবিক সুখ সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে? এইসব দুর্ভাবনা এবং উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তির উপায় সম্পর্কে আমাদের নিশ্চয় কিছু করণীয় থাকে।

প্রসঙ্গত হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্প-এ একদা বন্দী জীবন যাপন করেছেন এমন একজন ব্যক্তির শিক্ষকদের প্রতি একটি আবেদন স্মরণ করতে বাধ্য হচ্ছি—

"Dear Teacher,

I am a survivor of a concentration camp. My eyes saw what no man should witness. Gas chambers built by learned engineers, children poisoned by educated physicians, infants killed by trained nurses, women and babied shot and burnt by High school and College graduates. So, I am suspicious of education. My request to teachers—help your students to become human. Your effort must never produce learned monsters, skilled sycophants, educated Eichmans."

তালিকা—ক

Literacy rates often populous (Population more than five crores) States ofIndia (Census 2001) [According to position]

Rank	Name of the State	Total Population	% of Literacy
1st	Maharashtra	5,27,33,958	77.27
2nd	Tamilnadu	6,21,10,839	73.47
3rd	West Bengal	8,02,21,171	69.22
4th	Gujrat	5,05,96,992	69.07
5th	Karnataka	5,27,33,958	67.04
6th	Andhra Pradesh	7,57,27,541	65.38
7th	Madhya Pradesh	6,03,85,118	64.11
8th	Rajasthan	5,67,43,122	61.03
9th	Uttar Pradesh	16,60,52,859	57.36
10th	Bihar	8,28,78,796	47.53
Total Population		78,42,02,613	
Total Population (India)		1,02,70,15,247	65.38

তালিকা—খ

Statement

Literacy in percentage in 2001	Name of the State	Average (%)	Male (%)	Female (%)
90% above	Kerala	90.92	94.20	87.86
80-90%	Mizoram, A&N.Island, Chandigarh, Daman & Diu, Delhi, Lakshadweep, Pondicheri			
70-79% 60-69% Below 60%	Himachal Pradesh	77.13	86.02	68.02
	Maharashtra	77.27	86.27	67.51
	Tamilnadu	73.47	82.33	64.55
	Tripura	73.66	81.47	65.41
	Uttaranchal	72.28	84.01	60.26
	* Andhra Pradesh	65.38	75.85	54.16
	Assam	64.28	71.93	56.03
	*Chattishgarh	65.18	77.86	52.40
	# Gujrat	69.07	80.50	58.60
	* Hariyana	68.59	79.25	56.31
	* Karnataka	67.04	76.29	57.45
	Madhya Pradesh	64.11	76.80	50.28
	* Manipur	68.87	77.87	59.70
	* Meghalaya	63.31	66.14	60.41
	Nagaland	67.11	71.77	61.92
	Orissa	63.61	75.95	50.97
	#Punjab	69.95	75.63	66.53
	Rajassthan	61.03	76.46	44.34
	# Sikim	69.68	76.76	61.46
	# West Bengal	69.22	77.58	60.22
	Dadra & Naear Haveli	60.33	73.32	42.99
	Arunachal Pradesh, Bihar, Jammu & Kashmir, Jharkhand & Uttar Pradesh			
	India	**65.38**	**75.85**	**54.16**

*More than 65%; # Nearly 70%

State wise-Statement of Expenditure on shcool education

Statewise education expenditure (2005-06)								
State/UT	Total State Budget (2005-06)	Ele. Edu. Budget as% State Budget	Sec. Edu Budget as % State Budget	Total SSA Funds available	Available SSA funds as % State Budget	Unitexp. Rs. per enrolled student	Exp. Rs. per child in relevant population	%children in age group 5-14 not in school
Andhra Paradesh	373779000	6.18	4.05	6335212	27.45	3370	1849	12.40
Arunachal Pradesh	16320300	5.87	2.08	585353	61.07	6221	3737	27.90
Assam	137538600	14.75	5.40	3489728	17.21	6830	3526	12.90
Bihar	185821400	19.2	1.87	2947578	33.02	2790	1384	34.80
Chhattisgarh	81323100	10.36	3.28	6482183	76.96	2864	1885	18.00
Goa	29147400	2.38	6.15	103356	14.92		8869	5.40
Gujarat	246560700	8.13	4.78	3414017	17.02	4668	2376	14.40
Hariyana	129854400	7.56	5.18	2075743	21.15	7581	2656	12.80
Himachal Pradesh	58857200	9.84	6.17	1261503	21.79	8649	5917	5.00
Jammu & Kashmir	88740900	5.64	4.78	3094253	61.84	6841	2950	11.90
Jharkhand	93215300	12.70	2.80	6305416	53.24	3781	1750	23.30
Karnataka	283640000	9.40	4.62	5059942	18.98	5033	2809	11.70
Kerala	206962500	7.37	6.81	1303896	8.55	9894	4295	2.40
Madhya Pradesh	210349500	8.79	1.87	15034028	81.34	1840	1255	21.60
Maharashtra	501639500	9.05	7.92	8168924	18.00	7312	3331	10.90
Manipur	18497400	6.85	3.90	391361	30.88		3314	6.80
Meghalaya	18757100	8.37	3.75	669143	42.62	4723	3642	13.10
Mizoram	13949800	8.81	3.74	579944	47.20	8893	6980	4.70
Nagaland	18929300	8.00	2.52	288554	19.05	4969	3024	6.70
Orissa	137838500	9.11	4.03	5190704	41.32	3116	1846	19.80
Punjab	193565800	3.11	7.45	2699745	44.89	7615	3118	11.00
Rajasthan	220613100	13.11	7.28	8054752	2784	4515	2625	22.00
Sikkim	17728000	4.28	4.09	161026	21.23	12876	9063	5.90
Tamil Nadu	316555200	6.81	6.22	4918170	22.81	4216	2892	3.90
Tripura	26806600	11.23	6.72	1250492	41.54	7111	5178	11.80
Uttarabchal	64385300	8.58	8.64	1678492	30.38	8009	4365	12.40
Uttar Pradesh	480710600	9.63	4.92	24848816	53.70	2582	1333	22.50
West Bengal	311375900	6.66	8.06	5880182	28.36	3561	2087	17.10
Andaman Nicobar	15126100	3.74	2.72	47744	8.44		10917	2.60
Chandigarh	10509200	4.93	3.07	72995	14.09	8095	3835	6.10
Dadar & N. Haveli	4760900	3.08	1.00	66901	45.57		3574	15.80
Daman & Diu	2578900	3.15	2.81	26151	32.21		4388	2.00
Delhi	66936300	6.50	14.75	295733	6.80	6948	3868	9.70
Lakshadweep	2206000	0.31	4.48	5841	85.90		6256	6.30
Pondichery	15739300	4.34	3.64	106176	15.54	10017	5697	2.10

(কু) সংস্কার অপনোদনে শিক্ষকের ভূমিকা

—মনোতোষ দাশগুপ্ত

বড়ো আক্ষেপ ছিল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের। প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর ছাত্ররা গঙ্গায় গ্রহণের স্নান করতে যায়। তিনি লিখছেন, যে, তিনি ছাত্রদের গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন। "তাহারা বুঝিত, আবার গ্রহণ মুক্তির স্নান করিতে গঙ্গাতেও যাইত।" আচার্য তো রসায়নের শিক্ষক। খুবই নিষ্ঠাসহকারে পড়াতেন। প্রথম শ্রেণি থেকে ক্লাস নিতেন। পড়াতে পড়াতে আবেগতাড়িত হয়ে পড়তেন। পরমাণুসমূহের পারস্পরিক আকর্ষণ বোঝাতে গিয়ে বেয়ারাকে জড়িয়ে ধরতেন। কিন্তু এসবের মধ্যে গ্রহণজনিত কুসংস্কারের কথা আসে কোথা থেকে?

আচার্য চেয়েছিলেন এদেশে বিজ্ঞানচর্চার জন্য নিষ্ঠ এক যুবসম্প্রদায় গড়ে উঠুক। পেরেও ছিলেন তিনি। আচার্যের রাসায়নিক গবেষণায় কৃতিত্বের তুলনায় এই কৃতিত্বও নেহাত ছোটো নয়, বরং বেশিই। একটি পরাধীন দেশে একেবারে শূন্য থেকে রসায়ন গবেষণায় ইমারত গড়ে তোলা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশের জন্য ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি স্থাপন এবং সেই সোসাইটি পরিচালিত জার্নাল প্রকাশ করে তাকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অনুরূপ সংস্থার জার্নালের সঙ্গে একাসনে প্রতিষ্ঠিত করা অনন্যসাধারণ মেধা, সংগঠন-ক্ষমতা ও গবেষক হিসাবে অত্যুচ্চ উৎকর্ষের সমন্বয়েই সম্ভব হয়েছিল। আচার্য পি-সি-রায়ের ঐতিহ্যধারী; হয় প্রত্যক্ষ শিষ্য বা প্রশিষ্য বা পরোক্ষ শিষ্য।" এই অসাধ্য সাধন করতে গিয়ে আচার্যদেব খুব সঠিকভাবেই দেখেছিলেন যে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সবচেয়ে আগে যেটা প্রয়োজন তা হল বিজ্ঞানমনস্কতা। এই বিজ্ঞানমনস্কতা আধুনিকতার সমার্থক। বিজ্ঞান গবেষণার অগ্রগতি একটা জাতির আধুনিকতার মাপকাঠি হলেও, সবাই তো আর বিজ্ঞান গবেষক হবে না। কিন্তু বিজ্ঞানমনস্ক হতে বাধা কোথায়? শিক্ষার একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত তাই বিজ্ঞান শিক্ষা আবশ্যিক হতে হয়। এই বিজ্ঞান শিক্ষা যুক্তি ও চিন্তার যে পরিশীলন, প্রণালীবদ্ধতা, সুভেদ্যতা, বিস্তার ও আন্তর্বৈষয়িকতা তৈরি করে গবেষণার ক্ষেত্রে তা খুবই সুফল দেয়। এই গুণগুলি মানব বিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রেও দরকারী। তাই বলা যায়, প্রতিটি মানব বিদ্যার ছাত্রের প্রয়োজন বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাধারা আর প্রতিটি বিজ্ঞানের ছাত্রের প্রয়োজন একটি রসস্নিগ্ধ মন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর 'অব্যক্ত' ও অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' গ্রন্থদুটিকে পাশাপাশি রাখলেই এ কথার যৌক্তিকতা সম্যক বোঝা যাবে।

একটি পরিচ্ছন্ন মন ও পরিষ্কার চিন্তনক্ষমতা যে কোনও গবেষণার ক্ষেত্রে একান্ত জরুরি। এর প্রথম ধাপ সংস্কারাচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি। এই সংস্কার যে কোনও ধরনের হতে পারে। বিশদ আলোচনায় যাবার আগে 'সংস্কার' কথাটার একটু ব্যাখ্যা করে নেওয়া যেতে পারে। কথাটার ব্যুৎপত্তি ঃ সম্ + Öকৃ + অ (ভাববাচ্যে); অর্থ 'সম্যক্‌ভাবে যা করা হয়েছে'। বিশেষরূপে নির্মলীকরণ, শোধন/সংশোধন, অলংকরণ প্রভৃতি বোঝায় এ শব্দে। এই অর্থের প্রলম্বন ও প্রসারের মাধ্যমে আমরা বলতে পারি 'সংস্কার' শব্দের অর্থ 'বিশেষ ভাবে অনুষ্ঠিত কৃত্য' : অর্থাৎ সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে 'সংস্কার' কিন্তু ভালো অর্থেই ব্যবহৃতব্য। 'সংস্কার' শব্দের অপর অর্থ সহজাত ধারণা, বিশ্বাস, জ্ঞান, প্রবৃত্তি ইত্যাদি। এই অর্থে ব্যবহারের উদাহরণ—পূর্বজন্মের সংস্কার; তার সংস্কার বস্তুটি গ্রহণে তাকে বাধা দিল; সংস্কারের বশবর্তী হয়ে সে একাজ করেনি ইত্যাদি। এখন এই যে সংস্কারের অর্থ 'বিশ্বাস' বা 'ধারণা' বা 'ঝোঁক' ইত্যাদি— এখান থেকেই শব্দার্থের 'অপকর্ষ' নিয়ম মেনে 'সংস্কার' কথাটার অর্থে একটা ঋণাত্মক ভাব এসেছে। 'সংস্কার' শব্দটিকে 'উদাসীন' (neutral; ধনাত্মক নয়, ঋণাত্মকও নয়) ধরলে, এর আগে 'কু' বিশেষণ বসিয়ে 'খারাপ ধারণা বা বিশ্বাস' বোঝানো হয়। আবার যখন সংস্কার বলতে 'পরিমার্জন',



কলেজে শতবর্ষ উপলক্ষ্যে সেমিনারে ভাষণ দিচ্ছেন শ্রী সুবিমল সেন, ভাইস চেয়ারম্যান, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চশিক্ষা সংসদ।

'মেরামতি', 'পরিশোধন' বা 'পরিবর্তন' বুঝি, তখন 'সংস্কার' আর 'কুসংস্কার' অভিন্ন হয়ে দাঁড়ায়। আর 'সংস্কার' বলতে শুধু 'ধারণা' বুঝালেও, এটা স্বভাবতঃই চলে আসে যে সংস্কার যখন মনে বদ্ধমূল হয়ে যায় বা গেঁথে বসে, তখন শত চেষ্টা বা যুক্তিজালেও তাকে উৎপাটিত করা যায় না। এই ভাবে গেঁথে বসা বিশ্বাস বা ধারণাই কালক্রমে কুসংস্কার হয়ে দাঁড়ায়। গবেষকের সংস্কারাচ্ছন্ন হতে নেই— বিজ্ঞান গবেষকের তো নয়ই। অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে গবেষণার অর্থই তো একটা প্রাগ্ধারণাকে যুক্তি এবং পরীক্ষা (experiment) দ্বারা প্রমাণ/প্রতিষ্ঠা করা। এর উত্তর এই যে এই প্রাগ্ধারণা গেঁথে যাওয়া বিশ্বাস নয়, একে বলা হয় প্রকল্প বা হাইপোথেসিস্ (Hypothesis)। এখানে 'ধারণা' তৈরি করে নেওয়া হয়— 'ধারণাটি' লালিত বা অর্জিত নয়। আবার এ-ও হতে পারে যে 'ধারণা'টি নিজের বা অন্যের ভূয়োদর্শন, যুক্তি ও চিন্তার ফসল। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। না, তার আগে 'প্রকল্প' কথাটার একটু ব্যাখ্যা সেরে নেওয়া যাক। অনুরূপ ব্যাখ্যা টমাস হেনরি হাক্সলে-র 'Nature and Science' প্রবন্ধে আছে। এখানে একটু বিস্তারিত করা হল।

একজন লোক রোজই বা প্রায়ই আপেল খায়। আপেল খেতে খেতে একদিন দেখল যে আপেল টক। ভালো করে দেখতে গিয়ে দেখে আপেলটা কাঁচা। ব্যস্, তারপর ভুলেই গেছে ব্যাপারটা। বেশ কিছু দিন পরে আবার ,কদিন ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। তবে কী কাঁচা আপেল মাত্রেই টক, বা আপেল টক হলেই কাঁচা হবে? এবার সে নিজেই পরীক্ষা করতে শুরু করল। দেখল যে, টক হলেই আপেল কাঁচা হবে— এটা ঠিক নয়; তবে কাঁচা আপেল টকই হয়। এটা হল একটা প্রকল্প। এবার সে আপেল উৎপন্ন হয় যে সব জায়গায়, সেখানে সেখানে গেল। দেখল, ঠিকই। তারপর দেশ বিদেশের পরিচিত মানুষের কাছে খোঁজ নিল, তাদের দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিল, কখন-কোথায়-কবে-কীভাবে-কী ধরনের আপেল পরীক্ষিত হয়েছে, তা লিখিয়ে নিল, আপেলের উদ্ভিদবিদ্যাগত বৈশিষ্ট্যসমূহ উদ্ভিদবিদ্যাবিশারদকে দিয়ে শংসিত করিয়ে নেওয়া হল। এইভাবে দেশ-কালের যথাসম্ভব বিভিন্নতায় যখন দেখা গেল যে, কাঁচা আপেল টক, তখন বিস্তারিত ও বিভিন্ন পরিবেশে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রকল্প সূত্রে উত্তীর্ণ হল। 'কাঁচা আপেল টক'— এখন হল সূত্র (law)। কিন্তু কেন? আপেলে আছে আইসো ভ্যালেরিক অম্ল (iso-valeric acid)। এটা জানা যে অম্ল মাত্রেই টক। এই আইসো-ভ্যালেরিক অম্লের উপস্থিতিই কাঁচা আপেলকে টক করে। কাঁচা আপেলে কিন্তু আপেলের বিশেষ গন্ধটা থাকে না, বদলে একটা টক টক গন্ধ থাকে। তারপর আপেল পরিপূর্ণতা লাভ করে যখন, তখন আপেলের মধ্যস্থিত বিশেষ উৎসেচক (enzyme)-এর ও সূর্যালোকের প্রভাবে এই আইসো ভ্যালেরিক অম্ল আইসো-অ্যামিল, আইসো-ভ্যালেরেট নামক এস্টারে পরিণত হয়। এস্টার হচ্ছে 'জৈব যৌগ' আর এরা সুন্দর মিষ্টি গন্ধযুক্ত। তাই পাকা আপেল মিষ্টি ও সুন্দর বিশেষ গন্ধযুক্ত। এটা হল 'কাঁচা আপেল টক'-এর তত্ত্ব। এই তত্ত্ব কতগুলো স্বীকৃত বা জ্ঞাত তথ্য বা postulate-এর উপর নির্ভরশীল। এগুলো হল ঃ অম্লটক, এস্টার মিস্টি গন্ধযুক্ত ইত্যাদি। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি ভালো উদাহরণ হল আভোগেড্রো প্রকল্প/সূত্র। এই ইতালীয় বিজ্ঞানী ১৮১১ সালে পূর্ব-প্রস্তাবিত বার্জেলিয়াস (সুইডিশ্ বৈজ্ঞানিক) -এর প্রকল্পের সংশোধন করে বললেন, "অভিন্ন তাপমাত্রা ও চাপে সম আয়তন যে কোনও গ্যাসে সমসংখ্যক অণু (বার্জেলিয়াস বলেছিলেন পরমাণু) থাকবে।" এটি অ্যাভোগেড্রো প্রকল্প। তারপর কেটে গেছে কতদিন! নানা ধরনের ভৌত ও রাসায়নিক পরীক্ষা পরোক্ষভাবে এই প্রকল্পের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই প্রকল্পের প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই এই কারণে যে, অণু গোনা সম্ভব নয়। বর্তমানে তাই একে আমরা অ্যাভোগেড্রো সূত্র বলি। বার্জেলিয়াসের প্রকল্প অশুদ্ধ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও একে আমরা 'সংস্কার' বলব না, 'কুসংস্কার' তো নয়ই। আবার এ-ও বলব না যে অ্যাভোগেড্রো এর 'সংস্কার সাধন করেছিলেন'

(reformed); বলব যে অ্যাভোগেড্রো বার্জেলিয়াসের প্রকল্পটি সংশোধিত (রূপান্তরিত বা আংশিক পরিবর্তিত) করেছিলেন (modified)। তবে মনে প্রোথিত বিস্ময়ের সংস্কার-সাধনের (reformation) বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায়ও প্রকল্পের জন্ম হতে পারে।

আমরা আগেই বলেছি যে আধুনিক শব্দতত্ব অনুযায়ী সংস্কারের মধ্যে একটি ঋণাত্মক ভাবনা আছে, যার চরম অবস্থা 'কুসংস্কার'। ইংরেজিতে আমরা এদের প্রতিশব্দ হিসাবে যথাক্রমে prejudice ও supertion বলতে পারি। মনস্তত্ত্ববিদরা কুসংস্কার থেকে সংস্কার বা পূর্বসংস্কার (prejudice) নিয়ে বেশি ভাবিত। সামাজিক মনস্তত্ত্ববিদ্যা (social psychology)-য় এই 'সংস্কার' নিয়ে প্রভূত গবেষণা করা হয়েছে এবং হচ্ছে। সংস্কার এবং কুসংস্কার-এর পার্থক্য মাত্রা (degree)-য়, রকম (kind)-এ নয়। কিন্তু দুটোই ক্ষতিকর। তাই অবশ্যই অপনোদনীয়। আর এই অপনোদন সম্ভব শিক্ষার মাধ্যমে। লক্ষণীয় আমরা 'শিক্ষা বলেছি, 'বিদ্যা' নয়। শিক্ষা (education) এবং 'বিদ্যা' (knowledge) অভিন্ন নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শেষের কবিতা'-র অমিতর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন 'হীরের আংটিটা হচ্ছে বিদ্যা, আর তার থেকে ঠিকরে পড়া আলো হচ্ছে কালচার'। না, ঠিক হল না, কালচার ঠিকরায় বিদ্যা থেকে নয়, ঠিকরায় শিক্ষা থেকে। তাই বলা যায় শিক্ষা = বিদ্যা + x। এই 'x' রাশিটা ভীষণ ভীষ—ণ গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষেত্রবিশেষে এমনও হতে পারে যে, শিক্ষা = x , অর্থাৎ এক্ষেত্রে 'বিদ্যা = O'। হতে পারে, ক্ষতি নেই। সংস্কার/কুসংস্কার অপনোদিত হতে পারে, শিক্ষারই মাধ্যমে। বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ এস-পি-আদিনারায়ণ লিখছেন ঃ As a weapon to fight prejudice, the psycologist prefers to think of education rather than knowlege. Mere imparting of knowledge has a 'take it or leave it' side to it. The responsibility of the giver ceases soon after the imparting. But education is a more active, constructive business where the giver and the receiver cooperate in making something out of knowledge এই কথা থেকে দুটো জিনিস খুব পরিষ্কার বেরিয়ে আসছে। দুটো নয়— তিনটে। প্রথমত ঃ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন একজন শিক্ষক— প্রকৃত শিক্ষক। দ্বিতীয়ত ঃ শিক্ষককে প্রকৃত 'শিক্ষক' হয়ে উঠতে হবে— জ্ঞানদাতা নয়। তৃতীয়ত ঃ শিক্ষককেই সংস্কার/কুসংস্কার অপনোদনের ভার নিতে হবে। শিক্ষকের কাজের মূল উদ্দেশ্য তো জাতি গঠন। আর এই জাতি গঠনে সবচেয়ে বড় উপাদান হচ্ছে মানুষ তৈরি। সুশিক্ষিত মানুষই পারে জাতিকে বহমানা নদীর মতো স্বচ্ছ, গতিময় ও সৃষ্টিশীল করে রাখতে। রবীন্দ্রনাথের কথা ঃ "যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে / অজস্র শৈবাল দাম বাঁধে আসি তারে। / যে জাতি জীবন হারা অচল অসার / পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।" 'লোকাচার' 'সংস্কার'-এরই রকমফের। রবীন্দ্রনাথ দেখাচ্ছেন অগ্রগতি স্তব্ধ হলেই শৈবালদামসদৃশ লোকাচারের প্রতিবন্ধক এসে জড়ো হয়। এই অগ্রগতি কীসের? অবশ্যই আর্থ সামাজিক অগ্রগতি। আর এই সামাজিক অগ্রগতির একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ সাংস্কৃতিক। দেশ বা জাতির অর্থ তো হচ্ছে মানুষ। আর স্বাভাবিক ভাবেই দেশের প্রতিটি কোণার মানুষের সমান অগ্রগতি ঘটে না। আর যে কোন দেশ বা জাতির ক্ষেত্রে বৈচিত্রের সমাবেশ দেখা যায়। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এটা খুবই বেশি ও সুপ্রকট বলে আমরা এর জন্য গর্ববোধ করি; কিন্তু কোন দেশেই অবিমিশ্র সমসত্ত্বতা নেই, থাকা সম্ভবও নয়। নানা অভ্যন্তরীণ কারণে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর বা বিভিন্ন অঞ্চলে সমান অগ্রগতি ও শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হয় না। যে সব অংশে শিক্ষার প্রসার অপেক্ষাকৃত কম বা যেখানে আর্থিক সাচ্ছল্য নীচের দিকে, সেখানকার মানুষের মধ্যে সংস্কার— আচ্ছন্নতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু দেশ/জাতির গড় অবস্থান সাধারণভাবে এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে সময়মতো সতর্ক না হলে এতে যে সামান্য ফাটল সৃষ্টি হয় কালক্রমে তা জাতীয় সংহতিকে বিধ্বস্ত করে ভাঙনের পথে নিয়ে যেতে পারে দেশ ও জাতিকে। মজা হচ্ছে যে এই ভাঙন ঘটে

আর্থিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য সম্বন্ধে মানুষ যখন অবহিত হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রথম দিকে অবহেলিত জনগোষ্ঠী অভিমানবশতঃ নিজেদের সংস্কৃতিকে আশ্রয় করে সরে থাকতে বা নিজেদের গুটিয়ে নিতে থাকে। এ সময় তারা লোকাচার বা সংস্কারকে সংস্কৃতি বলে ভুল করে। অংশের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে পড়ায় জাতির অবাধ অগ্রগমনের স্রোতধারা ব্যাহত হয় এবং স্থানবিশেষে ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয়, এর আধিক্য ঘটলে বা একে অবহেলা করলে বিপদ অনিবার্য। শিক্ষা-কেবলমাত্র শিক্ষাই এই বিপদ রুখতে পারে। শিক্ষাই মনের কোণে লালিত সংস্কারকে দূর করে স্বাজাত্যবোধের জন্ম দিতে পারে, যা ব্যষ্টিতে সমষ্টির অংশম্মন্যতাবোধ তৈরি করে এবং জাতির একজন হিসাবে তাকে ত্রুটির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে উদ্বুদ্ধ করে। নিজে সোচ্চার না হতে পারলেও সোচ্চার কণ্ঠের সঙ্গে গলা মেলাতে উৎসাহ দেয়।

শিক্ষা চিন্তার স্বকীয়তাকে উদ্বুদ্ধ করে, যুক্তিবিশ্লেষণের প্রবণতা উস্কে দেয় এবং সত্যের প্রতি একটা খোলা-মন-ধারণা তৈরি করে। আর এভাবেই শিক্ষা সংস্কারের সঙ্গে যুদ্ধে অস্ত্রের কাজ করে। স্বামী বিবেকানন্দ এ বিষয়টিকে আরও অল্পকথায় আরও বিস্তৃতভাবে বলেছেন, "মানুষের ভিতর যে পূর্ণত্ব প্রথম থেকেই আছে, তারই প্রকাশ-সাধনাকে বলে শিক্ষা।" রবীন্দ্রনাথও একই কথা বললেন একটু অন্য ভাবে, "আমাদের যে শক্তি আছে তাহারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি তাহাই সম্পূর্ণভাবে হইব, ইহাই শিক্ষার ফল।" আর একটু এগিয়ে রবীন্দ্রনাথ আবার বললেন, "যে শিক্ষা অন্তরের অমৃত তাহার সাহায্যেই আমরা মৃত্যুর হাত এড়াইব।" রবীন্দ্রনাথ তাই বারবার 'মানসিক শক্তি-হ্রাসকারী নিরানন্দ শিক্ষার হাত এড়াতে' 'চিন্তাশক্তি ও কল্পনা শক্তি'-কে উদ্বেলিত করতে চেয়েছেন। চিন্তা কল্পনাশক্তি না থাকলে তো মানুষে আর রোবটে কোন পার্থক্যই থাকে না! বিবেকানন্দ তাই বলছেন, "চালিত যন্ত্রের ন্যায় ভাল হওয়ার চেয়ে স্বাধীন সত্তা—চৈতন্য-শক্তির প্রেরণায় মন্দ হওয়াও আমার মতে কল্যাণকর।" বললেন বটে, কিন্তু মজা এই যে চৈতন্যশক্তি কাউকে মন্দ হবার প্ররোচনা দেয় না।

এই শক্তি তো মানুষের মধ্যে প্রথম থেকেই আছে। তাকে উদ্বোধিত করতে হবে। শিক্ষকই এই উদ্বোধক। বিবেকানন্দ বলেছেন, "উপদেষ্টার কর্তব্য কেবল পথ থেকে বাধাবিঘ্নগুলো সরিয়ে দেওয়া"; 'রাস্তা সাফ করে দেওয়া' "ছেলেগুলো যাতে নিজ নিজ হাত-পা নাক-কান, মুখ-চোখ ব্যবহার করে, নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে নিতে শেখে।" আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাই করতে চেয়েছিলেন একেবারে 'প্র্যাক্টিক্যালি'। আচার্যদেব দুঃখ পেয়েছেন এই ভেবে যে ছেলেরা 'বুঝিত, আবার গ্রহণ মুক্তির স্নান করিতে গঙ্গাতেও যাইত।' না, দুঃখ পাওয়া নিষ্প্রয়োজন ছিল। সংস্কার/কুসংস্কার বিতাড়ন অত সহজ নয়। বহুদিনের প্রোথিত জগদ্দল পাথর এক ধাক্কায় সরে যাবে, ভাবা ভুল। তবে একজনকে তো প্রথম ধাক্কাটা দিতে হবে! একটা সহজ অঙ্কের হিসাব নেওয়া যাক। মনে করা যাক, দিনে একবার ধাক্কা দিলে একশ দিনে কোনও একটা পাথর সরানো যায়। আজ যদি প্রথম ধাক্কাটা দিই তবে শততম দিনে পাথরটাকে উপড়ানো যাবে; আর কাল প্রথম ধাক্কা দিলে উপড়ানো যাবে একশ একতম দিনে। তাই যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল। আচার্যদেব জানতেন, জেনেও দুঃখ পেয়েছেন এই কারণে যে তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণরত বিজ্ঞানের ছাত্রদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংস্কার মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আশু ফললাভে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আখেরে যে ব্যর্থ হননি, আধুনিক যুগের প্রেক্ষিতে ভাবলেই তা বোঝা যায়।

সংস্কার/কুসংস্কার দূর করার ব্যাপারটা যে কত প্রয়োজনীয় ও কঠিন, তা একটা তথ্য থেকেই প্রমাণিত হয়। রয়্যাল সোসাইটি যখন প্রতিষ্ঠিত হয় (১৬০৬ খৃঃ, নথিভুক্ত হয় ১৬৬২-তে), তখন এর প্রথম কাজই হল দীর্ঘলালিত সংস্কার বা অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এদের অসারতা প্রতিপন্ন করা। একটা বর্ণনায় দেখি, অধিবেশন বসেছে যে বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে তা হল গণ্ডারের শিঙের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি বৃত্তের মধ্যে একটা পিঁপড়ে ছেড়ে দেওয়া হলে সেই বৃত্ত ডিঙিয়ে আসা পিঁপড়েটির অসাধ্য

সেই অধিবেশনের জন্য গণ্ডারের শিঙের গুঁড়ো গিয়েছিল ভারতবর্ষ থেকে। সেই গুঁড়ো যে সত্যিই গণ্ডারের শিঙের তা নানাভাবে প্রত্যয়িত করা হয়েছিল। অনুরূপে পিঁপড়েটিকেও প্রাণিবিজ্ঞানীদ্বারা শংসিত করা হয়েছিল। সব ব্যবস্থা করে দেখা গেল পিঁপড়েটি অনায়াসে ওই গুঁড়োর বৃত্ত অতিক্রম করল। এভাবে দিনের পর দিন। আর এসব কাজের অনেকটাই যেহেতু গীর্জার বিরুদ্ধে গেল, তাই গীর্জার ধর্মধ্বজীরা এঁদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে উঠল। গীর্জার পক্ষে প্রশাসন। তাই এসব অধিবেশন হত বারাঙ্গনা পল্লীতে।

এই ঘটনায় আরেকটি বিরাট সত্য বেরিয়ে আসে। তা হল এই যে মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত হিসাবে প্রতিটি মানুষের অবদান রয়েছে। মনে পড়ে অক্ষয়কুমার বড়ালের একটি কবিতা (মানব বন্দনা)-র পঙ্‌ক্তি : 'শরণ্য একত্বে তুমি বরেণ্য এককে'। ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টি এদিকটির প্রতি আকৃষ্ট করানো খুবই দরকার। শিক্ষক, ধরা যাক, ক্লাস নিচ্ছেন। পড়াচ্ছেন কাজি নজরুল ইসলামের 'বারাঙ্গনা' কবিতাটি ঃ 'কে বলে তোমায় বারাঙ্গনা মা, কে থুতু দেয় ও গায়ে?/হয়তো তোমার স্তন্য দিয়াছে সীতা কোন সতী মায়ে'। কিংবা পড়াচ্ছেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের 'ওরা কাজ করে' : 'তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল... বহুদূরে প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার, /তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার'। [দুর্ভাগ্য এই যে প্রথম কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার পর সজনীকান্ত দাস তাঁর 'শনিবারের চিঠি'-তে লিখেছিলেন, 'এইবার ঠিক হইয়াছে। নজরুল অবশেষে তাঁহার মাকে বেশ্যা বলিয়াছেন।'] এই দুটি ক্ষেত্রে প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে রয়েল সোসাইটির ঘটনাটি কী সুন্দর খাপ খেয়ে যাচ্ছে। এভাবেই শিক্ষক প্রসঙ্গকে ধরে প্রসঙ্গান্তরে যেতে পারেন, শিক্ষাদানকে নেহাতই সংকীর্ণতার খোলে বদ্ধ না রেখে তাকে প্রসারিত করে দিতে পারেন বহু বিচিত্র ধারায়। এর প্রয়োজন আছে। শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা সাধারণভাবে না বলে যদি শুধু আমাদের নিজেদের দিকে তাকাই, তবে কিন্তু এটি এক অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে পড়বে। এখন তো নিয়ম হয়েছে যে পাঠ্যপুস্তকের প্রথমেই আমাদের পবিত্র সংবিধানের প্রস্তাবনা-অংশটি মুদ্রিত করতে হবে। এই প্রস্তাবনা অংশ যদি লক্ষ করি তবে দেখব সেখানে আছে ঃ আমরা, ভারতের জনগণ যথাবিধি ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিকপ্রজাতন্ত্রে সংস্থাপিত করতে সংকল্প নিয়ে এবং সমস্ত নাগরিকদের বিধান করতে ঃ

ন্যায়বিচার, সামাজিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা, চিন্তার, প্রকাশের, বিশ্বাসের (belief), প্রত্যয়ের (faith) এবং আরাধনার।

* * *

লক্ষণীয় বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। এ থেকে মনে হতে পারে যে, পূর্ব সংস্কারও তো বিশ্বাস! যে যেই বিশ্বাসে খুশি থাকে, থাকুক না তা নিয়ে। তবে আমাদের প্রস্তাবনার এই অংশের সঙ্গে পড়তে হবে "অংশ IV A : মৌলিক কর্তব্যসমূহ" (Fundamental duties) অংশটি। এই অংশ সংবিধানের আদি সংস্করণে ছিল না। ১৯৭৬-এর ৪২তম সংশোধন (৩. ১. ১৯৭৭ থেকে কার্যকরী হয়)। এতে আছে [51-A (h) অংশে] "বিজ্ঞানমনস্কতা, মানবিকতা এবং অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কারের প্রবণতা বিকাশ করা (to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform". স্পষ্টই সংস্কার বা কুসংস্কারকে বিজ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসার আলোকে দূর করতে হবে। এটা স্বাধীন ভারতের নাগরিকমাত্রেরই অন্যতম সাংবিধানিক কর্তব্য। আর শিক্ষকরা স্বাধীন দেশের নাগরিক তৈরি করেন, আগামী প্রজন্মকে তৈরি করেন— আর যেহেতু মানুষ নিয়েই দেশ— তাই বলা যায় তাঁরা দেশকে নিয়ত তৈরি করে চলেছেন, শিক্ষকদের উপর স্বভাবতঃই এই দায়িত্ব বেশি করে বর্তায়।

শিক্ষকেরা কীভাবে বিজ্ঞানমনস্কতা সংক্রমিত করে সংস্কার/কুসংস্কার দূর করতে সচেষ্ট হবেন, তা আলোচনা করার আগে সংস্কার কী, তা নিয়ে আলোচনা করে নেওয়া যাক। মনোবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন, সংস্কার হচ্ছে জীবনের প্রতি একটা বিশেষ মনোভাব, জটিল সমস্যা নিয়ন্ত্রণের একটি বিশেষ উপায়। এর তাৎক্ষণিক ফল সন্তোষজনক হলেও আখেরে এটি ক্ষতিকর। সংস্কারের ইংরাজি প্রতিশব্দ prejudice -এর উৎস লাটিন praejudicium থেকে, যার অর্থ previous judgement। মধ্যযুগের ইংরাজিতে, পুরোনো ফরাসীতেও একই অর্থে এটি ব্যবহৃত— more previous judgement, ইংরাজিতে এর অর্থ কোন বিচার বা অধিকারকে অগ্রাহ্য করে কারও কোন কাজের ফলশ্রুতিতে ক্ষতি হওয়া। আরেকটি অর্থ আগে থেকে গড়ে নেওয়া কোন বিচার বা বিশ্বাস। 'অযৌক্তিক শত্রুভাব' ও বোঝায় এতে। বাংলায় সংস্কার বলতে এই সব অর্থের একটা সমন্বয়। এটি সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক শ্রম বাঁচানোর একটা পথ, বা একে বলা যায় snap-judgement-বা ঝটিকা-বিচার বা ঝটিকা-সিদ্ধান্ত। এই সংস্কার পক্ষে (pro) বা বিপক্ষে (anti) হতে পারে; দুটিই সমান ক্ষতিকর। মনোবিজ্ঞানীরা আরও দুটি শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেন এই প্রসঙ্গে ঃ (i) অবাস্তব চিন্তা (antisitic thinking) ও মানসিক আলস্য (mental laziness)। একবার যদি একটা বিশ্বাস/ধারণা/ভাবনা মনে গেঁথে যায়, তবে আর পুনর্ভাবনা বা পুনর্নিরীক্ষার কষ্ট স্বীকার না করে তাকে আঁকড়ে থাকার প্রবণতাই এই সংস্কার বা prejudice-এর জন্ম দেয়।

অবশ্য কিছু কিছু সংস্কার দৈনন্দিন জীবনে স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী। সারা পৃথিবীতে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে সংস্কার দেখা যায় না। এই সংস্কারের উৎস কোথায়? মনোবিজ্ঞানীরা এই সংস্কারের উদ্ভবের একাধিক উৎস নির্দেশ করেছেন। এই উৎস আবার দুরকম ঃ (১) নৈর্ব্যক্তিক এবং (২) ব্যক্তিকেন্দ্রিক। নৈর্ব্যক্তিক উৎস আবার একাধিক, যেমন — (১) সংঘ (group)-উৎস ঃ ব্যক্তি মানুষ তো সঙ্ঘের বা সমাজেরই অংশবিশেষ। সংঘ বৃহত্তর অর্থে সমস্ত পৃথিবী বোঝায় (তুলনীয় ঃ বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি)। সমাজের লালিত সংস্কার সহজেই এবং স্বভাবতঃই তার মধ্যে স্পর্শাবে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে সাধারণত বয়ঃকালের চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষের মধ্যে এটি ঘটে। (২) জাতিকেন্দ্রিকতা (ethnocentrism) ঃ এটি দেখা যায় সাধারণভাবে কোন জাতি বা মানবগোষ্ঠী অন্যের সাপেক্ষে নিজেকে বেশি বড়ো মনে করার প্রবণতায়। এই বোধকে গোষ্ঠী-উন্নাসিকতা বা group snobbery বলা যায়। (৩) অপরিচয় (unfamiliarity) ঃ দুই গোষ্ঠী, জাতি বা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুই ধর্মের মধ্যে অপরিচয় মানুষের মনে পরস্পরের প্রতি ভয়, ঘৃণা, অবিশ্বাসের জন্ম দেয়। যেমন ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে একটা সময়ে বিরাট ব্যবধান ছিল সম্পূর্ণ অপরিচয়ের জন্য। যেমন ভারতবাসীরা মাটিতে বসে খায়— যেটা ইংরেজদের কাছে রীতিমতো ব্যায়ামচর্চা, ভারতবাসীরা হাত দিয়ে খায়— ইংরাজরা এটাকে অসভ্যতা মনে করত; ঢেকুর তোলা ইরেজদের কাছে রীতিমতো অভব্যতা, আর ভারতীয়দের ক্ষেত্রে এটা ভদ্রতাবিরুদ্ধ নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে নিমন্ত্রণকারীর পরিবেশিত খাবারের উৎকর্ষের স্বীকৃতি হিসাবে গণ্য হয়। আবার একত্রে খাবার সময় চুপ করে থাকা ভারতীয়দের কাছে ভব্যতাবিরুদ্ধ না হলেই ইংরেজদের কাছে তা-ই। আসলে ভারতীয়দের কাছে 'খাওয়া' ব্যাপারটা ব্যক্তিগত আর পাশ্চাত্যে এটি সামাজিক। ফলে যে পার্থক্য বোধের সংস্কার দুই পক্ষে জন্ম নেয় তার মধ্যে ইংরেজদের মনে আসে ভারতীয়দের প্রতি তাচ্ছিল্যবোধ আর ভারতীয়দের মনে একটা মিশ্র মনোভাব। ইংরেজরা শাসক অর্থাৎ রাজার জাত— এ থেকে আসে একটা হীনম্মন্যতাবোধ, আর সেই হীনম্মন্যতাবোধ স্বাজাত্যবোধ তথা উগ্র জাতীয়তাবোধ, দূরে থাকবার প্রবণতা ইত্যাদির সঙ্গে মিশে স্থির করে যে ইংরেজ ম্লেচ্ছ। রাজার জাত বলে অস্পৃশ্য ঘোষণা করা

যায় না, তাই 'জলচল নয়' ঘোষণা করা হয়। এমনকি তাদের দেশে খাওয়াও নিষিদ্ধ। গেলে গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। এখানে আমরা পরিষ্কার দেখলাম সংস্কার কীভাবে কুসংস্কারে পরিণত হয়। তাই সংস্কার ও কুসংস্কারের মধ্যে আমরা একটা পার্থক্য নির্দেশ করতে পারি এইভাবে ঃ সংস্কার নির্দেশ করা কঠিন, কিন্তু দূর করা অপেক্ষাকৃত সহজ; আর কুসংস্কার নির্দেশ করা সহজ, কিন্তু দূর করা খুবই কঠিন। আরও কঠিন হয় এই কারণে যে কুসংস্কারকে ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে তাকে একেবারে ধর্মধ্বজী ও মৌলবাদীদের আওতায় নিয়ে ফেলা হয়। (৪) আর্থিক কারণ ঃ গেরহার্ট সীঙ্গার (Gerhart saenger) লিখেছেন, "জাতপাতের উঁচুনীচুর ধারণাটা শুধু যে শোষকের বিবেকের উপর প্রলেপ দিয়ে রাখে তা নয়, এটি সংখ্যাগুরু অংশের পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক চাহিদা মিটাতেও দরকার হয়ে পড়ে।" এ আজকের কথা নয়। আমাদের দেশের আর্য-অনার্যের যুদ্ধ এবং তার ফলশ্রুতি চতুর্বর্ণ প্রথা, আমেরিকার তুলো চাষের জন্য নিগ্রো ক্রীতদাসদের নিয়োগের বিষয়, দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের এক সময়ের বিশ্বাস যে কৃষ্ণাঙ্গরা প্রশাসনিক কাজের বা বিশেষ দক্ষতার কাজের অযোগ্য—এগুলো থেকেই আর্থিক কারণটা অনুভূত হয়।

আরেক ধরনের কারণ হচ্ছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক কারণ। অবশ্য ব্যক্তি আর গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য করা অত সহজ নয়। ব্যক্তি গোষ্ঠী থেকে যেমন গ্রহণ করে, তেমনি সে গোষ্ঠীকে দেয়ও তো কিছু! সব দিক বিচার করলে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে— কিছু সংস্কার মানুষ গোষ্ঠী থেকে সংগ্রহ করে, আর কিছু জন্ম নেয় ব্যক্তির নিজস্ব মানসিক প্রক্রিয়ায়। যে মানসিক চিন্তা-প্রক্রিয়াকে কখনো কখনো গতিবিজ্ঞান-প্রক্রিয়াসমূহ (dynamisms) বলা হয়। গতিবিজ্ঞান-প্রক্রিয়া হচ্ছে বিশেষ চিন্তা-প্রক্রিয়া, যার আছে বাধ্য করার ক্ষমতা। অর্থাৎ এটি হচ্ছে কার্যে-উপচে-পড়া চিন্তা। কাজেই দেখা যাচ্ছে গতিবিজ্ঞান-প্রক্রিয়া হল সংস্কারের কারণ; এটি পূর্বে বর্ণিত সামাজিক কারণের বিপরীত। এই গতিবিজ্ঞান প্রক্রিয়ার আবার রকমফের আছে, যেমন ঃ

(ক) নৈরাশ্য-আক্রমণ প্রকল্প (frustration aggression hypothesis) : এই প্রকল্প বলে যে নৈরাশ্য মাত্রেই আক্রমণ সৃষ্টি করে।

(খ) নির্বাধ ভাসমান আক্রমণ (free floating aggression) : নৈরাশ্য দূর করার সাধারণ উপায় হচ্ছে উন্নতির পথে বাধাগুলি দূর করে দেওয়া। কিন্তু যখন নানাবিধ কারণে এই বাধা দূরীকরণের পথে বাধা আসে তখনই এটি ঘটে। আক্রমণ স্পৃহা বা ক্রোধ স্বাভাবিক নির্গমনের পথ না পেলে অন্যভাবে প্রকাশ পায়। একটি উদাহরণ ঃ অফিসের বড়োসাহেব ছোটো সাহেবকে ধমকালেন; ছোটোসাহেব ধমকালেন বড়োবাবুকে, বড়োবাবু ধমকালেন কনিষ্ঠ কেরানীকে; তিনি ধমকালেন বেয়ারাকে; বেয়ারা বাড়ি গিয়ে ধমকালেন তাঁর স্ত্রীকে; স্ত্রী ধমকালেন ছেলেকে আর ছেলে তার পোষা বেড়ালটাকে মারল লাথি। আজকের প্রতিযোগিতার যুগে নৈরাশ্যগ্রস্ততা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এর মূল কারণ অস্পষ্ট ও দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এ ধরনের সংস্কার দূরীকরণের ক্ষেত্রে সঠিক ধাপটি নেওয়া সম্ভব হয় না। সমাজ সাধারণতঃ নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে এ ধরনের ব্যবহার সহ্য করনেনা, কিন্তু অন্য গোষ্ঠীর প্রতি এ ধরনের ব্যবহারে তারা দোষ দেখে না। একে তাই 'ঠোকরানোর তত্ত্ব' (peckingtheory) ও বলা যায়।

অবশ্য এই নৈরাশ্য-আক্রমণ প্রকল্পকে সর্বাত্মকভাবে গ্রহণ করা সমীচীন নয়। কারণ এটি সবক্ষেত্রে খাটে না। ধরা যাক 'x' নৈরাশ্যবশত নিজের অকৃতিত্বের জন্য 'y' ও 'z' -কে দায়ী করে থাকে। মনে মনে সে জানে যে মূলতঃ দায়ী হচ্ছে y; কিন্তু z-ও তার অসন্তোষ উদ্রেক করে, যেহেতু z, y-এর বন্ধু। এখন 'x' যদি কোনও উপলক্ষ্যে y-কে উপেক্ষা/অপমান/ঘৃণা করার সুযোগ পায়, তাহলে

যে সন্তোষ লাভ করবে z-এর প্রতি অনুরূপ ব্যবহার করলে তা হবে না। এখানে আমরা মানুষের কথা বললাম, প্রেক্ষিতের বিভিন্নতায়-ও এ জিনিস ঘটতে পারে। জার্মানরা যুদ্ধে হেরে গিয়ে ইহুদীদের প্রতি অত্যাচারী হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় ইহুদীদের অত্যাচার করে যে আনন্দ তারা পেত, যুদ্ধে জয়ী হয়ে ইহুদীবিদ্বেষী হলে অনুরূপ অবস্থায় অন্য ধরনের আনন্দ পেত। হিন্দুদের মুসলমান-বিদ্বেষের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে। আর্যদের অনার্য-বিদ্বেষ অবশ্য অন্য ধরনের। শিক্ষাকে এ ধরনের সংস্কার নিয়ে কাজ করতে হলে তাই বিষয়টির মূলে যেতে হবে। খুবই সংবেদনশীল বিষয় এটি।

এই প্রসঙ্গে আরও দুটি কথা এসে পড়ে — (১) উপলক্ষ-নির্দেশন (scape goating) এবং (২) অভিক্ষেপণ (projection)। প্রথমটি স্বব্যাখ্যাত। নিজের পাপ, অকৃতি, দুরবস্থা ইত্যাদির জন্য অন্যকে দায়ী করা। জি-ডব্লু-অল্‌পোর্ট (G. W. Allport) তাঁর 'দি নেচার অব্ প্রেজুডিস্' বইয়ে All-duty scapegoat (সর্বক্ষেত্রোপলক্ষ) বলে একটা কথা ব্যবহার করেছেন। অনেক ক্ষেত্রেই কোন ধর্মীয়, জাতিপাত বা সম্প্রদায়গত একটি গোষ্ঠীর উপর সব দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন লালিত হওয়ার ফলে এ ধরনের সংস্কার গভীরে প্রোথিত কুসংস্কার হয়ে দাঁড়ায়। আমেরিকানদের নিগ্রোবিদ্বেষ, জার্মানদের ইহুদী-বিদ্বেষ ও হিন্দুদের মুসলমান-বিদ্বেষ ক্রমবর্ধমান আক্রমণাত্মক সংস্কার।

অভিক্ষেপণ সংস্কার/কুসংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাশৈলী (mechanism)। এটি আসে ঈর্ষা (jealousy) বা দ্বেষ (envy) থেকে। একদল যখন কোন বিশেষ সুবিধা ভোগ করে, আর অন্যরা তা থেকে বঞ্চিত হয়, তখনই ঈর্ষা সৃষ্ট হয়। উৎকর্ষ বা যোগ্যতার প্রশ্ন বিবেচনায় না এনে তথাকথিত বঞ্চিতরা প্রথমোক্তদের উপর বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিপজ্জনক অবস্থানে নিযুক্ত সৈনিকরা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে কর্তব্যরত সৈনিকদের উপর বিদ্বেষী হয়ে পড়ে। কিন্তু এটা তো পরিষ্কার যে এতে সংশ্লিষ্ট সৈনিকদের কোন হাত ছিল না। তাই বিদ্বেষীরা একটা অপরাধবোধে ভোগে, আর তা থেকে মুক্ত হতে গিয়ে এরা তাদের অপরাধবোধকে বিদ্বিষ্টদের উপর অভিক্ষেপিত করে। এভাবেই সে অপরাধবোধ থেকে মুক্ত হতে চায়। যেমন অসমবাসীরা ৬০ বা তার পরবর্তী বাঙালবিদ্বেষী আন্দোলনের সময় ভাবত যে বাঙালিরা আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট করছে। এটা 'আমি বাঙালিদের ব্যবসা বন্ধ করতে চাই'—ধারণার অভিক্ষেপিত চিন্তা-রূপ।

আরেকটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিষয় হচ্ছে লিঙ্গ-বৈষম্য। আগে যে ঈর্ষার কথা বলা হল এই বিষম লিঙ্গের ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে প্রকট। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে প্রতীচ্য থেকে প্রাচীতে মানুষ সেক্স-এর ব্যাপারে অনেক বেশি স্বাধীন ও মুক্তমনা। পাশ্চাত্যের মানুষের একসময়কার সুলতানের অন্তঃপুর নিয়ে একটা ঈর্ষার ভাব ছিল। আবার মুসলমানেরা একাধিক বিয়ে করতে পারে— এটি হিন্দুদের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করত বা করে। পাশ্চাত্যে বিবাহবিচ্ছেদ সহজ—এটি আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রাচ্যের মানুষের কাছে ঈর্ষণীয়। আমাদের হিন্দু সমাজের এক সময়ের কুলীনরা যেমন একসময় ঈর্ষার বস্তু হয়ে ছিল। এ তো গেল একদিক। আরেকটা দিক এই যে, নিগ্রোদের পৌরুষ ঈর্ষার বস্তু। আর্য অনার্যদের ক্ষেত্রে, গ্রাম-শহরের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন জাত বা সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পৌরুষের অভিব্যক্তি নিয়ে নানা বিশ্বাস আছে। পুরাণের যুগ থেকে এজন্য নানাধরনের ব্যভিচারের কাহিনী প্রচলিত। এই ব্যভিচার রোখার জন্যই একদল উপর স্তরের মানুষ বিধিনিষেধ আরোপ করে— পরে তা কুসংস্কার হয়ে দাঁড়ায়।

তৃতীয় আরেকটা দিক আছে। মেয়েদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পুরুষরা তাদের অত্যাচার করেছে। মেয়েদের সতীত্ব নিয়ে পুরুষদের বড়ো বেশি চিন্তা নানা ধরনের সামাজিক কুসংস্কারের জন্ম দিয়েছে। নাইটরা যত মানবদরদীই হোক নিজের স্ত্রীদের সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাদের লোহার জাঙ্গিয়া পরিয়ে যেত। সারা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়ের নানা তথ্য পাওয়া যায়। স্ত্রী জাতিকে

সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে আমাদের দেশে যেমন সতীদাহ প্রথা এসেছিল তেমনি পুরুষের প্রতি বিশ্বস্ততার প্রমাণ হিসাবে ফ্যারাওদের সমাধিতে হারেমভর্তি স্ত্রীদের কবর দেওয়া হত। সেই যে ইতিহাস বলছে, সমাজবদ্ধ জীব যেদিন সম্পত্তি তৈরি করতে শিখল, প্রথম সম্পত্তি হল তার স্ত্রী আর কোনও মহিলা যে বিবাহিত তা বোঝাবার জন্য তীরের ফলা দিয়ে মাথার সিঁথি চিরে ক্ষত করা হত আর স্ত্রীকে যেমন ইচ্ছা ব্যবহারের অধিকারও জন্মাত। বেশি সন্তান হলে সম্পত্তি রক্ষায় সুবিধা তাই স্ত্রী হত সন্তান-উৎপাদনের যন্ত্র আর যত স্ত্রী তত সন্তান (অবশ্যই পুত্রসন্তান বেশি পছন্দের) স্ত্রীর প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহারের উদাহরণ ম্যাক্সিম গোর্কির উপন্যাস (মা, পৃথিবীর পাঠশালায় ইত্যাদি) বা পল বার্কের উপন্যাস-এ চিত্রিত হয়েছে; আমাদের রামায়ণ, মহাভারত তো আছেই। অতীতের সংস্কার আজও বয়ে চলেছে বিবাহিতা মেয়েদের সিঁদুর পরা বা লোহা (নোয়া) বা গয়না পরা (যা বন্ধনের উপকরণ লোহার বেড়ির নামান্তর)-র মধ্য দিয়ে। এভাবেই সংস্কার কুসংস্কারে পরিণত হয়।

অত্যাচার যখন নিজেদের এবং অত্যাচারিতের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার পথ খুঁজে পায়, তখনই সে অত্যাচারের পিছনে নৈতিক সমর্থন খুঁজে বার করার জন্য সচেষ্ট হয়। এই পার্থক্যকেই মনস্তাত্ত্বিকরা বলেছেন দৃশ্যমানতা (visibility)। আর এটি খুঁজে পেলেই অত্যাচার ভিন্নভাবে প্রকট হয় এবং ফলে কুসংস্কার দৃঢ় ভিত্তি পায়। একে বলে 'শিকার করণ' (victimisation)।

এবার দেখা যাক, শিক্ষকরা কীভাবে এই সংস্কার বা কুসংস্কার দূর করার ক্ষেত্রে কাজ করতে পারেন। আমরা আগেই বলেছি যে কুসংস্কার চিহ্নিত করা সহজ, কিন্তু দূর করা কঠিন। এর একটা কারণ কুসংস্কারের সঙ্গে ধর্মীয় আবেগ, বিশ্বাস বা অনুভূতি (sentiment) জড়িত থাকে। সংস্কার অনেক সময় বোঝা কঠিন কিন্তু তা দূর করা সহজ। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। অজ্ঞতা বা অপরিচয় আমাদের দেশে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে একটা দূরত্ব রচনা করেছে। এই অপরিচয়ের সংস্কার জলচলবিহীনতারূপ কুসংস্কারের সৃষ্টি করেছে। অনেক শিক্ষিত মানুষের মনে হয়ত শেষোক্ত কুসংস্কার নেই, কিন্তু অপরিচয় বা অজ্ঞতাজনিত সংস্কার রয়ে গেছে। যেমন অনেক শিক্ষিত লোকও হয়তো বলে বসেন, 'ও! উনি মুসলমান, আমি ভেবেছিলাম বাঙালি।' এই সংস্কার সামান্য অবধানতা দিয়েই কাটিয়ে দেওয়া যায়। জাত ও জাতির পার্থক্য একটু বুঝিয়ে দিলেই হল। শিক্ষকরা সহজেই এই ধারণা ছাত্রদের দিতে পারেন। শিক্ষকদের জেনে রাখা দরকার কী কী ধরণের সংস্কারে আমরা ভুগি; কী কী ধরণের সংস্কার অপনোদিত করা প্রয়োজন। সংবিধান পড়াবার সময়, যখনই জাতি কথাটা আসবে তখনই এই ধারণা দিয়ে দেওয়া দরকার। যখন পড়াতে হবে নজরুলের 'জাতের নামে বজ্জাতি' বা 'এক জাতি এক প্রাণ একতা' বা 'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষ জাতি' বা এই জাতীয় কোনো কিছু পাঠনের ক্ষেত্রে জাত/জাতি এসে যাবেই। এই প্রসঙ্গেই চলে যাওয়া যায় জাতিবিদ্বেষ-জাতীয় কুসংস্কারে। কাজি নজরুলের কবিতা 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতার পঙ্‌ক্তি, 'কাণ্ডারী, আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতেরে করিবে ত্রাণ' একটি অসাধারণ উক্তি। এর সাহায্যে শিক্ষক অনেক দূর পর্যন্ত আলোচনায় চলে যেতে পারেন।

শিক্ষককে উপলক্ষ্য খুঁজে নিতে হবে। কিন্তু উপলক্ষ্যকে হতে হবে স্বতঃস্ফূর্ত, কোনোমতেই যেন এটা কষ্টকল্পিত মনে না হয়, জোর করে টেনে আনলে মাধুর্য নষ্ট হবার ভয় থাকে। রক্ত পড়াতে গিয়ে, রক্তের শ্রেণিবিভাগ পড়াতে গিয়ে অনেক আবেগতাড়িত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় মানুষে মানুষ বিভেদীকরণের বিরুদ্ধে।

ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করার প্রকৃষ্টতম উপায় ধর্মের তাৎপর্য বাস্তবে বোঝানো যে ধর্মের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্য ধর্ম; ধর্ম কথাটা এসেছে 'ধৃ' ধাতু থেকে — যা ধারণ করে তা-ই ধর্ম। ধারণ করে

কোথায়? জ্ঞান, বুদ্ধি, উপলব্ধির এক সুউন্নত স্তরে। সব ধর্মই যে এক-প্রথমতঃ এই বোধটা মনে ঢোকানো দরকার। প্রকৃত ধর্ম যে মানুষকে ঘিরে— আর ধর্মের প্রাথমিক রূপ যে নীতিবোধ, এটাই ধর্মীয় বিদ্বেষ দূরীকরণের মহামন্ত্র। কন্‌ফ্যুসিয়াস যেমন বুঝিয়েছিলেন নিজের অবস্থানের উপরে উঠে বৃহত্তর কিছুর জন্য সামর্থ্যমতো কাজ করাই ধর্মাচরণ। ডব্লু ব্যারো লিখেছেন, 'Religion is equally the basis of private and public faith; of the happiness of the individual and the prosperity of the nation.' এই দুই মতবাদে কোনও পার্থক্য নেই। আবার রবীন্দ্রনাথ যখন গেয়ে ওঠেন, 'মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, / মুক্তি কোথায় আছে।/ আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন পরে বাঁধা সবার কাছে।/ রাখো রে ধ্যান, থাক্ রে ফুলের ডালি, / ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধুলাবালি, /কর্মযোগে তার সাথে এক হয়ে/ ঘর্ম পড়ুক ঝরে।" তখনও তো এই একই কথা— কর্ম আর ধর্মাচরণে কোনও ফারাক নেই। আর কর্ম মানে তো মঙ্গলকর কর্ম, তাবৎ জীবের জন্য যা শুভঙ্কর। এর সঙ্গে যদি মিলিয়ে নেওয়া হয় বিবেকানন্দের কথা, 'ধর্ম মানে শুধু মতবাদ নয়, ধর্ম মানে সাধনা। সৎ হওয়া আর সৎকর্ম করা— এই দুয়ের মধ্যেই সমগ্র ধর্ম।' তবে স্পষ্ট হয় যে ধর্মের মূল কথা মানুষ আর ধর্ম মানুষকেই আশ্রয় করে বিকশিত হয়। আর এই ধর্মাচরণের চরমতম প্রকাশ শ্রীরামকৃষ্ণের কথা, 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' পাঠনের সময় বিভিন্ন সুযোগে শিক্ষকদের পবিত্র কর্তব্য ধর্মীয় অন্ধকারের বিরুদ্ধে প্রচার করা। বলাই বাহুল্য যে এটা যে প্রচার তা যেন বোঝানো যায়।

এখানে একটা তথ্য দেওয়া ভালো। চলচ্চিত্র উৎসবের বিচারের ক্ষেত্রে একটা নিয়ম হল এই যে, শিশু চলচ্চিত্রে যেন কোন 'স্লোগান' না থাকে। এমন কী, সার্থক শিশু চলচ্চিত্র হিসাবে সত্যজিৎ রায়ের ছবি 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' পুরস্কৃত হয়নি এই যুক্তিতে যে ছবিটিতে যুদ্ধবিরোধী প্রচার ছিল (অবশ্য সেই উৎসবে ছবিটি সঙ্গীতের জন্য পুরস্কৃত হয়েছিল)। এ ব্যাপারটা শিক্ষকদের খেয়াল রাখতে হবে। আজকের প্রতিক্রিয়াশীল সমাজে সর্বত্রই ফ্যাসিজ্‌ম্ এর উঁকিঝুঁকি দেখা দিয়েছে ও দিচ্ছে। ফলে প্রকট প্রচার এক শ্রেণির মানুষকে ক্রুদ্ধ করে তুলতে পারে। ফলে এ ধরনের প্রচার সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের উপর সমাজের অংশবিশেষের অসন্তোষ উৎপন্ন করতে পারে, আর তা আঘাত হয়ে নামতে পারে। না, 'আঘাত আসুক নবনব, আঘাত খেয়ে অচল রব' শিক্ষকের শপথ হতে পারে না। তার কাজ অন্যভাবে। একবারে মূলে গিয়ে আঘাত করতে হবে। অস্ত্র তাঁর পাঠন। পাঠন শৈলীকে তাই বিশেষভাবে শানিত করে তুলতে হবে।

বর্তমানের শিক্ষণ-কারুর বিশেষজ্ঞরা পাঠক্রম তৈরির ক্ষেত্রে যেসব পন্থা-প্রক্রিয়া-পরিকল্পনা (approaches, methods and planning) উপস্থিত করেছেন, তার মধ্যে একটি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রবক্তা-পথিকৃৎ-বিশেষজ্ঞদের জীবন ও কাজের বিবরণ দিয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটি হবে ঃ motivating Iearners through life histories of scientists and their discoveries. শিক্ষকরা অনায়াসে মহান বিজ্ঞানীদের বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের এবং বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে তাঁদের মিথস্ক্রিয়ার বিবরণ দিতে পারেন— আর তাতে অনেক কথাই এসে পড়ে। উদাহরণ দেওয়া যাক ঃ তেজস্ক্রিয়তা ও রেডিয়াম/পোলেনিয়াম পড়াতে গিয়ে পিয়ের ক্যুরী ও মাদাম ক্যুরীর কথা আসবে। আসবে এই পরিবারকে নোবেল পরিবার বলা হয় সেকথাও। কারণটাও বলতে হবে স্বাভাবিক ভাবেই। এই পরিবারের মা (মাদাম মারিয়া শ্ক্লোদোভস্কা ক্যুরী) — মেয়ে (আইরিন জেলিও ক্যুরী), শ্বশুর (পিয়ের ক্যুরী)— জামাই (ফ্রেডরিক জেলিও ক্যুরী) নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। মাদাম ক্যুরী আবার পেয়েছিলেন দুবার। সেখানেও চমক— একবার পদার্থ বিদ্যায়, সেটা ১৯০৩ সালে পিয়ের ক্যুরি ও অঁরী বেকারেল-এর সঙ্গে যুগ্মভাবে, আর দ্বিতীয়বার ১৯১১ সালে এককভাবে রসায়নে।

এসবের সঙ্গে যে কথাটা আসতে পারে তা হল, তিনি মেয়েদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দেননি, দেননি কোনো ধর্মশিক্ষাও— নিজে যে ওসব গোঁড়ামিতে বিশ্বাস করতেন না। ছোট মেয়ে ইভ ক্যুরী তাঁর মায়ের অসাধারণ জীবন কথায় লিখেছেন যে মেয়েদের তিনি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে বড় হয়ে ধর্মের ব্যাপারে তারা যেন তাদের নিজের নিজের খুশিমতো কাজ করে।

আরও একটা বিষয় এই বরেণ্যা বিজ্ঞানীর (বলা ভালো বিজ্ঞান-দম্পতির) জীবন থেকে শেখার। আজ উচ্চশিক্ষিত ছেলেমেয়েরা বেশিরভাগই ভালোবেসে বিয়ে করে। আবার যেহেতু উচ্চশিক্ষিত, তাই সহজেই আসে ভুল বোঝাবুঝি, অশান্তি— যা অবশেষে দাম্পত্য জীবনকে অসহনীয় করে তোলে। অনেকটা ওই like charges repel— আর কী! কিন্তু এই যে ক্যুরী দম্পতি— এঁদের তো মনীষা একেবারে উচ্চতম পর্যায়ের। অথচ কী মধুর এঁদের দাম্পত্য জীবন! (এঁদের জন্ম তারিখ যথাক্রমে ১৫ মে, ১৮৫৯ ও ৭ নভেম্বর ১৮৭৬); দাম্পত্য জীবনের হিসাব মাত্র ১১ বছরের (বিয়ে হয় ১৮৯৫ এর ২৬ জুলাই, আর পিয়ের দুর্ঘটনায় মারা যান ১৯ এপ্রিল, ১৯০৬)। ইভ ক্যুরী মায়ের জীবনকথায় লিখেছেন যে, সারাক্ষণ স্ত্রীর পাশে থেকে এমনই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল তাঁর (পিয়েরের) যে অল্প সময়ের জন্য ও মারী সরে গেলে তাঁর (বৈজ্ঞানিক) চিন্তার স্রোতে বাধা পড়ত। কেন ব্যাখ্যা করা যাবে না, ১৯০৩ থেকেই মাদাম ক্যুরীর মনের চারদিকে মৃত্যুর ছায়া যেন ভয় দেখিয়ে বেড়াত। একদিনের ঘটনা ইভ ক্যুরীর লেখার অনুবাদে ঃ

'পিয়ের।!'

বিপদের আশঙ্কায় মারীর কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ। বিজ্ঞানী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

'কী হল? বল ডার্লিং বল, তোমার কী হয়েছে?'

'পিয়ের, আমাদের মধ্যে একজন কেউ যদি আগে যায়, অন্যজনে তাহলে কী নিয়ে বাঁচবে? আমরা তো একে অন্যকে ছাড়া বাঁচতে পারব না গো! পারব না! পিয়ের ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন। মারী— তাঁর প্রেয়সী নারীর মতো এ ধরনের কথায় নতুন করে যেন তাঁকে মনে করিয়ে দিল যে বিজ্ঞানীর সার্থকতা বিজ্ঞান-সাধনায়, এই সাধনা পরিত্যাগ করার কোনো অধিকার তাঁর নেই। আস্তে আস্তে তুলে ধরলেন মারীর বিষাদমাখা মুখটি, তাকালেন তাঁর চোখের দিকে, দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'তুমি ভুল করছ ডার্লিং। যাই ঘটুক না কেন, যদি আমাদের মধ্যে একজনকে জীবন্মৃত অবস্থায় বেঁচে থাকতে হয়, তবু তাকেই চালিয়ে যেতে হবে এই কাজ।'

আমরা জানি ঘটেছিল ঠিক তাই। নির্জীবপ্রায় মারী মেয়েদের মানুষ করেছেন, বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবা করেছেন, আর করে গেছেন আরব্ধ বিজ্ঞান সাধনা দুর্নিরীক্ষ্য চরিতার্থতার দিকে লক্ষ্য রেখে। আর সেই ১৯০৬-এর ২১শে এপ্রিল ঃ আবার ইভ ক্যুরির লেখায় ফিরে যাই। লিখছেন ইভ ঃ

শনিবার সকালে তোমায় শুইয়ে দিলাম আমরা, তখন তোমার মাথাটা ছিল আমারই হাতে। বরফশীতল তোমার মুখে এঁকে দিলাম শেষ চুম্বন। বাগান থেকে তুলে আনলাম গোটাকয়েক পেরিউইঙ্কল্ ফুল, আর তার সঙ্গে দিলাম আমার সেই ছবিটা—যেটা দেখে তুমি ভালোবেসে বলতে ঃ ছোট্ট লক্ষ্মী ছাত্রী। সেই ছবিটার তো তোমার সঙ্গে যাওয়াই উচিত, কারণ তার মালিককে কয়েকবার দেখেই তুমি এত খুশি হয়েছিলে যে তাকে জীবনসঙ্গিনী করে নিতে এতটুকু দ্বিধা করোনি। তুমি পরে অনেকবারই আমাকে বলেছ যে জীবনে সেই একবার মাত্র এতটুকু দ্বিধা না করে ঠিক কাজটা করছ এই বিশ্বাস নিয়ে আমার কাছে এসেছিলে। পিয়ের, আমার পিয়ের, আমার মনে হয় ভুল তুমি করোনি গো! আমরা দুজনই দুজনের জন্য নিজেদের তৈরি করেছিলাম। আমাদের মিলন ছিল চরম ইঙ্গিত। কী অপূর্ব এক মিলনের মহাকাব্য—হাসিতে গড়া কান্নায় ভেজা। ওগো আধুনিক যুগের প্রেমিক-প্রেমিকা একবার ভাবো।

আজকের ধাত্রীবিদ্যাবিশেষজ্ঞরা মাতৃদুগ্ধের শ্রেষ্ঠত্বের কথা প্রচার করেন। তাঁরাও ভাবতে পারেন এই মাদাম মারিয়ার কথা ছাত্রদের এবং রোগিণীদের কাছে পৌঁছে দিতে। মাদাম ক্যুরী আইরিনের দেড় বছর বয়স পর্যন্ত বুকের দুধ খাইয়েছেন। তাঁর লেখা একটা চিঠি এরকম ঃ আমার খুদে রাজরানীকে আমি এখনও ভরপেট দুধ দিতে পারি (আইরিন জন্মাবার আগে মাদামের শরীর খুবই খারাপ হয়েছিল— মাথা ঘুরত, সহজেই ক্লান্তি আসত আর বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে ছিলেন।) কিন্তু ভয় হচ্ছে যে বেশিদিন বোধ হয় আর পারব না। সপ্তাহ তিনেক আগে ওর ওজন কমে যায়; ওকে অসুস্থ, খিন্‌খিনে ও নির্জীব মনে হচ্ছিল। সে ভাবটা দিনকয় হল কেটে গেছে। ওজন যদি ঠিকমতো বাড়ে তবে আমি ওকে খাইয়ে যাব।" অতিরিক্ত ফিগার-সচেতন মায়েরা ভেবে দেখবেন।

আজকের মা-বাবারা অফিসে বা অন্যত্র কাজ করেন বলে ছেলেমেয়ের দেখভাল করতে পারেন না। ধাত্রী বা নার্সের কাছেই তারা মানুষ হয়। কিন্তু তাতে যে তাদের সম্যক বিকাশ হয় না, বা অনেক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। এই যে বিদেশে স্কুল ছাত্র বেপরোয়া বন্দুক চালাচ্ছে বা অন্যান্য গর্হিত অপরাধ করে বসছে—তার পিছনে একমাত্র না হলেও অন্যতম কারণ যে মা-বাবার সাহচর্য, অভিভাবকত্ব, নির্দেশ না পাওয়া, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মা-বাবারা প্রত্যক্ষভাবে এসব দিতে না পারার খামতিটা পুষিয়ে দিতে চান উপহার ইত্যাদির অনাবশ্যক সম্ভারে। সেক্ষেত্রেও মাদাম ক্যুরী আদর্শস্থানীয়া। আইরিনের ছবছর পরে জন্মায় তার দ্বিতীয় মেয়ে ইভ। শরীর খারাপ, শ্বাশুড়ি অসুস্থ, অর্থের প্রাচুর্য অনুপস্থিত, শ্রমসাধ্য গবেষণার কাজ (মারীর কাজ ছেলেদেরই উপযুক্ত ছিল)— অথচ মেয়েদের জন্য ধাত্রী রাখেননি। পিয়ের একবার বলেছিলেন, 'বাচ্চা ছাড়া তোমার আর কোন চিন্তাভাবনা নেই দেখছি। মেয়েদের সস্তা ছিটের জামা পরিয়েছেন, কিন্তু সমুদ্রতীরে তাদের নিয়ে খেলেছেনও। বাচ্চাকে স্নান করানো, জামা বদলানো— সব তিনি নিজের হাতে করতেন। তাঁর ডায়েরীতে দেখা গেছে বাচ্চাদের সব খুঁটিনাটি লিখে রেখেছেন—কবে তারা বসতে শিখল, কবে দাঁত উঠল, কবে প্রথম কথা বলল। আইরিনের যখন পড়াশোনা শুরুর সময় এল, এক অসাধারণ কাজ করলেন মারী। তাঁর সমপর্যায়ের অধ্যাপকদের সঙ্গে কথা বললেন। এঁদের মধ্যে একাধিক নোবেলবিজয়ী আছেন। এঁরাও তো সব পিতামাতা। তাঁরাই সবাইকে পড়াতে লাগলেন। জনা দশেক বাচ্চা এক বিশ্বখ্যাত অধ্যাপকের কাছে একদিন রসায়নের তালিম নেয়, তো অন্য দিন নোবেল বিজয়ীর কাছে পদার্থবিদ্যা শিখছে; আবার ডাকসাইটে গণিতের অধ্যাপক তাদের গণিত শেখাচ্ছেন। এ এক এলাহি ব্যাপার। পৃথিবীর যে কোনও বিদ্বজ্জনসভা যাদের নিজস্ব বিষয়ের উপর বক্তৃতা শোনাকে দুর্লভ সৌভাগ্য মনে করবে তাদের কাছে এই ক্ষুদেরা শিখত মাটির কাজ, ছবি আঁকা ইত্যদি। ভাবা যায়! এই দশজন বাচ্চার মধ্যে অনেকে ভবিষ্যতে বিজ্ঞানী হিসাবে বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। আইরিন তো নোবেল বিজয় করেছিলেন। মাদাম কুরী তো এদের পদার্থ বিদ্যা শেখাবার জন্য নিত্যনূতন পাঠ পরিকল্পনা (lesson plan) তৈরি করতেন। সহজ থেকে সহজতর পরীক্ষার কথা ভেবেছেন। রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে— তিনি ক্লাস ফোরের ছাত্রদের কীট্‌স্ পড়িয়েছিলেন। মাদামের পড়ানোর একটা উদাহরণ ঃ একটি গরম জল ভরা পাত্র নিলেন। প্রশ্ন করলেন, 'বলো তো একে গরম রাখতে কী করা উচিত?' ক্ষুদেগুলি নিজেদের বুদ্ধিমতো সব মত দিল বেশ গম্ভীর ভাবে বা অত্যুৎসাহে। কেউ বলল, 'পশম দিয়ে জড়িয়ে রাখতে হবে'। আরেকজন বলল, 'কাছের থেকে সব জিনিস সরিয়ে রাখতে হবে' (তাপ সঞ্চালন শিখেছে যে!) ইত্যাদি। মাদাম বললেন, 'বেশ, আমি কী করতাম জানো? প্রথমেই ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিতাম'; আর বলেই ঢেকে দিলেন পাত্রটা।

আচ্ছা স্কুলের বরিষ্ঠ শিক্ষকেরা একেবারে নীচের ক্লাসে একটু পড়ান না কেন? দেখুন না চেষ্টা করে। এর জন্য একাধিক স্কুলের মধ্যে একটা মিলিত কর্মসূচী করলে তো ভালোই হয়। হয় না?

কত সহজে শেখানো যায় যে অনেক সংস্কার, আসলে সংস্কার নয়— কুসংস্কার তো নয়ই, বরং এর পিছনে একটা বৈজ্ঞানিক সুচেতনা থাকে। তবে মা-মাসীমা-দিদিমা-ঠাকুমারা বিশ্বাস হিসাবে চেতনায় এমনভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছেন, যে এগুলো সংস্কারপ্রতিম হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে শিক্ষকদের উচিত এর বৈজ্ঞানিক দিকটা তুলে ধরা। নীচে আমরা কিছু উদাহরণ দিলাম। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অনেক সময় স্বব্যাখ্যাত।

(১) অন্ধকারে খাওয়া মানা; খেলে নাকি পেত্নী সঙ্গে খায়।

(২) মাটিতে বসে প্রস্রাব করলে ব্রাহ্মণদের পৈতে কানে জড়াতে হয়; নয় তো মরলে ব্রহ্মদৈত্য হতে হয়।

(৩) মন্দিরে জুতো পায়ে ঢোকা বারণ।

(৪) খাওয়ার সময় (অর্থাৎ মুখে খাবার নিয়ে) কথা বলতে নেই। বোঝাই যাচ্ছে যে তখন বিষম খাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(৫) মাসিকের (মেয়েদের) সময় পুজোর জোগাড় করতে নেই। ওই সময় উঁচু হয়ে বসাটা ঠিক নয়— বোঝাই যাচ্ছে।

(৬) বটি দাঁড় করিয়ে রাখতে নেই, শুইয়ে রাখতে হয়।

(৭) শাঁখ বাজাবার আগে তার মধ্যে জল ঢেলে নিতে হয়।

আরেকটা মস্ত ব্যাপার আছে। অতীতে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে অন্ধকারই ছিল একটা সমস্যা। এখনও আছে।— গর্ত, সাপখোপ, চোর-ছ্যাঁচোর প্রভৃতির কত উপদ্রব রাত্রিবেলায়! এর বিরুদ্ধে যে সাবধানতা নেওয়ার ন্যূনতম প্রয়োজন তা হচ্ছে বাতি সঙ্গে নিয়ে যাওয়া। এই সাবধানতাকে নিয়ম করার জন্যই ভূতের ভয় আমদানী করা হয়েছে। আর এই ভূতের ভয় ব্যাপারটা এমনভাবে দেশকালের গণ্ডীকে ছাপিয়ে গেছে যে এর সঙ্গে তুলনা করা চলে কচুরী পানার। একজন ভদ্রলোক নাকি লাটিন আমেরিকায় কচুরী পানা দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁর বাড়ির চৌবাচ্চায় ফুল ফুটিয়েছিলেন। আজ সারা দেশেই কচুরীপানা একটা বিরক্তিকর ও বিপজ্জনক উৎপাত।

গাছপূজা, পশু বিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্বও সংস্কারের মধ্যে পড়ে। বিড়াল ষষ্ঠীর বাহন, অতএব অবধ্য; কুকুর মহাপ্রস্থানের পথে পাণ্ডবদের পথপ্রদর্শক, অতএব ভালোবাসার জিনিস; ইঁদুর গণেশের বাহন; লক্ষ্মী প্যাঁচা শুভঙ্কর ইত্যাদি। এ হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে সহযোগিতা ও মিথোজীবিতার প্রকাশ। আগেই বলেছি যে সংস্কার চিন্তাকে বিশ্রাম দেয়। তাই বিষয়টাকে বোধের মধ্যে ঢুকিয়ে ধর্মীয় স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শাস্ত্রের কথা 'আস্তম্ব ব্রহ্মপর্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু' উক্তির মধ্যে এই বিশ্বাসের কথাই ধরা হয়েছে। শুধু আমাদের দেশে বা শাস্ত্রে নয়। বিশ্বের সর্বত্রই এই বিশ্বাসের আবহ তৈরি হয়েছে। এস্-টি-কোলরিজ্ যখন লেখেন ঃ 'He prayeth best who loveth best / All things both great and small, / For the dear god who made us / He made and loveth all." বা ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ লেখেন ঃ "Turn turn thy hasty foot aside, / Nor cronshlhal helpless worm. / The little creature your wayward looks devide / Required a God to farm", তখনও কিন্তু সেই প্রকৃতি প্রেমের কথা, সর্বজীবে করুণার কথা, সর্বোপরি মানুষ— প্রকৃতির পারস্পরিক সহযোগিতার কথাই কিন্তু বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ ও বনমহোৎসবের সূচনা করেন, তখন অনেকে বক্রোক্তি করেছিলেন। কিন্তু আজকের পরিবেশ-সচেতনতার যুগে এর গুরুত্ব সহজেই অনুধাবনীয়। শিক্ষকদের উচিত ছাত্রদের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করা। অনেক কাজ হয় এতে।

অভিভাবক-শিক্ষক সহযোগিতা

—সুরেশ চন্দ্র আচার্য্য (১৯৬৩—৬৪)

[স্বাধীন ভারতের শিক্ষাসংকটের পটভূমিকায় অভিভাবক-শিক্ষক সহযোগিতার সমস্যাটি লেখক বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাহার মতে বর্তমান নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির নিরসনকল্পে প্রয়োজন এই দুই পক্ষের সম্প্রীতিপুষ্ট ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা। তিনি সহযোগিতা লাভের কার্যকরী উপায় নির্দিষ্ট করিয়াছেন ও সেই সঙ্গে প্রত্যাশিত সুফলের ইঙ্গিত করিয়াছেন। যুক্তিপূর্ণ, গঠনমূলক আলোচনার দ্বারা অভিভাবক-শিক্ষক সমস্যাটির একটি বাস্তবরূপ প্রদান করিয়াছেন।]

স্বাধীন ভারতের শিক্ষা সংকট

স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ভারত তার গণতান্ত্রিক চেতনাদর্শটিকে সার্বিক ও সার্বজনীন ভাবে উপলব্ধি করার জন্য শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণে মন দিল। পর পর তিনটি পাঁচশালা পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের একটা বিরাট অংশ এই জন্যই ব্যয়িত হয়েছে। বিদ্যালয়ে ও বিদ্যার্থীর সংখ্যা প্রত্যাশিতভাবে বাড়লেও তার আসল প্রত্যাশার লক্ষ্য পথে কোথায় যেন একটা বিরাট ফাটল থেকে গেছে। কমিশনের পর কমিশন বসিয়েও তা কিছুতেই ভরাট করা যাচ্ছে না। চরম আশাবাদীর মনেও আজ তাই একটা সংশয় নৈরাশ্যের ছায়া এসে পড়েছে। শিক্ষক শিক্ষাবিদ কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবক সকলেই এই নৈরাশ্যের অন্ধকারে একে অপরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশে দোষারোপ করছেন।

অভিভাবক

অভিভাবকের ভাবনায় রীতিমতো নৈরাশ্যের ঝড়। নিজেদের জীবনের অপূর্ণ প্রত্যাশা ও বিশ্বাসগুলোকে ছেলেমেয়ের সম্ভাবনার ভেতর সম্পূর্ণ করে পাবার প্রবণতা পিতামাতার মনে স্বাভাবিক ভাবেই শাশ্বত। পুত্র কন্যারা সমাজে দশজনের মধ্যে একজন হয়ে সুখী সমৃদ্ধ সম্মানিত জীবন যাপন করুক এ ইচ্ছা পিতামাতার মধ্যে ঐকান্তিক। কিন্তু বাস্তব প্রয়োগক্ষেত্রে তাঁদের সামথহীনতা, অজ্ঞতা ও বিচক্ষণ বাস্তব প্রচেষ্টার ত্রুটির জন্য তাঁদের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় না; ফলে তাঁরা অসহিষ্ণু হয়ে শিক্ষক, শিক্ষায়তন ও শিক্ষা পদ্ধতির উপর আক্ষেপে ফেটে পড়েন।

আধুনিক শিক্ষার প্রকৃতি ও লক্ষ্য সম্বন্ধে তাঁদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই। তাই তাঁদের মতে শিক্ষা আজ ব্যবসায়ী পণ্যে পরিণত হয়েছে। শিক্ষকেরা সেই পণ্যের বিপণিক। শিক্ষার সংগে তাঁদের আর্থিক ছাড়া কোন আত্মিক যোগ নেই — শিক্ষার্থীর সংগেও না। তাই শিক্ষার্থীরা বৎসরান্তে বিদ্যালয় থেকে নিয়ে আসে "পড়ো বিদ্যার একখানা নিদর্শনী ছাড়পত্র' এবং ভগ্নোদ্যম ক্ষীণ কণ্ঠে পুঞ্জীভূত অসন্তোষ। সুতরাং মানুষ কই? — সুস্থ, প্রকৃতিস্থ আশাবাদী কর্মী মানুষ? আর আমাদের গণতান্ত্রিক স্বপ্ন?

শিক্ষক

শিক্ষকেরাও নীরব নেই। তাঁরা দশটা চারটার সামান্য পরিসরের মধ্যে জাতি ও জীবনের সাধ্য ও সাধনার যে চিত্র-চরিত্র তুলে ধরে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গড়ে তোলার জন্য অভিজ্ঞতার সঞ্চার ঘটাবার চেষ্টা করলেন তা বিদ্যালয়ের বাইরের প্রতিকূল পরিবেশে বিপরীত অভিজ্ঞতার অভিঘাতে নষ্ট

হয়ে গেল। এর জন্য দায়ী কে? শিক্ষক? শিক্ষার্থী? না — গৃহাবেষ্টন ও অভিভাবক? কিংবা আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের অস্থিরতা ও অসাম্য কি এর জন্য কম দায়ী? তাছাড়া যে পারিপার্শ্বিকের প্রতি মুহূর্তের অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর মনের পর্দায় অলক্ষিত ভাবে ছাপ ফেলে যায় তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া শিক্ষার্থীর জীবনে যেমন স্থায়ী তেমনি কার্য্যকরীও বটে। বিদ্যালয়ের প্রচেষ্টা তার তুল্য মূল্যে শুধু নিষ্প্রভ নয় অকিঞ্চিৎকরও বটে।

শিক্ষার্থী

অন্যদিকে অভিভাবক ও শিক্ষকের এই অপ্রীতিকর অবিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির বৈপরীত্য নানা ভাবে ছাত্র সমাজকে সামঞ্জস্যহীন বিকৃত বুদ্ধির দিকে ঠেলে দিয়েছে। না অভিভাবক — না শিক্ষক কারও উপরই তার পূর্ণ আস্থা নেই। অথচ বিদ্যালয়ে শিক্ষক — গৃহাবেষ্টনে অভিভাবক; স্ব স্ব ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই অপ্রতিহত শক্তির অধিকারী। অতএব বুদ্ধিমান ছাত্রছাত্রী মাত্রেই একের বিরুদ্ধে অন্যের বিরূপতাকে জাগিয়ে রেখে নিজের পথে নিশ্চিন্ত হয়ে চলতে স্বস্তি পায়।

অপর পক্ষে বর্তমান সমাজে শিক্ষকের বৃত্তি মর্য্যাদা উচ্চমানে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় শিক্ষকের পরামর্শ শিক্ষার্থীর কাছে শ্রদ্ধেয় বা গ্রহণীয় না হয়ে সহজে উপেক্ষণীয় হয়ে রয়েছে।

শিক্ষাদান ক্ষেত্রে শিক্ষকের দুরূহ কর্তব্য ও নব শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতাকে বিজ্ঞতা বলে চালিয়ে দেওয়ায় উৎসাহে অনেক সময় অসাধু অসতর্ক মন্তব্য করে গৃহাবেষ্টনের বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করে তোলেন অভিভাবকেরা। সেই বিযাক্ত বায়ু শিক্ষার্থীর প্রাণ বায়ুর সংগে বিমিশ্র হয়ে তার স্বাভাবিক শোষণ ক্ষমতাকে পঙ্গু করে দেয়। ফলে অনিচ্ছা ও আধা ইচ্ছায় সংগৃহীত অপরিণত ও অপূর্ণগঠিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান শিক্ষার্থীর জীবন পথে কোন গতি প্রেরণা সঞ্চার না করে তাকে অহেতুক উচ্ছৃঙ্খলতার নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়।

কর্তৃপক্ষ

শিক্ষাকর্তৃপক্ষও দেশের প্রয়োজন ও প্রকৃতির সংগে সংগতি রক্ষা করে শিক্ষাক্ষেত্রে নানা বৈদেশিক সিদ্ধান্ত ও দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করে কোন একটা নির্দিষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতির উপর ভর করে এগুতে পারছেন না।

অন্যান্য দেশের অগ্রগতির সঙ্গে সমানে পা ফেলে এগিয়ে চলার উৎসাহে পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁরা বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব আনবার চেষ্টায় তৎপরতা দেখালেও দেশ জোড়া অজ্ঞতার বাস্তব বিপুল চেহারাখানাকে তাঁরা কিছুতেই ছুঁতে পারছেন না। শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য বাধাগুলোকে দূর করার ক্ষেত্রে তাঁরা চরম ঔদাসীন্য দেখিয়ে থাকেন। তা না হলে আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলির নবায়ন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাধারণ অভিভাবকদের সহযোগিতাকে তাঁরা উপেক্ষা করবেন কেন? বিদ্যালয়গুলির পরিচালক মণ্ডলী শিক্ষক নিয়োগ এবং আর্থিক ব্যয় মঞ্জুর সংক্রান্ত বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে অনাগ্রহী। অভিভাবকদের সুযোগ সুবিধা, পরামর্শ ও সহযোগিতা সম্বন্ধে তাঁদের কোন আকর্ষন নেই। অভিভাবকেরাও তাই বিদ্যালয়ের শ্রী-সমৃদ্ধি ও স্বার্থ সম্বন্ধে নিস্পৃহ। ফলে বিদ্যালয়গুলি সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হতে হতে গণতান্ত্রিক কল্যাণ আদর্শ থেকে দিনে দিনে ভ্রষ্ট হচ্ছে।

এই নৈরাজ্যনক নৈরাজ্য থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য একান্ত ভাবেই কাম্য অভিভাবক শিক্ষকের সম্প্রতিপুষ্ট ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা।

আমাদের নব প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রকৃতি প্রয়োজন সম্বন্ধে অভিভাবকদের আগে শিক্ষা দেওয়া দরকার। কারণ আজও তাঁরা সনাতন শিক্ষা পদ্ধতির গতানুগতিক স্মৃতিটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে জড়িয়ে ধরে নবতর ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে নারাজ রয়েছেন অনেকে।

তাছাড়া বর্তমান শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর অন্তর পুরুষটিকে যথার্থভাবে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হলে যে উদ্দীপক পরিবেশের সমাবেশ ঘটানো প্রয়োজন তা অভিভাবকের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত নিতান্তই অসম্ভব।

এইজন্য বিদ্যায়তনের আয়োজন প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য-পদ্ধতি সম্বন্ধে অভিভাবকের ধারণা যেমন স্পষ্ট হওয়া দরকার তেমনি শিক্ষার্থীর বংশগতি ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব সম্বন্ধে শিক্ষকের ধারণা যত নিখুঁত হবে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও চরিত্র গঠন তত অল্পায়াসসাধ্য ও কার্য্যকরী হবে।

এক কথায় আমাদের বিদ্যায়তন ও গৃহনিকেতনের পরিবেশগত ব্যবধান না ঘুচলে বৈজ্ঞানিক মনস্তাত্ত্বিক উপায় অবলম্বনেও আমাদের শিক্ষার উদিষ্ট লক্ষ্যে অগ্রগতি নেই। কিন্তু অভিভাবক ও শিক্ষকের পারস্পরিক প্রীতিপুষ্ট সহযোগিতার দ্বারা অচিরেই বিদ্যালয় ও গৃহ পরস্পর পরস্পরের সম্পূরক বা পরিপূরক হয়ে উঠতে পারে।

জাতিগত উন্নতির প্রেরণার চাইতে ব্যক্তিগত স্বার্থের উৎসাহ ও উন্মাদনা অনেক বেশী। সন্তান সন্ততির বর্তমান শিক্ষা ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিগত স্বার্থটি কোথায় তা অভিভাবকদিগকে দেখিয়ে দিতে পারলে তাদের সহযোগিতা যে শুধু স্বঃতোৎসারিত হবে তাই নয় সর্ববিধ অনুকুল পরামর্শ ও সক্রিয় তৎপরতা নিয়ে তাঁরা অচিরেই শিক্ষকের সহযোগী অন্তরঙ্গ আত্মীয় হয়ে উঠতে পারেন।

তাছাড়া এই ধরণের সহযোগিতা সন্ধানী সংস্থা গড়ে তোলার পেছনেও একটা প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে।

বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

ভারতের বিভিন্ন স্থানে Educational and Psychological Research Bureau গুলির অভিমত জানা সম্ভব না হলেও বর্তমানে কলিকাতা ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের সংলগ্ন এই ধরণের একটি সংস্থার কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সংকেত পাওয়া গেছে। তাঁরা বিভিন্ন স্থানের অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা সমস্যার কারণ অনুসন্ধানে পরীক্ষা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন যে অভিভাবকদের অজ্ঞতা সমস্যার ও অসতর্কতা বিদ্যালয় ও গৃহাবেষ্টনের প্রতিবেশ গত বিরূপতা, অভিভাবক ও শিক্ষকের পারস্পরিক আস্থাহীনতা ও প্রতিকূলতা, শিক্ষকতা বৃত্তির সামাজিক ও নৈতিক মানের ন্যূনতা ও সাামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য — অনেক উচ্চ সম্ভাবনাময় বুদ্ধিমান ছাত্রছাত্রীকে উন্মার্গগামী করে জড় বুদ্ধির অতলতায় নামিয়ে এনেছে। তাঁদরে বিশ্বাস এই ধরণের অসুবিধাগুলি অভিভাবক ও শিক্ষকের সহযোগিতায় দূর না হলে এবং অভিভাবকেরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের কোন লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি নেই।

এই সকল আশু প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই অভিভাবক-শিক্ষক সহযোগী সংস্থার দ্রুত গঠন ও সম্প্রসারণ হওয়া দরকার। এই ধরণের সংস্থার বাস্তব রূপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বিশেষ ভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করলেও আমরা তাদের অন্ধভাবে অনুসরণ করতে গেলে ভুল করবো। কারণ সে সব দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি কিংবা অভিভাবকদের চেষ্টা-চিন্তা-চরিত্র আমাদের দেশের অনুরূপ নয়।

তবে আমাদের দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অভ্যস্ত জীবন যাত্রার সংগে সংগতি রেখে আমরা একটা কর্ম পদ্ধতির পরিকল্পনা নিতে পারি।

একটি প্রস্তাব

বর্তমান সমস্যার গুরুত্ব ও তার আশু সমাধানের সংকল্পে আমরা অভিভাবক শিক্ষক নির্বিশেষে সকলেই যদি স্ব স্ব ক্ষেত্রে দায়িত্ব গ্রহণে উৎসাহিত হই তাহলে আমেরিকার Parent-Teacher Association এর অনুকল্প একটা কোন প্রাদেশিক সংস্থা আমরা অনায়াসেই গড়ে তুলতে পারি। এই সংস্থার সংগঠন, লক্ষ্য ও কার্য্য পদ্ধতি হবে সম্পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক।

সংগঠন

অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও কর্তৃপক্ষ এই চার শ্রেণীর সভ্য নিয়ে সংস্থার কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হতে পারে। এই প্রাদেশিক সংস্থা আবার প্রত্যেকটি বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে এক একটি আঞ্চলিক সংস্থা গড়ে তুলবেন।

লক্ষ্য ঃ এই সংস্থার লক্ষ্য হবে প্রধানতঃ পাঁচটি ঃ —

(১) অভিভাবক ও শিক্ষকের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি ও সহযোগিতামূলক আস্থা ফিরিয়ে আনা।

(২) শিক্ষার ক্ষেত্রজ যে কোন সমস্যা সমাধানে উভয় পক্ষের সমসক্রিয় সহযোগিতাকে উৎসাহ দান।

(৩) আধুনিক শিক্ষার স্বরূপ প্রকৃতি সম্বন্ধে অভিভাবকদের ধারণা সৃষ্টি করা।

(৪) এই নবতর শিক্ষার বাস্তব রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ রচনা করার জন্য উভয় পক্ষকে উৎসাহ দান।

(৫) সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, দলীয় স্বার্থান্বেষা এবং শ্রেণী ও বৃত্তিগত বিভেদ বুদ্ধির বিলোপ ঘটিয়ে উভয় পক্ষের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালনে দৃঢ়তা আনয়ন করা।

কর্ম পদ্ধতি

এই সংস্থার কার্যপদ্ধতি গ্রাম ও শহর ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হওয়া দরকার। কারণ এই জাতীয় বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা আমাদের দেশে যেমন নূতন তেমনি সহজে সকলের সমর্থন নাও পেতে পারে। তাছাড়া এর বাস্তব প্রয়োগ ক্ষেত্রে আমাদের কোন অতীত অভিজ্ঞতা না থাকায় সহজে আমরা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়তে পারি। সুতরাং এই প্রচেষ্টাকে কার্যকরী করার জন্য দৃঢ় সংকল্প ও অটুট ধৈর্য রাখতে হবে।

শহরাঞ্চলে

শহরাঞ্চলে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে শিশু-দিবস, শিক্ষক-দিবস ইত্যাদি উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে বর্তমান শিক্ষার লক্ষ্য, তার কাম্য কর্ম পদ্ধতি এবং সম্ভাব্য সমস্যা সম্বন্ধে সহজ সরল আলাচনার জন্য অভিভাবকদের সমাবেশ ঘটিয়ে তাঁদের মনে নব প্রতীতি ও নব পরিবেশ রচনার প্রেরণা সঞ্চার করা যায়।

একটি সাপ্তাহিক কিংবা মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষা সংক্রান্ত নানা সমস্যার পর্য্যালোচনা ও শিক্ষাকেন্দ্রিক গণচেতনা গড়ে তুলে শিক্ষা সংক্রান্ত জনমতকে সহজে গড়ে তোলা যায়। প্রদর্শনী-মেলা প্রভৃতির মাধ্যমেও এই জাতীয় প্রচেষ্টা কার্য্যকরী হতে পারে।

গ্রামাঞ্চলে

এই জাতীয় প্রচার কার্য্য সুদূর গ্রামাঞ্চলেই বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হওয়া দরকার। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের জনসমাবেশকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য অনুষঙ্গ হিসাবে কিছু চিত্তবিনোদনকারী অনুষ্ঠান থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন দেশের শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষার ক্ষেত্রজ সমস্যাবলী এবং তা দূরীকরণের উপায় প্রভৃতি শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ের তথ্য চিত্র কিংবা সহজ সরলভাবে লিখিত নাটিকা ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা অভিনীত হলে সাধারণ অভিভাবকেরা বেশ উৎসাহিত হতে পারেন।

গ্রামাঞ্চলের প্রত্যেখটি বিদ্যালয়ের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীকক্ষকে সান্ধ্য বৈঠক বা নাইট ক্লাব হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সেখানে ঘরোয়া বৈঠকী আলোচনা ও বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদের মাধ্যমে শিক্ষা সংক্রান্ত নানা প্রকার আলোচনা চালানো যায়। এক অঞ্চলের বিদ্যোৎসাহী শিক্ষক অভিভাবক সম্মিলিতভাবে এ কাজে সহযোগী হতে পারেন। এর ফলে ব্যক্তিগত অন্তর পরিচয়ে পরিচিত হয়ে অভিভাবক ও শিক্ষকের মধ্যে যেমন পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহানুভূতি গড়ে ওঠা সম্ভব তেমনি সাধারণ অশিক্ষিত অভিভাবকদের সংকীর্ণ চেতনা সঞ্জাত সংকোচ ও শিক্ষকের আত্মাভিমান ও স্বাতন্ত্র্য বোধের বিলুপ্তিতে উভয়ে উভয়ের কাছে সমচেতনায় স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারেন।

বেতারসূচীর সান্ধ্য অধিবেশনে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান সূচীর সংযোজনায় শিক্ষা সংক্রান্ত নানা সমস্যার পর্য্যালোচনা ও তার সমাধানের জন এই সকল পল্লী আলোচনা চক্রের পরামর্শ আহ্বান করে বেতার যোগে অভিমতগুলি বিশেষ বিশেষ দিনে স্বনামে প্রচারিত হলে সাধারণ অশিক্ষিত অভিভাবকেরাও বিশেষ উৎসাহিত হয়ে বিদ্যালয়গুলির পুনর্গঠনে বিশিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। এক কথায় দেশ জোড়া অশিক্ষার অন্ধকারকে অপসারিত করতে হলে এই সকল অগণিত অশিক্ষিত ও অধশিক্ষিত অভিভাবকদের আগে শিক্ষা দিতে হবে। আর এই শিক্ষা দান ব্যাপারে শিক্ষকদের যেমন তৎপর হওয়া দরকার তেমনি Social Education Department গুলির তৎপরতা নিতান্ত ভাবেই কাম্য।

বিদ্যালয়ে

কিন্তু যে সকল বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্য্য পদ্ধতিতে অভিভাবকদের সাক্ষাৎ সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব নয় সেই সকল ক্ষেত্রে বিদ্যালয়গুলিতে একটি যোগাযোগ বিভাগ (Co-ordination Department) খোলা যেতে পারে। ভারপ্রাপ্ত কোন উৎসাহী শিক্ষকের সহযোগিতা এই বিভাগ ব্যক্তিগতভাবে ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে ডাকযোগে সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের পরামর্শ ও সহযোগিতা আকর্যণ করতে পারেন।

তাছাড়া এই বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন পরীক্ষাদির পর শিক্ষার্থীর পাঠোন্নতি, চারিত্রিক মান, ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে অভিভাবকদের অবহিত করে উৎসাহিত কিংবা সতর্ক করতে পারবেন।

এই উদ্দেশ্যেই শ্রেণী শিক্ষক, কেরিয়ার টিচার কিংবা অন্য কোন উৎসাহী শিক্ষকের সহযোগিতায় অন্য উপায়ও অবলম্বন করা যায়। বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন দিনে নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে সংশ্লিষ্ট আমন্ত্রিত অভিভাবকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁদের পুত্রকন্যাদের সম্পর্কে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে গৃহে তাদের আচরণ সম্বন্ধে অভ্রান্ত ধারণা গড়ে তুলে তাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বনে শিক্ষক যেমন নিশ্চিন্ত হতে পারেন তেমনি অভিভাবকেরাও সন্তান-সন্ততির প্রকৃতি ও সম্ভাবনা অনুযায়ী বৃত্তিশিক্ষা নির্বাচন করে অহেতুক অপচয় ও অপ্রত্যাশিত উৎকণ্ঠার হাত থেকে রেহাই পেতে পারেন।

অনেক বিদ্যালয়ে প্রত্যেক পরীক্ষার পর ছাত্রছাত্রীদের পাঠোন্নতি ও বিদ্যালয়ে তাঁদের আচরণের উপর মন্তব্য করে Progress Report পাঠানোর রীতি রয়েছে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে অভিভাবকের অজ্ঞতা বা ঔদাসীন্য হেতু তার উপর একটিবার মাত্র দৃষ্টিপাত না করে সহি করে পাঠিয়ে দেন। অনেক সময় এই অবহেলার চরম সুযোগ নিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই অভিভাবকের সহি করে আসল উদ্দেশ্যটাকে ব্যঙ্গ করে। বিদ্যালয়ের শ্রেণী ভিত্তিক সংপৃক্ত অভিভাবকদের সাক্ষাৎ সহযোগিতার দ্বারা এই জাতীয় অপচেষ্টার অবসান ঘটানো যায়।

তাছাড়া এই জাতীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিদ্যালয় ও শিক্ষকবন্ধুরা যে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত উন্নতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখেছেন জেনে অভিভাবকেরাও শিক্ষায়তন ও শিক্ষকদের প্রতি তাদের বিরূপ ভাব কাটিয়ে উঠে নূতন আস্থা ও অনুরাগ পোষণ করতে বাধ্য হবেন। ব্যক্তিগত আকাংক্ষা ও স্বার্থ সিদ্ধির সম্ভাবনায় তাঁরা উৎসাহী ও সহযোগী হয়ে উঠবেন।

কিন্তু এই জাতীয় প্রচেষ্টার বাস্তব প্রয়োগ ক্ষেত্রে অনেক বাধা ও সমস্যা দেখা দেবে। সেগুলোকে অতিক্রম করার জন্য আমেরিকা, রাশিয়া, জার্মান প্রভৃতি দেশের দৃষ্টান্ত-প্রণালী আমাদের সহযোগী হতে পারে; কারণ এই সকল দেশে এই পদ্ধতি নানা বাস্তব বাধা অতিক্রম করে অনেকখানি অগ্রগতি লাভ করেছে এবং বর্তমানেও নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা ও চেষ্টা-চিন্তা চলেছে। একমাত্র রাশিয়া ব্যতীত এই ধরণের প্রচেষ্টার মূলে সরকারী উদ্যোগ সামান্যই; অভিভাবকেরাই এগিয়ে এসে নিজেদের সমস্যা সমধান করতে চেয়েছেন শিক্ষক বন্ধুদের সহযোগিতায়।

আমাদের দেশের অধিকাংশ অভিভাবক — অভি-ভাবক নন; তারা অনু-ভাবক। সুতরাং তাঁদের ভাবনাকে প্রভাবিত করতে হলে এ বিষয়ে সরকারী সহযোগিতাপুষ্ট শিক্ষকের ভূমিকা বলিষ্ঠ হওয়া দরকার।

সরকারের ভূমিকা

সরকারের কর্ত্তব্য শিক্ষক জীবনের অর্থনৈতিক কৃচ্ছতা, সামাজিক দৈন্য ও হীনমন্যতার ভাব ঘুচিয়ে তাঁদের কর্মক্ষেত্রকে বিদ্যালয়ের বাইরে বৃহত্তর সমাজের ক্ষেত্রে টেনে আনার জন্য উপযুক্ত কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা।

তাঁদের কাছ থেকে আরও সেবা ও সহযোগিতা পাওয়ার জন্য উচ্চমানের প্রশংসা পত্র দিলে যথেষ্ট হবে না; পরিবার জীবন সম্বন্ধে তাঁদের চিন্তামুক্ত করে সামাজিক গঠন কার্য্যে তাঁদের উৎসাহিত করতে হবে।

অন্যদিকে অভিভাবকদের নির্মম ঔদাসীন্য ও অজ্ঞতা দূরীকরণের জন্য Social Education Department-এর মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে অভিভাবকদের দায়িত্ব ও সক্রিয় ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। বিদ্যালয়ের নবায়ন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাধারণ অভিভাবকদের কল্যাণ-ইচ্ছাকে স্বীকৃতি দান করে বিদ্যালয়গুলির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাক্ষেত্রে তাঁদের সহচিন্তা ও উৎসাহকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

প্রত্যাশিত সুফল

এই প্রস্তাবটি কার্য্যকরী করতে পারলে শিক্ষার লক্ষ্যপথে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের কতকগুলি প্রয়োজনীয় প্রত্যাশা পূর্ণ হতে পারে।

অভিভাবক ও শিক্ষক — এই দুই বিবদমান শক্তি যখন পরস্পর সম্মিলিত ও সহযোগী হয়ে একটি সুনর্দ্দিষ্ট লক্ষ্যপথে সমানে সক্রিয় হয়ে উঠবেন তখন যে কোন দুরূহ বাধা বা সমস্যাকে অতিক্রম করা আর দুঃসাধ্য হবে না।

আধুনিক শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগক্ষেত্রে এমন কতকগুলি অসুবিধা রয়েছে যা সরকার, শিক্ষক কিংবা পরিচালক— মণ্ডলীর একক প্রচেষ্টায় দূর করার দুরূহ। কিন্তু এই ধরণের অভিভাবক-শিক্ষক সংস্থার সাহায্যে তা সহজেই দূর করা যায়।

বিদ্যালয়ের নিজস্ব খেলার মাঠ, পুকুর, বাগান ও বিদ্যালয় গৃহের প্রয়োজনীয় সম্প্রসারনের জন্য উপযুক্ত সংলগ্ন জমি অতি সহজ প্রচেষ্টায় অর্দ্ধমূল্যে কিংবা দানের আকারেও সংগৃহীত হতে পারে। এর পরোক্ষ ফল হিসাবে বিদ্যালয়ের আয়োজনের অসম্পূর্ণতা যেমন দূর হবে, তেমনি সরকারী সাহায্যের উপর অতি-নির্ভরতাও হ্রাস পেয়ে আর্থিক দিক থেকে বিদ্যালয়টি একসময় স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

অপর পক্ষে অভিভাবক ও শিক্ষকের যৌথ প্রচেষ্টায় গৃহাবেষ্টন ও শিক্ষানিকেতনের প্রতিবেশগত বিভেদ বিদূরিত হবে। শিক্ষার্থী উভয় ক্ষেত্রের অনুকূল পরিবেশও অভিজ্ঞতার অনন্যতায় আত্মোন্নতির ক্ষেত্রে একাগ্রতা লাভ করে আদর্শ নাগরিক হয়ে উঠবে। শিক্ষার্থী নামক নৌকাটি তখন দাঁড় ও পালের দ্বৈত সহযোগিতায় অনুকূল স্রোতে গতিচঞ্চল হয়ে উঠবে।

অপরপক্ষে অভিভাবকের অনুসন্ধানের সহযোগিতায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী সম্বন্ধে সঠিক ধারণার অধিকারী হয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক উপায় অবলম্বনে স্বল্প সময়পরিসরে কার্য্যকরীভাবে ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারবেন।

শিক্ষার্থীরা আবার বিদ্যায়তনের শ্রীসমৃদ্ধির জন্য স্ব স্ব অভিভাবকেদের কর্মতৎপর দেখতে পেলে এবং শিক্ষকের আচরণের সঙ্গে তাঁদের মতের ঐক্য লক্ষ্য করলে একদিকে যেমন বিদ্যালয়ের সংগে তাদের আত্মিক সম্পর্কটিকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করবে তেমনি অন্যদিকে অনন্যোপায় হয়ে বিদ্যালয়ের নিয়মাবলী ও শিক্ষকের সহৃদয় নির্দেশাবলী অলঙ্ঘনীয়বোধে মেনে নিয়ে বিদ্যালয়ের নৈতিক মান ও সুনামকে উন্নত করে তুলবে। উৎশৃঙ্খলতাজাত আমাদের জাতীয় উৎকণ্ঠারও অবসান ঘটবে অচিরে।

আবার এই সকল শিক্ষার্থীরা যেদিন সমাজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাজ গড়ার মহান আদর্শ নিয়ে এগিয়ে আসবে সেদিন এই কৈশোরের লীলানিকেতন বিদ্যায়তনগুলি এবং তাদের লীলাসঙ্গী প্রবীণ শিক্ষকেরা তাদের (কৃতজ্ঞতাসিক্ত) বলিষ্ঠ সেবা হস্তের স্পর্শে অভাবিত শ্রীসমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের আশা করতে পারেন।

যেদিন স্থানীয় বিদ্যালয়টিকে প্রত্যেকটি অভিভাবক নিজেদের প্রতিষ্ঠান বলে ভাবতে পারবেন এবং শিক্ষকদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধির সার্থক উপায় প্রত্যক্ষ করবেন সেইদিনই তাঁরা সর্ববিধ সহযোগিতা ও প্রচেষ্টা নিয়ে বিদ্যালয়, বিদ্যার্থী ও শিক্ষকবন্ধুদের সকল সমস্যা সমাধানে সক্রিয় হয়ে আমাদের গণতান্ত্রিক শিক্ষাস্বপ্ন-স্রষ্টা মনীষীদের ভাবনার বাস্তবায়িত রূপটিকে প্রকট করে তুলতে পারবেন।

গান্ধীজীর স্বাবলম্বী সার্বজনীন শিক্ষাদর্শ, স্বামীজীর নির্ভীক সামাজিক সৈনিক গড়ার সংকল্প, রবীন্দ্রনাথের কার্মিক পদ্ধতিতে (Functional Method) স্বাধীন মুক্ত মানুষ গড়ার প্রস্তাবনা ও প্রস্তুতি, ডিউঈর গণতান্ত্রিক স্বপ্ন এবং মুদালিয়র কমিশনের ভূয়ঃ ভূয়' সতর্ক বাণী (citizenship in a democracy is a very exacting and challenging responsibility for which every citizen has to be carefully trained)—এই অভিভাবক শিক্ষক সহযোগী সংস্থার সাহায্যে সাফল্যমণ্ডিত হয়ে আমাদের অতীত জ্ঞানগরিমার গৌরব আসনটি আবার বিশ্বের দরবারে উপস্থাপিত করতে পারবে।

সংস্কৃতির অর্থ*

—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়

বর্তমান Culture বা 'কৃষ্টি' শব্দটা আমাদের দেশে অত্যন্ত লঘু ও ব্যাপক দুরকম অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিগত ৩০।৩৫ বৎসর ধ'রে আমাদের দেশে Cultural conference এর পরিবর্তন হয়েছে। এর আগেও Conference বা সম্মেলন হ'ত কিন্তু তা কোনও একটা নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুতেই নিবদ্ধ থাকত — যেমন ঐতিহাসিক সম্মেলন, দার্শনিক সম্মেলন, সাহিত্য সম্মেলন ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃত Cultural conference বা খাঁটি সাংস্কৃতিক সম্মেলনের কোনও প্রচলন ছিল না। 'কৃষ্টি' এবং 'সংস্কৃতি' শব্দ দু'টি প্রাচীন — প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও এর প্রয়োগ রয়েছে, কিন্তু বর্তমান অর্থে নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থে 'সংস্কৃতি' শব্দটি নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেছেন — 'কৃষ্টি' শব্দটির ব্যবহারের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের আলোচনার পর থেকেই বাংলাদেশে ও বাংলা সাহিত্যে ঐ শব্দ দু'টির বহুল ব্যবহার হচ্ছে। হিন্দী ভাষায়ও ঐ শব্দ দু'টির এমনি ব্যবহার বর্তমানে দৃষ্ট হয়।

বর্তমানে যে কোনও সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যেখানে প্রবন্ধ পাঠ, বিতর্ক, নৃত্য, গীত ও নাট্যাভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে, সেখানে ঐ বিষয়গুলিকে সাংস্কৃতিক অঙ্গ ব'লে মনে করা হয়। বিশেষ একটা শিল্প, বুদ্ধি এবং কল্পনার চর্চা করার অর্থেই 'সাংস্কৃতিক চর্চা' ব্যবহৃত হচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্র, এমন কি শিক্ষা ও 'সংস্কৃতি' শব্দ দু'টিও পাশাপাশি ব্যবহার করা হচ্ছে UNESCO এর মত সংস্থাও শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখেছে। বিদ্যালয়েও Culture কে শিক্ষা বা education থেকে ভিন্ন করে দেখা হয়। আজকাল বহু অগ্রসর রাষ্ট্রেও শিক্ষা এবং সংস্কৃতিকে ভিন্ন ভিন্ন দপ্তরের অধিকারভুক্ত ক'রে রাখা হয়েছে।

আমার মতে UNESCO এর ব্যবহৃত অর্থে Culture শব্দের ব্যবহার বাঞ্ছিত নয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে Culture শব্দ নিয়ে বহু পর্যালোচনা হয়েছে। Tolstoy, Mathew Arnold, Marx এবং Marx পন্থী বহু গবেষকও এর আলোচনা করেছেন। তাঁরা একে শিক্ষা থেকে পৃথক করে দেখেছেন, অবশ্য Marx কিছুটা পরিমাণে ব্যাপকতর অর্থে শব্দটির প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। বিজ্ঞানের বহু শাখায়ও এই 'Culture' শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন Boold culture', 'Horti-culture', 'Seri-culture', 'Agriculture' ইত্যাদি। এ সব কিছুই, culture আবার একটা পুরাতন বস্তুর সন্ধান মিললে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বলেন এটা Primitive Culture এর নিদর্শন। সব মিলিয়ে দেখা যাবে বর্তমান পৃথিবীতে বিভিন্ন অর্থে এই শব্দটির ব্যবহার হচ্ছে। জীবনের নানা পর্যায়ে নানা ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ।

T. S. Eliot তাঁর রচিত "Towards the definition of the world Culture". গ্রন্থে এর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। প্রোটেস্টান্ট্ হলেও গত মহাযুদ্ধের পর তিনি ক্যাথলিক আন্দোলনে অনুরক্ত হন, আর এই ক্যাথলিক প্রদত্ত অর্থে Culture শব্দের মূল অনুসন্ধান করেন। 'Culture' — ল্যাটিন 'Cult' থেকে উদ্ভুত। এর অর্থে, Sect এবং এর প্রয়োগ দু'টি অর্থে, প্রথমটি 'Scult' — তার মানে 'to cut into' এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে Cult যার অর্থ 'to cut across'. এই অর্থেই এক সম্প্রদায়ের যুক্তি খণ্ডন করে নিজের ধর্মীয় মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে। আর এই সম্প্রদায় গত অর্থেই তিনি এর ব্যবহার করেছেন।

ভারতের সভ্যতা ও সাধনার ইতিহাস অনুসন্ধান ক'রলে Culture বা কৃষ্টির যথাযথ অর্থ পাওয়া যায়। 'কৃষ্টি' শব্দ 'কৃষ্' ধাতু 'ক্তি' প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হয়েছে। 'কৃষ' ধাতুর অর্থ কর্ষণ করা বা 'চাষ

করা'। অথর্ব বেদে এই অর্থে ব্যবহার আছে। মানুষ নিজেকে প্রকাশ ও সৃষ্টি করার প্রেরণায় যা কিছু করে তাই শিল্প। যেমন কুম্ভকার কুম্ভ নির্মাণ করে, মাতা সন্তানের জন্মদান ও লালনপালন করেন, মানুষ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করে ও তাকে রক্ষা করে — এ সবই শিল্পকর্ম। আর এই শিল্পকর্মের মাধ্যমেই মানুষ নিজেকে সংস্কার করে — "আত্মানং সংস্কুরুতে"।

কিন্তু মানুষ নিজের সংস্কার করে কেন? জন্ম মুহূর্তে প্রাপ্ত জীবন হচ্ছে মানুষের "প্রাকৃত" জীবন। প্রাকৃত অবস্থাই মানুষের মৌলিক রূপ। এর পরে চলে তার শিক্ষা — তার সংস্কার। বুদ্ধি-বৃত্তির সংস্কার সাধন ক'রে মানুষ তার নিজের সংস্কার করে। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মে যে ৪০টি সংস্কারের উল্লেখ আছে সেও এই অর্থে। সম্যকরূপে করার নাম সংস্কার। মানুষ নিজেকে ধাপে ধাপে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যায়। যিনি যত সংস্কার ক'রতে পারবেন তিনিই হবেন ততটা উন্নত। জীবনের চাষ করাই Culture "কৃষ" ধাতু থেকেই 'কৃষি' শব্দ বা চাষের উৎপত্তি। বীজকে বহুগুণিত করে তাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য চাষের প্রয়োজন। Multiplication and reproduction of the species হচ্ছে প্রকৃতির ধর্ম।

আদিম যুগের মানুষ বুদ্ধিবৃত্তির চাষ ক'রে আজ বর্তমান মানুষের পর্যায়ে উন্নত হয়েছে। চাষ করে করেই আমাদের পূর্বপুরুষের বুদ্ধি কোষ সমুহ (Brain cells) বৃদ্ধি লাভ করেছে। তার ফলে বর্তমান মানুষ বুদ্ধির মাপকাঠিতে তাদের থেকে অনেক উন্নত।

পূর্বেই বলা হয়েছে, Cult এর অর্থ দুইভাগে ভাগ করা'। লাঙল জমিকে দুই ভাগে ভাগ করে (cuts across) অর্থাৎ কর্ষণ করে। এখানেও সেই কৃষ ধাতুরই প্রয়োগ। আর তাই 'Cult' ই কৃষ্টি। এই অর্থেই ভারত 'কৃষ্টি' শব্দের ব্যবহার ক'রে আসছে। আর এ অর্থ ভারত হারায়নি। ইউরোপ কিন্তু এর খাঁটি অর্থ হারিয়ে ফেলেছে। সেইজন্যই বুঝি ইউরোপীয়রা শিক্ষা, সংস্কার ও বিজ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখে। আমাদের দেশে এ চাষ কথাটি যে কত ব্যাপক, সংস্কৃতির সঙ্গে যে কেমন জড়িত তার দু-একটা দৃষ্টান্ত দেব।

পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্কালে যখন দেশে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল তখন কবি রামপ্রসাদ গেয়ে উঠলেন—

"... এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ ক'রলে ফলত সোনা ..."

মানবজীবনভুমি আবাদ না ক'রলে পতিত রয়ে যায়, আর তাতে সোনা ফলান যায় না। এখানেই নিহিত র'য়েছে কৃষ্টি বা সংস্কৃতির প্রকৃত অর্থ। কবীরও তাঁর দোঁহায় এই কথাই বলেছেন — "জীবন বনভূমি — আগাছা ও জঙ্গলে পূর্ণ, একে পরিষ্কার ক'রে ক্ষেত্র প্রস্তুত কর।"

প্রাচীনকাল থেকে তো আমাদের দেশে 'ধর্ম' শব্দটি প্রচলিত র'য়েছে। কিন্তু ধর্ম কথাটির অর্থ কী? জীবন যাকে ধারণ করে বা জীবনকে যা ধারণ করে তাই তো ধর্ম। যেমন রাজার ধর্ম, সন্ন্যাসীর ধর্ম, গৃহীর ধর্ম। এই ধর্ম ব্যক্তিগত, সমাজ বা পরিবারেরও ধর্ম আছে। ভারতবর্ষে এই অর্থেই 'ধর্ম' শব্দের ব্যবহার।

বৈষ্ণবকবি ব'লেছেন "মরম না জানে ধরম বাখানে ..."। জীবনের মর্ম যে না জানে তার পক্ষে ধর্মের ব্যাখ্যা অশোভন। এই ধর্ম দেশ-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন। যুধিষ্ঠির ধর্মরাজ ছিলেন, কারণ তৎকালীন লোকধর্ম এবং রাজধর্ম পালন ক'রে ধর্মাচরণ ক'রেছেন। এই ধর্মকে কিন্তু অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে মিশিয়ে ভুল করা উচিত নয়। এই ধর্মাচরণ মানবজীবন চাষ করার উপায় মাত্র। বুদ্ধ, অশোক যে ধর্ম প্রচার করেন তাতে ভগবান বা পরলোকের কথা তো নেই। আচরণই ছিল তখন জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের একটি শাখার নাম 'বিনয়'। ইংরাজী 'modesty' অর্থে এখানে 'বিনয়' শব্দের প্রয়োগ

করা হয়নি। 'বিশেষং নয়তি' ইতি বিনয়'। যে পথ বা অনুশাসন অবলম্বন ক'রে জীবনকে বিশেষভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তাই-ই 'বিনয়ে'র আলোচ্য বিষয়। এ গ্রন্থে বৌদ্ধ ভিক্ষুর আচরণের বিস্তৃত নির্দেশ রয়েছে। এর অর্থই আত্মসংস্কার।

আমাদের দেশে পূর্বে, বা এখনও গ্রামাঞ্চলে, কারও পরিচয় জানতে হলে তার 'কুলশীলে'র সন্ধান করে। কুল হচ্ছে বংশগত ধারা, ঐতিহ্য বা কৃষ্টি। মানুষ তার আচার আচরণ দেহে ও চিন্তায় পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য বহন ক'রে চলে। এটাই তার কুল। এই ধারা সহজাত। অজ্ঞাত অতীত থেকে রক্তে ও চিন্তায় মানুষ এই 'কুল'কে বহন ক'রে এসেছে।

আর শীলের অর্থ অনুশীলনলব্ধ কীর্তি। জীবনের কর্ষণ ক'রে, সংস্কার করে যা পাওয়া গেল তা-ই শীল। কর্ণ যে বলেছিলেন—'মমায়ত্তং হি পৌরুষম'—এই পৌরুষই তাঁর শীল। ওটা তাঁর অর্জিত। আবার, একপুরুষের কুল এবং শীল পরবর্তী পুরুষে কেবলমাত্র কুলে পর্যবসিত হয়। 'শীল' তাকে অর্জন কর'তে হবে। কুল এবং শীলের ধারা নদীর স্রোতের মত অনন্তকাল ধরে প্রবাহিত হ'য়ে চ'লেছে। 'শীল' যদি অর্জিত না হয় অর্থাৎ আত্মসংস্কারের অভাব যদি ঘটে তবে জাতির মৃত্যু অনিবার্য। এই শীলের অভাবেই রোম ও গ্রীক সভ্যতার পর ইউরোপে বর্বরতা প্রাধান্যলাভ করেছিল। তারা আবার জীবনের অনুশীলনের দ্বারাই অভ্যোন্নতি করল। অনুশীলনের অভাবেই একদিন কুলশীলের ধারা স্তব্ধ হয়ে যায়। তাই বলছি কেবল ব্যক্তিই নয়, যে সভ্যতা এই শীলের চর্চা করে না তারও মৃত্যু অনিবার্য।

জীবনের সংস্কার বোঝাতে আরও অনেক শব্দের ব্যহার আছে উপনিষদে। যেমন—'চর'। এর ধাতু 'চর'-এর থেকেই এসেছে 'চরণ'—এগিয়ে যাওয়া। গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রত্যাবর্তন কালে আচার্য শিষ্যকে উপদেশ দিতেন—'চরৈবেতি' 'চরৈবেতি'—এগিয়ে চল এগিয়ে চল। গতিই জীবন; গতিহীনতাই মৃত্যু। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হ'য়েছে—'সূর্য স্থির হ'য়ে নেই, সে উদয়াচল থেকে অস্তাচলে শুধু চ'লেছে —কেবলই এগিয়ে চ'লেছে। জীবনের ধর্মই এই এগিয়ে চলা।' এই এগিয়ে চলার অর্থই 'জীবনের চাষ করা।'—আত্মসংস্কার করা।

জীবনের এই অগ্রগতির দু'টি উপায়—

প্রথমটি চর্চা অর্থাৎ অনুশীলন, অধ্যয়ন। দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের চর্চা করতে হবে। অনুক্ষণ চর্চাই জীবনের পথে অগ্রগতির উপায়। বুদ্ধির চর্চার ফলেই পাণ্ডিত্য অর্জিত হয়।

দ্বিতীয় উপায় চর্যা—আচরণ। চর্চা ভাল কিন্তু চর্যা সর্বোৎকৃষ্ট। চর্চা বা বুদ্ধি ও বিশ্লেষণ দ্বারা যা লাভ করা হ'ল তাকে জীবনের প্রয়োগ করাই চর্যা। অর্থাৎ, আপন জীবনের আচরণ। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'। জ্ঞান থাকলেই কিন্তু চর্যা হ'ল না। জানা এক চর্যা ভিন্ন। "পণ্ডিত মিলে লাখে লাখে আচার্য মিলয়ে এক"। এই চর্যা যিনি করেন তিনিই আচার্য। জীবন আচরণ ক'রে যিনি জীবনের সংস্কারসাধন করতে পারেন তিনিই জীবনশিল্পী। সংস্কৃতিই এই জীবন আচরণের পথ। এই আদর্শ অর্থেই ভারত 'কৃষ্টি' ও 'সংস্কৃতি' শব্দের ব্যবহার ক'রে এসেছে।



কলেজের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে সেমিনার—ভাষণরত শ্রী উজ্জ্বল কুমার বসু, সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।

MATACOGNITION IN LEARNING STRATEGY

— Jayasri Banerjee

Metacognition is an important aspect of children's learning. It refers to the ability to reflect on one's own performance. If children lack insight to their own learning abilites, they can not be expected to plan or self-regulate efficiently. Metacognitive skills are involved in many classroom activities, such as comprehending, evaluating, problem solving. Metacognitive knowledge is used when the task directs us to think about it, how much time may be spent on it and how can we deal with it. There is difference between cognitive strategies and metacognitive strategies. Cognitive strategies are used to achieve a goal but metacognitive stategies are used to monitor one's progress toward a goal, monitoring effectiveness of cognitive strategies. The term cognition is used to describe the ways in which the information is processed - that is the ways it is attended to, encoded, stored in memory but metacognition refers to our understanding about these operations and these processes many be used to achieve a learning goal.

Flavell (1976) first invented the term metacognition. He defined metacognition as one's knowledge regarding one's own cognition as well as control and monitor one's own cognition. The term self-regulated learning and metacognition may be used interchangeably.

A self-regulated learner views acquisition as a systematic and controllable process and accepts greater responsibility for his / her achievement. In other words, he / she is the initiator of the learning process. Self-regulated learning has played a part in behavioral theory, cognitive theory, social-cognitive theory and constructivism theory. In behavioural theory, regulation is through external reinforcement. In cognitive theory, self-regulation is equivalent to metacognition, knowing about and regulating cognition. Social-cognitive theory views self-regulation as combining self-observation, self-judgement and self-reaction. Cosntructivist theory perceives individual as active agents who construct and reconstruct their knowledge.

Development and Metacognition

There is little evidence of metacognitive activity in early school stage. In the formal-operational stage, as described by Piaget, children try to solve problem by mental experimentation and logical analysis. They learn to argue mentally and this is the process of concentration on themselves. Though Metacognition is an important aspect of children's learning, but metacognition does not emerge full-blown in late childhood. The evidence suggests that like other forms of learning, metacognition develops gradually and is as dependent

on knowledge as experience. It is difficult to engage in self regulation / metacognition in areas that one does not understand. But it is desirable that most of our students should be able to think about their own thinking. We need to know how teachers help to develop metacognitive thinking in students.

Information processing and metacognition

The concept of metacognition evolved from the study of information processing. Metacognition is thinking about one's own thinking and about how one processes information effectively. It refers to the ability to understand and manipulate our own cognitive processes. It is a process learner use to judge their thinking while reading, studying, trying to learn or solving problem. The ways that expert learners read and engage in problem solving is different from those employed by novice learners. Expert learners know what they know and what they don't know. They plan to get the information and understanding they need. The expert learners are purposeful, attention - directing, self-questioning in their studying while novice learners hold few ideas about what is necessary cognitively to be successful. Expert learners are able to extract crucial ideas from texts early on to make the most efficient use of their study time, they are selective in their processing. Novices on the other hand attempt to process everything, they lack selectivity. Thus expert learners activate orienting schemas, draw inferences, use well organized existing schemas and breakdown information into manageable chunks.

The value of metacognitive learning

Metacognition plays a crucial role in all phases of learning. Schoenfeld (1987) states that self regulation has the potential to increase the meaningfulness of students' classroom learning. He (1983) showed that many problem solving errors are due to metacognitive failure rather than lack of basic knowledge. It is desirable that all metacognitive strategies should be developed by students. To teach students to be active, motivated, self regulated is a continuing issue in education. Meaningful classroom activities that are relevant to real-life situation are likely to engender students' cognitive activity and conceptual change. Equipping students with self-regulated strategies will provide them with necessary techniques for becoming independent thinkers. According to cognitive psychologists development of constructivist instructional systems support metacognition and problem solving skills.

Metacognitive learning strategies and the role of teaches

Now the question is how can we, as teachers facilitate meatacognition or self regulated learning, in the classrooms? Metacognition strategies can be taught and teachers can play a significant role to train students in purposeful, strategic reading, studying and problem - solving. There are a number of specific

metacognitive learning strategies that a teacher can teach to students. A teacher can encourage students to use metacognitive learning strategies, such as self-questioning, KWL, PQ4R and IDEAL.

Self questioning : A teacher can present divergent questions (questions with a range of possible answers) for students to answer. Self-questioning encourages the students' monitoring of their own cognition, along with the assessment of their feelings about the efficacy of their thinking, it also helps them in self-correction and development of newer understanding.

KWL : KWL is metacognitive strategy enabling students to know what they want to know, what they want to learn and what they did learn.

PQ4R : This metacognitive strategy encouraging students to predict, question, read, reflect, recite and review material to be learned by their own. It helps students to process a lot of information in a relatively short amount of time.

IDEAL : A metacognitive strategy that can be used to identify, define, explore, act and look. IDEAL is a metacognitive approach featuring students' processing skills, i.e. identification, definition, exploration, action and looking to facilitate thinking and problem solving.

Teachers can help students set achievable goals and provide feedback highlighting progress towards goal. It is assumed that students can be taught to become more self-regulated learners by acquiring effective strategies. Poor learners can benefit from reciprocal teaching through the process of modeling, guiding and collaborative learning. In reciprocal teaching, a teacher will model a metacognitive strategy (such as PQ4R) for the students and practice it with them. He then turns the process over to the students, who in turn instruct other students to execute the strategy. Collaborative learning induces students to modify their cognitive structures and develop awareness of their own thinking as well as the thinking of others. The development of awareness and cognitive control facilitates problem solving as well as enhance students creativity.

References :

Biehler, R. F. and Snowman, J. (1993). Psychology Applied to Teaching, Honghton Mifflin Co, N. J.

Neisser, U. (1967). Cognitive psychology, New York : Appleton - Century crofts.

Flavell, G. H. (1976). Metacognitive aspects of problem solving.

Flavell, G. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring : A new era of cognitive - developmental enquiry. American psychologists, 34(10), 906-911.

THE NEW COINS OF EDUCATIONAL CONSTRUCTS : THEIR IMPLICATIONS IN HEALTHY MIND

—Dr. Nilanjana Sanyal

Professor and Former Head, Department of Psychology, University of Calcutta
Corresponding email address: sanyal_nilanjana2004@rediffmail.com

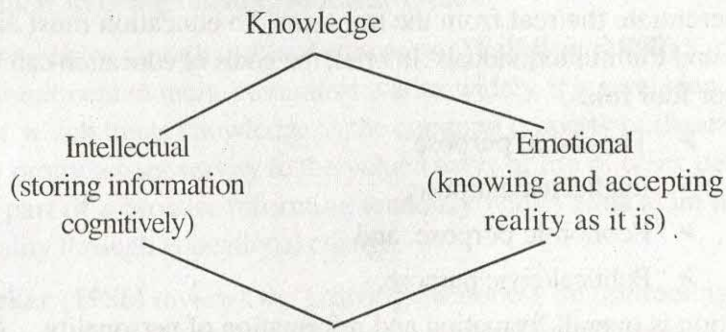
From the nomadic days to this cyber age, the history of civilization of human race has sailed through rough and tough weathers of various kinds in the life ocean. Each crisis point has turned down a stumbling stone and has made progressions towards betterment. The comparative yardstick of achievements did have the arrow-head towards glorious scientific advancements, heavements of literature relating life experiences and realizations, unfolding of historical analysis, geographical locations and definitely attainments of life-values, morals and higher philosophies of deeper orientations in quest of 'holy curiosity' in Einstein's verbosity. The "means" were always "education," be it in literal sense or else in fragrance of philosophy. With this advancement in knowledge, our mental frame is expected to have a rich and voluminous character structure and the need of the day has become pregnant with queries regarding reassessment of the term "education" in the context of psychological architect of 21st century. Let the job take its flow in the following streams of thought and analysis.

Education is a double-winged content of life-version. It is picking up something from the experiential-pebbles, it is giving a fresh "meaning-brushing" to experiences themselves. In the former situation, it is learning and habit formation, the latter resting on realizations and impromptu behaviour modification. The sources of such contents are thus "formal" and "informal," the aim being alterations in one's "psyche." This "psyche" is the subjective frame of one's mind having genetic predispositions together with learnt perceptual mode to gather information from time-life span, to feel, absorb, and emote on the contents in unique ways of oneself and to bring out the digested thought-emotion loaded experiences in definite ways of "action elements." The world has the exposures of these action elements in the forms of "behaviour" being the canvas for the sketches of education on it. Hence psyche and education are integral aspects of one's life. Since marked progressions have etched in the field of "psychology" as a science, its kind of visualization of education as a basic root of life needs special spot light. Before unfolding the psychological analysis of education and launching its sermons for attainment of its balance there, a brief review of its definitional components and historical-matrix of our culture-based education is found ready in hand.

CONCEPT OF EDUCATION:

- Education encompasses teaching and learning specific skills, and also something less tangible but more profound: the imparting of knowledge, positive judgement and well-developed wisdom.
- Education has as one of its fundamental aspects the imparting of culture from generation to generation.
- Education means "to draw out," facilitating realization of self-potential and latent talents of an individual.
- It is application of **pedagogy,** a body of theoretical and applied research relating to teaching and learning and draws on many disciplines such as psychology, philosophy, computer science, linguistics, neuroscience, sociology and anthropology **(Achilles *et al,* 1989).**

In the psychological parlance, education is the means of acquiring



This supplies energy for better retention (concept of emotional intelligence)

Hence:

a) education is being aware of external as well as internal reality.

b) education is relating ability – cognitive assimilation and emotionally concept contextualization.

c) education is feeling-based realization.

d) education is picking up values.

e) education is practicing positivity.

f) education is finding out roots of non-materialistic energy-bound self-existence.

g) education is developing effective action plans to reach one's destinations in life.

Psychologically, education is aiming to produce a human being who is

intelligent, knowledgeable, hard-working, efficient, disciplined, smart, successful, and hopefully a leader in his field of endeavour. The real responsibility of education, in this perspective, is to reveal to the child all the beauty of life and there is great beauty in art, in literature, in science, in mathematics, in music, in games and sports, in nature, and in relationship – indeed in every aspect of life.

Thus, in the new vision of education, we are not only taking the responsibility to impart information and skills but also to awaken sensitivity and creativity in the child. Education in the 21st century must therefore concern itself not with greater "progress" but with the inner transformation of the human consciousness **(Krishnamurti, 1955).**

History confirms that education plays a vital role in the transformation of the societies. The need of the hour is to explore that education which would bring about the right transformation that shall inculcate human values into the minds of the youngest architects of the mankind. Ignorance of the self has to be dispelled from the minds of the children by providing them the right guidance to differentiate the real from the transient. So education must aim at yielding honest and truthful individuals. In brief, the goals of education can be categorized in major four folds:

- The social purpose;
- Intellectual purpose;
- Economic purpose; and
- Political/civic purpose.

Education is overall formation and reformation of personality.

To understand the imperatives of education in earthly contexts of life, a brief review of its historical evolution is needed.

HISTORY OF EDUCATION IN SOCIETY IN THEORETICAL CONCEPTUAL FRAMES:

The agenda of the debate surrounding education in any complex society is influenced by economic and socio-political circumstance and by the findings and fashions of educational theory. A brief historical survey illustrates how theory and practice have mirrored and institutionalized the dominant priorities and perspectives of the given era.

In the frame of conception of education, **Hartnett and Naish (1990)** proposed that education implies a wider notion of social identity than that of worker and consumer and requires a schooling system which should not be thought of as principally a service industry to the economy.

Darling (1986) has explored the nature of the progressive movement, which stressed individual development and which characterized much educational change in the post-war period of economic expansion and social optimism. He has indicated that progressivism's relaxed view of each child as a unique individual with a potentially open future, with the teacher's role being that of guide and resource, was facilitated by the expectation of growing prosperity and of concomitant increases in social equality.

Bailey (1984) has reconsidered the notion of liberal education. He argued, however, that in reasserting the aims of education we are committed neither to static content nor to stultifying pedagogy, for if the social content both of the learner and of what is to be learned are taken seriously, then what constitutes a liberal education is clearly illiberal in assumptions and effects.

Phillips (1990) has examined the complex area of personal, social and moral education, differentiating the three areas, but showing their inter-relationships and their shared grounding in moral values.

In the entry to multicultural education, **Walkling (1990)** suggests that though commitment to multi-culturalism varies widely, it is now seen to imply a perspective which treats knowledge as the common property of diverse cultures and which promotes sensitivity to the valued ways of life of other people. This is seen as part of a broader reforming tendency which aims at an increase in social equality through educational change.

Acker (1986) reviews the growing awareness that schooling practices reflect and reproduce the gender stereotypes and sex-linked divisions of labour of society. Though outcomes are attributed to a complex of social and school-based factors, it is argued that education has a primary role to play in counteracting gender-related inequalities.

The value-laden nature of apparently asceptic theory is then explored by **Barrow (1990)**, who looks particularly at curriculum theory. He argues that although such commitments are more pervasive than is immediately obvious, they need to be neither arbitrary nor subjective, but must be consistent with a clearly and coherently argued "concept of education." Only when such a concept is made explicit can theory which echoes and sustains it be rationally evaluated.

Golby (1990) argues that the widest possible representation of interests should be sought in the control of education. Though not undervaluing the private pursuit of education, the focus of this contribution is on education as a public service, which is expected to deliver both individual and social benefits. Some accommodation between these types of outcome must be secured as part of the common arrangements which society makes for its future.

The overall outline of educational theories thus reveal that our **educational** response to social conditions, however, must be considered with greatest circumspection, for through education we have the possibility, in the longer turn, of either reinforcing, mitigating or modifying these objective constraints which serve as parameters for our actions and choices today. It is this necessary feature of universal general education, that it simultaneously reflects the past, sustains the present and produces the future, which makes the nature of educational provision the perennial subject of controversy **(Entwistle, 1990).**

KEY CHANGES IN 21ST CENTURY EDUCATIONAL MOULD

The 21st century marks the beginning of some key changes in education. A shift from:

1. regional views to "global" views;
2. covering the material to "uncovering" the material;
3. passive receipt of information to "active" inquiry;
4. product orientation to "process" orientation;
5. compliance and competition to "collaboration" and "inquiry."

An educated person, however, is more than the sum of facts; s/he is able to think, to solve problems, to collaborate on new approaches. An educated person relies on research and experience to "uncover" new questions, rather than simply cover the material. This requires an active and imaginative mind, an appreciation for risk and inquiry, and an ability to learn from one's mistakes. All these features can be represented in a mnemonic called DR. CROSS. Each letter here stands for education that meets the needs of children and inspires learning:

D iscovery : Learning to uncover information and use it;

R isk : Taking a chance and learning from mistakes;

C amaraderie : Using the value of the group to enhance learning and pool resources;

R eal Tasks with Real Consequences : Providing opportunities to take on and be held accountable to challenges;

O ut of the ordinary : Moving beyond passive seat time to active learning in the community, out of doors, through one's own exploration of interests.

S kills : Connecting all curriculum to national standards and educated competencies;

S ervice : Using education in a way that meets the needs of one's society.

THE SPECIAL CONCEPTS:

CONSTRUCTIVISM:

In the 21st century mould of psychological orientation, the latest catch-word in educational circles is "constructivism." The term refers to the idea that learners construct knowledge for themselves, each learner individually (and socially) builds meaning as he/she learns. Constructing meaning "is" learning. The dramatic consequences of this view are two-fold:

1. We have to focus on the learner in thinking about learning (not on the subject/ lesson to be taught).
2. There is no knowledge independent of the meaning attributed to experience (constructed) by the learner or community of learners.

Learning is not understanding the "true" nature of things, nor it is remembering dimly perceived ideas, but rather a "personal and social construction of meaning" out of bewildering array of sensations that have no order or structure besides the explanations that we fabricate for them. Constructivist theory urges us to turn our attention from "all-encompassing machine" that describes nature and instead, look towards all those wonderful, individual living beings – the learners – each of whom creates his or her own model to explain nature.

The psychological principles behind constructive learning are :

- Learning is an active process of participation.
- Learning consists of both constructing meaning and constructing systems of meaning (setting perceptual angles in life).
- The crucial action of constructing meaning is mental. Physical actions, hands-on experience seems necessary for learning.
- Learning involves language. Vygotsky opines that language and learning are bound together (expressivity of learnt product).
- Learning is social activity. Our learning is intimately associated with our connection with other human beings, our teachers, our peers, our family as well as casual acquaintances, including people before us and next to us.
- Learning is contextual. We do not learn, isolated facts and theories in some abstract ethereal land of the mind separate from the rest of our lives – we learn in relationship to what else we also know, what we believe, our prejudices and our fears. We cannot divorce our learning from our lives.
- One needs knowledge to learn. Assimilation of new knowledge is impossible without having some structural base of previous knowledge.

- It takes time to learn. For significant learning to occur, we need to revisit ideas, ponder them, try them out, play with them and use them.
- Motivation is "essential" in learning.

BRAIN-BASED LEARNING AND NEUROSCIENCE:

Another focal point of 21[st] century psychological orientation in education is reliance on "Brain-based learning and Neuroscience." This learning theory is based on structure and function of brain. The core principles of brain-based learning state that:

1. The brain is a parallel processor, meaning it can perform several activities at once, like tasting and smelling.
2. Learning engages the whole physiology.
3. The search for meaning is innate.
4. The search for meaning comes through patterning.
5. Emotions are critical to patterning.
6. The brain processes wholes and parts simultaneously.
7. Learning involves both focused attention and peripheral perception.
8. Learning involves both conscious and unconscious processes.
9. We have two types of memory: spatial and rote.
10. We understand best when facts are embedded in natural, spatial memory.
11. Learning is enhanced by challenge and inhibited by threat.

The three-instructional techniques associated with brain-based learning are :

- **Orchestrated immersion** – creating learning environments that fully immerse students in and educational experience.
- **Relaxed alertness** – eliminating fears in learners, while maintaining a highly challenging environment.
- **Active processing** – allowing the learner to consolidate and internalize information by actively processing it.

Brain-based learning suggests that educators need to help students to have appropriate experiences and capitalize on those experiences.

1. Teachers must immerse students in complex, interactive experiences that are both rich and real.
2. Students must have a personally meaningful challenge. Such challenges stimulate a student's mind to the desired state of alertness.

3. In order for a student to gain insight about a problem, there must be intensive analysis of the different ways to approach it and about learning in general. This is called "active processing of experience."

A few other tenets of brain-based learning include:

1. Feedback is best when it comes from reality, rather than from an authority figure.
2. People learn best when solving realistic problems.
3. The big picture cannot be separated from the details.
4. Because every brain is different, educators should allow learners to customize their own environments.
5. The best problem solvers are those that laugh!

Designers of educational tools must be artistic in their creation of brain-friendly environments.

Another newer concept of psychology worth-mentioning in 21st century fold of education is "Right and Left Brain Thinking."

This theory of structure and functions of mind suggests that the two different sides of the brain control two different "modes" of thinking. It also suggests that each of us prefers one mode over the other. Experimentation has shown the following manners of thinking corresponding to respective hemispheres:

Left Brain	Right Brain
Looks at parts	Looks at wholes
Logical	Random
Sequential	Intuitive
Rational	Holistic
Analytical	Synthesizing
Objective	Subjective

Left-brain scholastic subjects focus on logical thinking, analysis and accuracy. Right-brained subjects, on the other hand, focus on aesthetics, feeling and creativity.

Meta-cognition :

In the thought-parlance, another important cognitive concept of the day is "Meta-cognition."

This is a process of thinking about thinking. This has to do with the active monitoring and regulation of cognitive processes. Meta-cognitive processes are

central to planning, problem-solving evaluation and many aspects of language-learning. Flavell ( ) argued that meta-cognition explains why children of different ages deal with learning tasks in different ways, i.e., they have developed new strategies for thinking. As children grow older, they demonstrate more awareness of their thinking processes.

"Experiential learning" is another key concept orienting educational outlook in the present century. In Rogers' term, this refers to applied knowledge. He lists the following qualities of experiential learning:

- **Personal involvement;**
- **Self-initiated, evaluated by learner; and**
- **Pervasive effects on learner.**

Rogers (1959) asserts that all human beings have a natural propensity to learn; the role of a teacher is to facilitate such learning. This includes:

1. setting a positive climate for learning;
2. clarifying the purposes of the learner;
3. organizing and making available learning resources;
4. balancing intellectual and emotional components of learning;
5. sharing feelings and thoughts with learners, but not dominating.

Learning in such circumstances is facilitated, when:

1. The student participates completely in the learning process and has control over its nature and direction.
2. Learning is primarily based upon direct confrontation with practical, social, personal and research problems.
3. Self-evaluation is the principal method of assessing progress or success.

"**Vygotsky (1978)** and Social Cognition" is another advanced educational concept of the day. It assumes that culture makes two sorts of contributions to a child's intellectual development.

1. Through culture, children acquire much of the content of their thinking, that is, knowledge.
2. The surrounding culture provides a child with the processes or means of their thinking, i.e., "intellectual adaptation."

In short, according to the social cognition model, culture teaches children both "what" to think and "how" to think.

MULTIPLE INTELLIGENCES:

"Multiple intelligences" is an emerged new view on intelligence having enormous implications for education. Based on Gardner's concept, intelligence seems to have seven wings/ dimensions:

- Linguistic intelligence – This is the ability to effectively use language to express oneself rhetorically or poetically and language as a means of remembering information.
- Logical-mathematical intelligence – It entails the ability to detect patterns, reason deductively and think logically. This intelligence is most often associated with scientific and mathematical thinking.
- Musical intelligence – It involves skill in performance, composition, and appreciation of musical patterns. It encompasses the capacity to recognize and compose musical pitches, tones and rhythms. According to Gardner, this intelligence runs in an almost structural parallel to linguistic intelligence.
- Bodily-kinesthetic intelligence entails the potential of using one's whole body or parts of the body to solve problems. It is the ability to use mental abilities to coordinate bodily movements.
- Spatial intelligence involves potential to recognize and use the patterns of wide space and more confined areas.
- Interpersonal intelligence is concerned with the capacity to understand the intentions, motivations and desires of other people. It allows people to work effectively with others. Educators, sales people, religious and political leaders and counsellors all need well-developed interpersonal intelligence.
- Intra-personal intelligence entails the capacity to understand oneself, to appreciate one's feelings, fears and motivations. It involves having an effective working model of ourselves and to be able to use such information to regulate our lives.

The concept of multiple intelligences has met with a strong positive response from many educators **(Gardner, 1983).**

❖ **"Additional intelligences"** – The concept includes classifications of: naturalistic intelligence - the ability of people to draw upon the resources and, features of the environment to solve problems.

- o **Spiritualistic intelligence –** the ability of people to both access and use, practically, the resources available in somewhat less tangible, but nonetheless powerful lessons of the spirit.
- o **Moral intelligence** - the ability to access and use certain truths.

❖ **"Emotional intelligence"** is one of the remarkable educational concept of the current century proposed by Goleman in 1994.

Salovey and Mayer (1990) defined EI as "The subset of social intelligence that involves the ability to monitor one's own as well as others' feelings and emotions, to discriminate among them and to use this information to guide one's thinking and actions."

In Goleman's analysis the term encompasses the following characteristics and abilities:

1. **Self-awareness –** Knowing one's emotions, recognizing feelings as they occur and discriminating between them.
2. **Mood management –** Handling feelings so they are relevant to the current situation and appropriate reaction to it.
3. **Self-motivation –** "Gathering up" one's feelings and directing oneself toward a goal, despite self-doubt, inertia and impulsiveness.
4. **Empathy –** Recognizing feelings in others and turning into their verbal and non-verbal cues.
5. **Managing relationships** – handling interpersonal interaction, conflict resolution and negotiations.

Thus, in Goleman's opinion, "Emotional intelligence is a master aptitude, a capacity that profoundly affects all other abilities, either facilitating or interfering with them," Emotional intelligence has proven a better predictor of future success than traditional methods like IQ and standardized test scores. The key ingredients for this understanding are:

- **confidence**
- **curiosity**
- **intentionality**
- **self-control**
- **relatedness**
- **capacity to communicate**
- **ability to cooperate.**

Basically a student having high EI learns to learn and is much more apt to succeed.

In addition to advanced folds of cognitive mental capacity being pillars of new mode of education in the current century, certain other psychological concepts, surely including the additional and emotional intelligence dimensions of cognitive reality lead us to emotive folds of advanced context relevant educational system of today. The major impact of these concepts are generating

certain self-principles that usher in philosophical modes of alteration in character through education. These are:

COGNITIVE EMOTIONAL REGULATION :

Impulses are endogenous processes with us. Satisfaction deriving drives constantly pamper our mental states to opt for pleasure-seeking, then and there. Satisfaction deriving mode of behaviour lacks emotional maturity, keeping reasoning at a distance. To be healthy mentally, self-education inspires to have control of emotionality or regulating emotions at per with the demands of the situation. Such self-orientation not only generates self-confidence and invites organization in personality, but helps individual to develop an inner space of tranquility and happiness.

VALUE EDUCATION :

Mankind is caught in a great illusion of solving problems through scientific and technological progress, greater knowledge, wealth, power and greater control through legislation, political and social reforms. Certain problems can be solved with all these, but they are temporary cures. By these methods, we shall go on creating new problems of life on one hand and trying to solve them on the other to maintain the illusion of progress. **Prakash (2000)** observed that present day youths of our society are under negative influence of Western modern culture and are caught in the vortex of changing values and attitudes of traditional societies, known as six-C society that stand for:

- **Car**
- **Credit Card**
- **Condominium**
- **Corporate job**
- **Charisma and**
- **Cash.**

These are the status symbol for youths of the day. Thus mankind is passing through an age of fleeting values with the accent on materialism. Life has become an artificial embellishment. But when the mask is discarded by a single jostle of this rough world, darkness and mystery seem to pervade everywhere. This helpless condition must be changed. Societies must undergo transformation in a direction that the elements of societies understand and practice higher values of life.

The call for values is currently echoing in every land, as educators, parents and even children are increasingly being concerned and affected by

violence, growing social problems of materialistic orientations and the lack of social cohesion. Living Value Education (LVE) envelopes 12 key personal and social values to be developed for a better world and better life. The values are:

- **Cooperation**
- **Freedom**
- **Happiness**
- **Honesty**
- **Love**
- **Peace**
- **Respect**
- **Responsibility**
- **Simplicity**
- **Tolerance**
- **Unity**
- **Humility.**

Value education implies that "fruitful education" is the kind used for our own welfare as well as that of others. This is possible when one has both academic and value education. Values represent the highest and most powerful individual capacity for accomplishment. As skill direct the use of physical energy, values direct the use of the psychological energy of the personality. Therefore, the highest levels of individual and social accomplishment demand very high values.

SPIRITUAL EDUCATION :

In the entire educational system, intellect and intuition, science and spirituality, living and learning have to be promoted in a balanced manner. Lack of spiritual knowledge makes one grope in the dark and alienated from his "self," society and environment. His mind would suffer from indecision and his actions become aimless. Spiritual education is vital for the future of our planet. We need to find the reality of an existence that is peaceful, compassionate, sustainable and of freedom, spirituality is the quest for inner peace. A mature spirituality is home for the restless heart. Spirituality consists of a relationship with "Transcendent." Once the connection of human and divine is recognized, appreciated and nurtured, the effects are expected to include:

- **Increased self-awareness**
- **Sensitivity to the needs of others**
- **The sense of wonder, and**
- Most importantly, **the feeling of being at one with the created world,**

the strength of power 'not to avoid life but to meet life with serenity despite conflicts and stresses.' 21st century's time-covering on world badly needs such self-orientation to juggle between instinctive impulses and available material resources with that of inner peace orientation and a fulfillment of wisdom attainment.

THE IMPLICATIONS OF THESE PSYCHOLOGICAL APPROACHES IN TODAY'S WORLD :

Hence, a child is educated by the entire environment in which it grows, that environment is determined equally by the parents, the teachers and the society around him/her. All these and more, determine the kind of individual we produce, which in turn, determines the kind of society we live in. If we produce individuals who are self-centered, aggressive, ambitious, greedy and overly competitive, one cannot organize them into a society that is non-violent, peaceful, cooperative and harmonious. It is not possible to bring a fundamental transformation in society unless the individual is transformed. True social change is the major responsibility of education, not merely the production of trained personnel.

At the beginning of the 20th century human society, all over the world, was beset with tremendous problems of natural disasters, famines, epidemics, primitive transportation, inefficient communication, lack of health care and poor agriculture. Our system of education has helped us to change all that, to develop all the knowledge and the power that was necessary to make the transition to the modern society in which we live today. There may still be some parts of the world that are struggling to make those changes, but at least we know how to do it. The great strides that we have made in this century in the field of engineering, medicine, agriculture, transport, telecommunications and power are all a direct consequence of our achievements in education and we have reason to feel proud of what we have achieved. However, the problems of 21st century are totally different and are waiting for solutions through better organization, more efficiency and more power. Here lies the implication of psychological approaches of this century being discussed earlier to erase or lessen a whole lot of problems from the social life scenarios **(Krisna, 1997).** The sketches of these problems are:

EDUCATIONAL PROBLEMS OF CURRENT CENTURY :

1. Groupism – Human beings are divided into groups – racial, national, religious, linguistic, economic, political, professional – and each individual identifies with his or her own group, feels rivalry with other groups and cares for security and progress of a particular group. The net result is violence, in the form of wars, terrorism, rioting and growing militancy. The malady is affecting everybody and needs true educational intervention.

2. The power unleashed by science and technology – Human history has been a history of wars. Mankind is in the danger of annihilating itself in a nuclear war owing to galloping scientific and technological advancements. At the moment, we really cannot afford to postpone the solution to this problem.

3. The environmental catastrophes – Media is revealing the news of depletion of the ozone layer, global warming, industrial pollution, deforestation, soil-erosion, nuclear fall-outs and over population. The root cause is our attitude towards nature in the course of this century treating it as a resource, meant to be exploited for our benefit. But it is high time to realize that we may have better computers and faster planes, but we will not have fresh air to breathe and new diseases, caused by the disequilibrium, will make life not worth-living.

4. Dictatorship – Most governments in the world (especially in the third world countries), are still dictators – military dictatorships, communist dictatorships, religious dictatorships and dictatorships in the garb of democracy. But dictatorships stifle dissent, they prompt people what to think, what to do and what not to do. This is the sign of lack of psychological education. Education must bring out the right use of power in the true spirit of democracy.

5. The breakdown of the family – The institution of marriage and family was set up partly to regulate sexual behaviour but more importantly, to ensure our responsibilities toward the next generation. Involved in the concept is a whole lot of new dimension of mental, emotional and spiritual growth. But cooperation between man and woman is breaking down at a higher speed and consequently the children are suffering and juvenile crime is on the rise consistently.

6. The inertia in society – society tends to replicate itself. Prejudices and illusions tend to continue from one generation to the next and so do the problems associated with them. Prejudices of elders continue in the young and so does the problem of animosity that needs correction through fresh education.

PSYCHOLOGICAL PRESCRIPTIONS FOR HEALTHY EDUCATION:

So, to have a clear vision of education for the 21st century, the psychological prescriptions that seem relevant are as follows. The prescriptions would not be identical for all countries and different cultures may go about it in their unique way, but the broad outlines can be stated as:

- **Create a global mind, not a nationalistic one -** We may work for local problems but it is important to do so with a global understanding.
- **Emphasize human development, not only economic -** Education must not regard children as raw material for achieving the economic progress of the nation. They must be respected irrespective of their abilities. Goodness must be valued above efficiency.

- **Encourage inquiry, not conformity –** The present emphasis in the world on individual achievement for name and fame is irrational and egotistic. But everybody should realize that we need to work just not for personal gain, but for the welfare of the whole community, with love instead of arrogance.
- **Create a learning mind instead of an acquisitive mind –** The feeling of love, respect, beauty, friendship cannot be taught but like sensitivity, it can be awakened and this is an essential part of emotional intelligence.
- **Create a mind that is both scientific and religious in the true sense** – Science and religion are both quests for truth into complimentary aspects of a single reality which is composed of both matter and consciousness. Without a deep understanding of our relationship with nature, with ideas, with fellow human beings, with society and a deep respect for all "life," one is really not educated.
- **The art of living** – Education must concern itself with the art of living creatively, which is much vaster than the specific arts of painting, music or dance which we teach at present. When we educate not for economic development but for human development, we must concern ourselves with the happiness of the individual as a whole. More important in life, other than comfort, is the ability to work with joy, without comparing oneself with others. If one is insensitive, there is constant boredom and to escape from it, a constant pursuit of pleasure.
- **A holistic development of all faculties –** The list may include the following:
  - a) **Intrinsic :** Perception, awareness, observation, attention;
  - b) **Thought-based :** Knowledge, memory, imagination, reason, analysis, criticism, science, mathematics, language, concentration, intelligence, will;
  - c) **Feeling-based :** Joy, beauty, wonder, aesthetics, humour, art, music, poetry, sympathy, love, affection, compassion, friendship, attachment, desire, jealous, anger, violence.
  - d) **Beyond thought and feeling** – Intuition, insight, vision, wisdom, silence, meditation, peace, harmony, understanding, emotional intelligence.

In a holistic educational plan all these faculties must develop in a balanced way. Education entails character integration, linking self with outer reality in balanced fashion and become the meeting spot of generativity, if attained properly by oneself, to continue/ sustain mental ecology in the flows and frames of societies of future days.

REFERENCES

Achilles, C.M., Linz, M.N. and Wayson, W.W. (1989). Observations on building public confidence in education. *Educational evaluation and policy analysis, **Vol., 11, No. 3,*** 275-284.

Acker, S. (1986). *What feminists want from education*, in A. Hartnett and M. Naish (Eds.) Education and Society Today, Gewes: Falmer Press, 63-75.

Bailey, C. (1984). *Beyond the present and the particular: A theory of liberal education.* London: Roultedge and Kegan Paul.

Barrow, R. (1990). *Curriculum theory and values*, in Entwisle, N. (Ed.) Handbook of educational ideas and practices. London: Roultedge, pp. 110-117.

Darling, J. (1986). Child-centered, gender-centered: a criticism of progressive curriculum theory from Rousseau to Plowden, *Oxford Review of Education*, 12.

Entwistle, N. (1990) (Ed.). *Handbook of Educational Ideas and Practices.* Roultedge, New York.

Gardner, H. (1983). *Frames of Mind.*

Gardner, H. (1993). *Multiple intelligences: The theory in practice.* New York Basic Books.

Golby, M. (1990). *The multiple functions of education*, in Entwisle, N. (Ed.) Handbook of educational ideas and practices. London: Roultedge, pp.128-136.

Goleman, D. (1994). *Emotional intelligence*.

Hartnelt, A. and Naish, M. (1990). *Schooling and society,* in Entwisle, N. (Ed.) Handbook of educational ideas and practices. London: Roultedge, pp. 12-22.

Krishna, P. (1997). *High education for the 21st century.* A talk delivered at the XXII International Montessori Congress held at the University of Uppasala, Sweden from 22nd to 27th July.

Krishnamurti, J. (1955). *Education and the significance of life*. Gollancz, London.

Phillips, G. (1990). *Personal, social and moral education,* in Entwisle, N. (Ed.) Handbook of educational ideas and practices. London: Roultedge, pp.61-71.

Prakash, B. (2000). *21ST century development challenges*, Chandigarh Commonwealth Secretariat, Commonwealth Youth Programme.

Rogers, C.R. (1959). A theory of therapy, personality, and interpersonal relationships, as developed in the client-centered framework. In S. Koch (Ed.), *Psychology: A study of a science* (Vol.3), New York: McGraw-Hill.

Salovey, P. Mayer, J.D. (1990). Emotional intelligence: Imagination, *Cognition and Personality, 9(3)*, 185-211.

Vygotsky, L.S. (1978). *Mind in society: The development of higher mental processes.* Cambridge, MA: Harvard University Press. (Original works published 1930, 1933, and 1935)

Walkling, P. (1990). *Multi-cultural education*, in Entwisle, N. (Ed.) Handbook of educational ideas and practices. London: Roultedge, 82-90.

BHARAT BRAND ENGLISH : ITS JOURNEY THROUGH THE YEARS

—Rhitabrata Chatterjee

The above phrase was coined by Narayan; noticed in the essay "Toasted English", a phrase which evokes the brownness of the Indian skin and hence the hybrid nature of English in India. The time has come for us to consider seriously the question of a Bharat brand of English. [...English must adopt the complexion of our life and assimilate its idiom...Bharat English will... have a swadeshi stamp about it unmistakably, like the Madras handloom check shirt or the Tirupati doll...]. ("Toasted English", A Story Teller's World). The Indian variety of English is uniquely distinct from American English, Canadian English, Australian English, British English and other mother-tongue varieties of English. The speech of an Indian, speaking in English share many features of the Indian code with which English alternates in the daily round of activities. This is not unnatural for we must realize that English does not necessarily mean "British" or "American English". While talking about "Indian English" S. K. Verma of CIEFL concludes that they are not corrupt but different forms of the same language. In order to solve the problem of expressing in English, moods, that are typically Indian the writers have had to borrow words and expressions from Indian language or to produce translation equivalents of these expressions.

"The study of English has always been a densely political and cultural phenomenon a practice in which language and literature have both been called into the service of a profound and embracing nationalism. The development of English as a privileged academic subject in nineteenth-century Britain-finally confirmed by its inclusion in the syllabuses of Oxford and Cambridge, and reaffirmed in the 1921 Newbolt Report - came about as part of an attempt to replace the Classics at the heart of the intellectual enterprise of nineteenth-century humanistic studes". (*The Empire Writes Back*). From the beginning, proponents of English as a discipline linked its methodology to that of the Classical, with its emphasis on scholarship, philology, and historical study - the fixing of texts in historical time and the perpetual search for the determinants of a single, unified, and agreed meaning.

The historical moment which saw the emergence of 'English' as an academic discipline also produced the nineteenth-century colonial form of imperialism. Gauri Viswanathan has presented strong arguments for relating the institutionalization and subsequent valorization of English literary study [to] a shape and an ideological content developed in the colonial context', and specifically as it developed in India, where:

British colonial administrators, provoked by missionaries on the one hand and fears of native insubordination on the other, discovered an ally in English literature to support them in maintaining control of the natives under the guise of a liberal education.

It can be argued that the study of English and the growth of Empire proceeded from a single ideological climate and that the development of the one is intrinsically bound up with the development of the other, both at the level of simple utility (as propaganda for instance) and at the unconscious level, where it leads to the naturalizing of constructed values (e.g. civilization, humanity, etc.) which, conversely, established 'savagery', 'native', 'primitive', as their antitheses and as the object of a reforming zeal.

"A 'privileging norm' was enthroned at the heart of the formation of English studies as a template for the denial of the value of the 'peripheral', the 'marginal', the 'uncanonized'. Literature was made as central to the cultural enterprise of Empire as the monarchy was to its political formation. So when elements of the periphery and margin threatened the exclusive claims of the centre they were rapidly incorporated." (*The Empire Writes Back*). This was a process, in Edward Said's terms, of conscious affiliation proceeding under the guise of filiation, that is, mimicry of the centre proceeding from a desire not only to be accepted but to be adopted and absorbed. It caused those from the periphery to immerse themselves in the imported culture, denying their origins in an attempt to become 'more English than the English'.

Though Mulk Raj Anand, Raja Rao and Narayan were the three 'angry young men' who in the 30's developed and contributed in the formation of the Bharat-brand of English, each in his own way attempted at a distinctive style of "Indian English" which was free from the slavish imitation of the colonial masters quite unlike that of their predecessors. Indo-Anglican literature started in the XIX th century by contributing to the colonial effort. L. De Rozario and T. Dutt even though they expressed their love for India, were basically imitators. They much like T. S. Eliot and Henry James attempted to be 'more English than the English'. De Rozario imported the sonnet into Indian poetry and all early Indo-Anglian poets were influenced by the European Romantic Movement. Their ambition was to reach the linguistic perfection of Oxbridge English in their poetry. But the 'trio' wanted to do some thing new. The literary ideal of the three novelists were beautifully worded by Raja Rao in the introduction he wrote to his novel, *Kanthapura* :

"We are instinctively bilingual. We cannot write like the English. We should not. We cannot write only as Indians. We have grown to look at the large world as part of us. Our method of expression therefore has to be a dialect which will

someday prove to be as distinctive and colourful as the Irish or the American. Time alone will justify it"

Post-colonial literatures undertake journey through varied stages which can be seen to be equivalent to stages both of national or regional awareness and of the project of emphasizing distinction from the colonial centre. For Edward Said there are two stages in the process of colonization - first, in the physical and geographical sense and secondly in the cultural, social and ideological realms. Timothy Brennan, in his *Salman Rushdie and the Third World : Myths of the Nation* accuses *Salman Rushdie of* "cosmopolitanism" (mllange) and refers to Jose Carlos Mariategui, the latter pointing out three phases to a country's literature : the colonial, the cosmopolitan and the national. Brennan further insists that a cosmopolitan balance is generated from the sense of insecurity about one's national identity. During the imperial period writing in the language of the imperial centre is inevitably, of course, produced by a literate elite whose primary identification is with the colonizing power. Thus the first texts produced in the colonies in the new language are frequently produced by 'representatives' of the imperial power; for example, gentrified settlers, travelers and sightseers or the Anglo-Indian and West-African adminsitrators and others.

Such texts can never form the basis for an aboriginal culture nor can they be incorporated in any way with the culture which already exists in the countries invaded. Despite their detailed reportage of landscape, custom, and language, they inevitably privilege the centre, emphasizing the 'home' over the 'native', the 'metropolitan' over the 'provincial' or 'colonial', and so forth. On an introspective level their claim to neutrality simply serves to veil the imperial discourse within which they are created. That this is true of even the conscious literary works which emerge from this moment can be illustrated by the poems and stories of Rudyard Kipling. The second stage of production within the evolving discourse of the post-colonial is the literature produced 'under imperial license' by 'natives' or 'outcasts', for instance the large body of poetry and prose produced in the nineteenth century by the English educated Indian upper class, or African 'missionary literature'. The producers signify by the very fact of writing in the language of the dominant culture that they have temporarily or permanently entered a specific and privileged class endowed with the language, education and leisure necessary to produce such works. It is quite symptomatic of this period-texts to be silent about any effort of subversion as they were directly under the control of the imperial centre which prescribed the theme and also the nature of depiction and treatment. And any deviation from this frustrated their desire of being tagged as a classic or a 'classic-in-making'.

One of the main features of imperial oppression is control over language. The imperial education system installs a 'standard' version of the metropolitan

language as the norm, and marginalizes all 'variants' as impurities. Language becomes the medium through which a hierarchical structure of power is perpetuated, and the medium through which conceptions of 'truth', 'order', and 'reality' becomes established. Such power is rejected in the emergence of an effective post-colonial voice. For this reason, the discussion of post-colonial writing which follows is largely a discussion of the process by which the language, with its power, and the writing, with its significanton of authority, has been wrested from the dominant European culture.

In order to focus on the complex ways in which the English language has been used in these societies, and to indicate their own sense of difference, we distinguish in this account between the 'standard' British English inherited from the empire and the english which the language has become in the post-colonial societies. Though British imperialism resulted in the spread of a language, Enlish across the globe, the english of Jamaicans is not the English of Canadians, Maoris, or Kenyans. We need to distinguish between what is proposed as a standard code, English (the language of the erstwhile imperial centre), and the linguistic code, english, which has been transformed and subverted into several distinctive varieties throughout the world. For this reason the distinction between English and english will be used throughout our text as an indication of the various ways in which the language has been employed by different linguistic communities in the post-colonial world.

The use of these terms asserts the fact that a continuum exists between the various linguistic practices which constitute english usage in the modern world. Although linguistically the links between English and the various post-colonial englishes in use today can be seen as unbroken, the political reality is that English sets itself apart from all other 'lesser' variants and so demands to be interrogated about its claim to this special status.

In practice the history of this distinction between English and english has been between the claims of a powerful 'centre' and a multitude of intersecting usages designated as 'peripheries' was shaped by an oppressive discourse of power. Yet they have been the site of some of the most exciting and innovative literatures of the modern period and this have at least in part, been the result of the energies uncovered by the political tension between the idea of a normative code and a regional usage.

I know that my English is not English
The music I seek in the words
Or in their premeditated silence is not English.

Its half-Orissan, half-Indian,

It gives me the flavour of watered rice,

The fragrance of plough-shares and soil

(From *Prayers to Lord Jagannatha,* Niranjan Murthi)

In the linguistically and culturally pluralistic Indian sub-continent English is used as the Second Language (L2), which is acquired after one has learnt the First Language (L1). This co-existence of English, the Foreign Language (FL) and the First language results in interference from one's First language in the Second Language. Through a large-scale socio-cultural interaction with regional contexts English becomes Indianised. A variety of English albeit non-native, lexically, morphologically, syntactically and socio-linguistically different from the Standard British form has come to be known as Indian Variety of English (IVE). Indian Variety of English should not be considered as the vulgarized form of English but creative and resourceful with distinctive individualistic sociolinguistic features. As there is no comprehensive homogeneity in the use of language in a multilingual country like India. *Indian Variety of English* is not sufficient enough to describe all the regional varieties of English in respective geopolitical identities. For definite geographical boundaries, sociolinguistic backgrounds and several other decisive reasons several varieties of IVE such as Bengali English, Gujrati English, Oriya English etc. have come into existence. Each kind of IVE has specific characteristics. T. Balasubramanian a famous phonetician proposes the idea of *General Indian English* (GIE), GIE model is used to commonly shared phonological properties of several varieties of IVE. For example, in GIE the voiceless plosives are unaspirated in all positions, whereas in RP (Received Pronounciation) they are aspirated when occur at the initial position in stressed syllables. GIE is essentially a non-literal spoken model. I'm not going to examine the spoken, non-literal data in my research project. I'll restrict myself to literary data only. My project reflects Indian ness of Indian English used in English. Indian ness get reflected in lexical, morphological, syntactical and discoursal identities of Indian English.

Language and literature are socio-cultural and political phenomena. It is related to national identity and pride. English, as a link language in India, carries the weight of different experiences in different contexts / surroundings. English is essentially malleable in nature, adapting its form to suit cultural contexts.

Indian English is different since the Indians look at the world ina particular way. According to Raja Rao, "India is not a country (desa), it is a perspective (darsana), it is not a climate but a mood (rasa) in the play of the Absolute; it is not the Indian who makes India but 'India' makes the Indian, and thus India is in all". Indianness is a particular way of looking at life and socio-cultural habits which are special for us. The *transference of mother tongue patterns into*

English serves to overcome the problem of 'linguistic alienation'. What Chinua Achebe, a celebrated Nigerian novelist, says of the African writers applies equally to the Indian English writers :

It will have to be new English in full communication with its ancestral home but altered to suit its African surroundings.

English has been nativised through the process of socio-linguistic acculturation in Indian context. B. B. Kachru refers to this linguistic phenomenon as 'hybridization'. Nativisation is the "adaptation of a language to a speech community's particular needs". Nativised language bridges the cultural gap and makes the use of the alien medium more acceptable to non-native speakers themselves.

In the case of literary Indian English, loan translations or word borrowings form the regional languages of the sub-continent and are embedded in the English text, as markers pointing out a cultural distinctiveness. The writers of Indian writings in English often refuse to gloss untranslated words / expressions to be true to their respective roots. *Lexical openness* is a trademark of Indian English cannon. This reflects postcolonial cultural nationalism in a power-politics scenario.

In the thick of anti-British agitation Mulk Raj Anand, Raja Rao and Narayan successfully dissociated the English Language from the British presence in India. They used the language of the colonizer to chase the colonizer! In those days when no-one knew what would be the future of "English" in India, Anand sought Gandhi's moral support : "I asked Bapu Gandhi if it was wrong for me to write in English". The old man said : "The purpose of writing is to communicate is n't it? If so, say your say in any language that comes to hand." From the start Anand made it clear that he wanted to create a new type of English. "… I tried to translate it (English) into the metaphors and the imagery of the Punjabi and the Hindusthani. If the resulting style is awakward, it is not unlike Irish English or Welsh English, with a rough rhythm of its own".

But Narayan's English stands in a class of its own. No one ever tried to imitate it. Whatever the character or the situation his English remains neutral; possibly this was Narayan's way to show that English was an artificial language in India, imported and imposed, which could render every Indian sensibility but which remained a thin veneer plated on to the local Indian linguistic reality. Anand, though he included local words and expressions, clearly indicating the cultural differences which existed between the two cultures, tried to merge both of them (cultures). Every noun referring to cooked food is in the original language. Words like "*tree-house people*" (K,12), "*the next-house woman's kitchen*" (K 28). If one compares the description of Forster's Chandrapore in *A Passage to India*, one is struck by the Indianness of Rao's style.

While talking about Narayan's English, we find that it not only conveys an

Indian sensibility but it also fits to perfection the literary ambitions of the author. In the thirties, Narayan used few Indian words in his novels and those he included in his texts were familiar to the English reader : 'dhoti', 'lungi', 'sari' ... or words belonging to the semantic field of religion : 'pundit', 'brahman', 'kurma', 'puja' ... Food items are neither translated nor described : 'chapati', 'chutney', 'ghee' ... To describe what just does not exist in England, Narayan had no option but to create new expressions which could not surprise the Western reader because their structure was English : 'mud-oven' (DR,12), 'worshipping-room' (DR, 7).

Thus, we may conclude that even if we judge 'the trio' from the modern day perspective, we can hardly negate their contribution in the formation of present day 'Indian English'. The modern day writers in their texts (Rushdie's *Midnight's Children* or Upamanyu Chatterjee's *English August*) while giving vent to their Indian thoughts in "Indian English" take to the path shown by 'the trio'. The moderns follow the same techniques, used by Anand, Rao and Narayan, in trying to communicate their 'Indian ideas' to non-Indian readers.

A meticulous analysis of Indian novels in English indicates a chronological maturity in dealing with the English language in the aftermath of the Independence. The non-native English Writers' experimentation with language, form and theme raises several questions. Indian novels in English in the pre-Independence period count for linguistic creativity and resourcefulness. The above analysis of Rao and Anand reflect the Indian sensibility. Their novels reflect the thematic as well as linguistic Indianism. V. K. Gokak in his *Foreword* to Asit Bandyopadhyay's *History of Modern Bengali Literature* writes :

By 'Indianism' is generally meant a word, phrase, idiom, expression or point of syntactical usage which is not a part of current English or American usage and involves a shade of meaning or usage which is peculiarly Indian or is reminiscent of the lexis, idioms, phrases, or syntax current in one of the modern Indian languages.

"A careful sociolinguistic study of pre-independence Indian English novels makes it abundantly clear that Indian writers have found their voices and have produced a significant body of Indian English novels that is truly Indian. Do Mulk Raj Anand and Raja Rao's introduction of native language and use of nativised style make their contribution obscure? It's hard to accept that linguistic deviations have Indian and pan-Indian intelligibility. These are natural consequences of the socio-cultural and linguocultural condition in the Indian context in which English is used." *(Indian Novels in English : A Sociolinguistic Study).*

An introspective study of the novels of the post-independence phase may betray a maturity in the treatment of form, language and theme. Some major

themes that reflect Indian sensibility in their treatment are : East-West encounter; struggle for Independence; the great impact of Indo-Pak partition; contemporary social issues. The novels of R. K. Narayan, Khuswant Singh and *et al* reflect Indian ness both in theme and treatment. As for the device they preferred the sprinklings of Hindi or / and Bengali expressions, mainly words, with or without translations. The major thrust of these novels has been to look at the use of English by non-English speaking characters in a non-English-speaking world.

The modern English novels in India exhibit the confrontation between modernity and post-coloniality in various ways. The new ones quite unlike there forefathers don't find it hard to express their social and cultural heritage in an alien language. The colonial discourse of power dynamics envisages the twin process of subversion of the cultural milieu of the colonized and imposition of the colonizer's language upon the latter. The post-colonial novelists in many diglossic socio-cultural contexts like Africa, Australia and India want to subvert these twin processes. It remains to be open-ended whether such a 'decolonizing' 'project is 'false' and 'ultimately contradictory' :

It is false because it confuses usage with property in its view of meaning, and it is ultimately contradictory, since, of it is asserted that words do have some essential cultural essence not subject to changing usage, then post-colonial literatures in English, predicted upon this very changing usage, could not have come into being (Ashcroft).

The post-colonial cross-cultural texts establish a 'now devised post-colonial variety of English :

The post-colonial texts of the diglossic societies [...] use a language which is different from the language of power and given the writer an amplitude of freedom which conformity to the metropolitan / standard variety so far denied.

Aijaz Ahmad in his famous article "The Politics of Literary Post-Coloniality" quotes Williams *et al* to show the differences of opinion regarding the 'language of the Empire' :

[...] Postcolonial writers who write in the language of the Empire are marked off as traitors to the cause of reconstructive post-colonialism [...] Postcolonial writers compose under the shadows of 'death'.

In turn, English is practically the official language of India; and the craze or as a matter of fact the usage of this language is ever increasing. The linguistic creativity and resourcefulness of the post-colonial writers do not create cultural difference. They write for a culture compromise through the artistic alchemy of so-called standard language of the empire and indigenous / native / local variety. The novels of Amitav Ghosh see the juxtaposition of the local and the standard language giving rise to code - mixing to reflect the sociolinguistic hybridity in

Indian context without disturbing the so-called Standard English syntactical format to incorporate *linguistic hybridity*, which is one of the sociolinguistic nuances in a multilingual country like India. Though Wole Soyinka in *Myth Literature and the African Novel* may advocate a return to the native languages but in India the writers prefer 'hybridization'. Critics have repeatedly accused the Indian writers because of this element of 'hybridization'. But it should be kept in the mind that 'eclecticism' is nothing uncommon to the Indian subcontinent. Rushdie comments, 'as far as India is concerned … it is completely fallacious to suppose that there is such a thing as a pure, unalloyed tradition from which to draw'. Over against the dogmatic ideologies of the communalists, which he sees as threatening to tear India apart, Rushdie sets hybridity. Hybridization is not essentially 'a lack of security'. To assert this element of identity, indigenous words and expressions have been freely accommodated in the writings of Indian writers in English. Amitava Ghosh doesn't go for morphological, syntactical and stylistic innovativeness to transgress the norms of so-called acceptability. He opts for the half-hearted abrogation of the language of the centre and appropriation of that language for the expression of post-colonial experience. He doesn't go for the total refusal of the colonizer's code and context. *The Calcutta Chromosome* unfolds the socio-cultural nuances of the two opposite societies : the society of the colonizer led by Ronald Ross and the society of the 'other' (colonized) led by Mangla.

The God of Small Things has been praised for its "verbal wizadry" and "verbal exuberance". Arundhuti Roy constantly breaks the conventional and accepted rules of language. She writes in an iconoclastic style truly different from that of other Indo-English novelists. Her style doesn't match Mulk Raj Anand's, filled with Punjabi expletives and frippery translated into English or Bhabani Bhattacharya's style of transcreation of vernacular discourses into English. Roy writes "with a linguistic exuberance which lends a flavour and colour, though artificial of its own to the entire novel". Her novel has been scrutinized negatively again and again for her "over-writing", of "typographical tweenness" and self-indulgence. Her linguistic deviation includes syntactical deviation, morphological deviation, punctuational deviation, and stylistic deviation. Nativisation of English is one of the seminal issues of *The God of Small Things*. This Nativisation is achieved by incorporating stylistic resourcefulness, creating a language variance from the so-called standard variety by interweaving indigenous regional terms with the conventional English, or by using hybridized words and phrases, unglossed expressions, and syntactical variations. The novel is written in a style of 'half English, and half Indian'. It excludes English from any sociable code of communication, excepting the hybridized (as well as *vernacularized*) speech acts of the discourses in Indian English.

OUR ALMA MATER—A MEMORABILIA

—Prof. Amar Nath Ghosh

After the observance of the glorious Golden Jubilee Celebration in a befitting manner the college had to face some problematic situations as a result of some inevitable changes in the staff and also in respect of the pressing demands for admission to the college.

In 1960 a group of Russian educationists paid a visit to the college.

In 1964 an Education Commission was set up by the Govt. of India under the Chairmanship of Dr. Durga Sankar Kothari with a view to Considering the question of national development through education. This commission was given the responsibilites of suggesting ways and means and recommending effective steps for the overall social change to link education with national development and also considered education as an effective instrument of bringing in changes in the society. Consequently the commission recommended several changes in the systems of education of the country where people would have a newer dream to make their lives qualitatively improved and educational facilities quantitatively expanded to a considerable extent. The commission also expressed its pious wishes to bring in a somewhat revolutionary change in the role of education in the society. In the language of the commission the destiny of India is being shaped in her classroom. As a sequel to this, modern methodologies were searched vigorously newer evaluation teachinques were thought of, novel curricula were suggested to bring in characteristic advancements in the thought process of the upcoming generations by increasing their curiosity, eagerness to know and develop a cougenial attitude towards learning. This would help improve the power of thinking of the learners, create an insightful approach towards problem solving and help develop appropriate skills to create useful and efficacious materials to be used in life for its quality impovement.

These newer outlook of the commission created a great commotion in the national life and the shake was also felt by the education circle to open up new vistas of formal education.

Our college being inspired with these new ideas and thoughts, views and aspirations, matter and tones of the commission, adopted certain progressive measures to open up 'an evaluation unit and a 'wood carft unit" in the college. The Bureau of Educational and psychological Research unit associated with the college also plunged into various activities like preparing test materials for school Guidance and revitalising 'The Adolescent Guidance centre!'

In 1964, the University of Calcutta brought in changes in the B.Ed. Curriculum and syllabi where emphasis was laid on community living and co-curricular activities. Even in this decade a remarkable change did take place in respect of the nomenclature of the degree/training couse. It was B.Ed. in place of B.T. A newer and wider interpretation was given to the course.

The extension service Department and the Adolescent Guidance centre were actively engaged to justify their existence by arranging various academic activities for teachers and providing remedial education to the adolescents who desperately needed some guidance for their rehabilitation. The college also undertook a scheme of Intensive school improvement programme in 10 schools. By undertaking such developmental activities the college provided the needed leadership to the field of education.

During the latter part of the seventies, the NCERT held a seminar on Preparation of self learning materials where the teachers of this college contributed papers and took active part in making the seminar a success. Under the guidance of the Extension service Department 3 seminars of 4 day duration were held where the secondary school teachers demonstrated keen interest enthusiasm in getting themselves acquainted with newer metholdologies and approaches to teaching. In 1978, with the helps of UNICEF and Govt. of West Bengal a 15-day orientation course on Science education for Primary Teachers was held quite successfully and effectively.

In 1983 the college observed its platinum Jubilee celebration. Immediately before this S.C.E.RT was established in the college campus for want of consistent records, the activities of the college could not be accounted for in greater details. However the college maintained its progressive standard and played its constructive role in the field of teacher education. At least the trainees could express their frank confessions of experiencing a kind of change in their outlook and attitude by getting themselves trained from their college.

In 1995, the college attained a glorious position and status by opening up an IASE unit. This was a rare achievement of the college in the days of its historic existence. From 2002-2003 session a new course of the Calcutta University was opened in the college under the nomenclature M.Ed. of one-year duration. The N.C.T.E., the apexbody for Teacher Education had also given its recognition to this course. The college with all its departments got an accelerated growth and development by instituting IASE and the M.Ed. course.

One hundred years of existence in the life of an institution may be considered as an achievement par excellence. The founding fathers, the dedicated teachers the visionary principals, the avowed sincere workers, numerous devoted students all contributed their mite for the progress and glory of this illustrious institution of this part of eastern India.

If is also named after the hallowed memory of a sage like "David Hare", a great friend of the Indians.

We all hope that this alma mater of ours would bring more laurels from far and near and also provide the beckon light to the field of education in general and the area of teacher education in particular.

Long live David Hare Training College.

ANNEXTURE-III

List of Activities of IASE David Hare Training College during the year 2007 :

The Institute of Advanced Studies in Education- David Hare Training College organized the following activities :

1. Seminar on "Gradation System" - A New Approach to Evaluation in Secondary Education, held on 23rd March, 2007.

2. Inter-College Debate on "Reservation of Backward class is Desirable for their development" held on 24th March, 2007.

3. State level seminar-cum-workshop on "Quality Teacher Education" held during 25th Marth to 27th March, 2007.
4. Launching of Website www.dhtc-iase.org and Broadband Internet Connection by the Honourable Minister-in-Charge, Higher Education, Govt. of W.B. on 27th March, 2007.

5. Workshop for M.Phil. students held on and from 13th May to 27th May, 2007.

6. A workshop was organized for M.Phil (Education) students covering all the semesters under NSOU, at this college during 20th May-2nd June, 2007.
7. Inauguration of year-long centenary celebration program of the college on 1st July, 2007. Sri Budhadeb Bhattacharjee, Hon'ble Chief Minister, Govt of West Bengal graced the occasion as chief guest. Hon'ble Higher Education Minister, Hon'ble PWD Minister, Vice Chancellors of Calcutta University and Jadavpur University, Addl.Chief Secretary and DPI, Govt. of West Bengal attended the function as special guests and guest of honour respectively.
8. Publication of centernary celebration souvenir, list of dissertation under-taken M.Phil students and proceedings of the seminar on "Quality Teacher Education on 1st July, 2007.
9. Seminar on "Effectiveness of present evaluation process at secondary level; a critical view", held on 2nd July, 2007.
10. Outreach activity organized by the DHTC, Teachers & Students of B.Ed. Curriculum as a part of their activity in the nearby slum of the college named "Piara Bagan Basti" during the period 17th July to 23rd

July, 2007. Extensive survey on illiteracy, drop out problems from the schools & health activity adult education.

11. Organized state level Quiz and Talk competition of environmental education under the banner of IASE-NSOU & All India Science Teachers Association (WB) and a Lecture Demonstration by Dr. Debiprasad Duari, Director, Birla Planetarium, Kolkata on "Space Science" on 21st and 22nd July, 2007 respectively.

12. Griffith Lecture : On 5th August 2007, Joint program with WBGCTA, Griffith Lecture delivered by Prof. D. P. Duari on Voyage to the Cosmos.

13. During the year of centenary celebration, on 24th August, 2007, a memorable speech was delivered by Sri S. B. Mishra, Chairman, Eastern Regional Committee, NCTE ; David Hare Training College and IASE organized a well decorated reception to the Chairman and all the members of the Eastern Regional Committee of the NCTE.

14. Seminar on "Quality Improvement in Education : Management Perspective", held on 5th September, 2007 on the occasion of Teachers' Day, Hon'ble School Education Minister W. B. Sri Partha De inaugurated the seminar. Swami Sarbapriyanandaji, Registrar, Ramkrishna Mission Vivekananda University graced the occasion as Chielf Guest.

15. Seminar on International Literacy Day, Literacy in India and abroad : present Scenario, held on 8th September,2007 on the occasion of World Literacy Day.

16. State Level workshop on "Pedagogical Analysis in the Perspective of Modern Teaching Strategies of School Subjects". On and from 3rd October to 13th October, 2007. The Teaching Educators of 80 (eighty) Secondary Teacher Education Colleges of W. B. attended the Workshop.

17. Organized demonstration on modern methods of science teaching under the banner of David Hare Training College & Science Communicators' Forum on the 9th Oct. 2007 in the college auditorium.

18. Kaveri Dasgupta Lecture : On 28th October, 2007, Joint program with NSOU-IASE. Lecture given by Dr. D. P. Duari Director, Birla planatorium, Prof. A. Das, Controller NSOU, Prof. A. B. Aich, Director of Study Center, Dr. K. K. De, Member, PSC, WB were Present.

19. 15 day workshop for M. Phil. Students during October 21st to 4th November, 2007. Experts from 5 State Universities, 32 counsellors and 250 Students of M. Phil. in Education of NSOU-IASE attended the workshop.

20. Seminars were organized by M.Ed. Students of the session 2007-2008 on 12 priority areas of education on 19th, 22nd, 23rd, 26th November, 2007.

21. "Education Today" a regular publication of the college published every year.

22. Seminar & Workshop publications are published regularly.

23. 30th December, 2007 - World Human Rights Day observed.

24. 21st February, 2008 - International Language Day observed.

25. 26th and 27th March, 2008 - UGC sponsored State Level Seminar on "Inclusion in Education"—Barriers and challenges.

26. 28th March, 2008 - Seminar on "Theoretical Aspect and Effectiveness of Teacher Education."

27. 30th & 31st March, 2008—State level seminar sponsored by Higher Education Department, Govt. of West Bengal on "Education for Bio-Remediation - A Pedagogico Analytic Approach".

(Dr. P. K. Choudhuri)
[Principal & Head,
Institute of Advanced Studies in Education
David Hare Training College &
Ex-Officio Chairman of Netaji Subhash Open
University Study Center of IASE-NSOU]

NAMES OF TRAINEES

Names of Trainees : 1980-81

Hiren Chattopadhaya
Chunilal Sarkar
Chaitanya Mondal
Ashok Kumar Bag
Md. Abdul Hashim Haldar
Chandra Kumar Manna
Bansari Gopal Pradhan
Rajibar Rahaman
Sunil Baran Bera
Nuhu Nabi Jamadar
Jyotirmoy Ganguly
Nilmadhab Roy Chowdhury
Shyampada Samanta
Syama Prasad Das
Kanailal Patra
Pankaj Kumar Maji
Kanai Lal Mahapatra
Murari Mohan Pramanik
Maniklal Samanta
Ram Chandra Adhikary
Mohan Chandra Roy
Mihir Lal Mandal
Abdul Motaleb
Prosanta Kumar Choudhury
Subimal Kanti Das
Ajit Kumar Mandal
Asoke Nath Kumar
Tarit Bhusan Kundu
Md Eaqub Ali
Timir Kumar Chakraborty
Somnath Ghosh
Dr. Haran Chandra Haldar
Binoy Kumar Majhi
Sri Sukes Chandra Mandal
Sri Haripada Bhuina
Sri Kartik Chandra Mandal
Dr. Anathbandhu Bhattacharya
Alok Kr. Nag
Mahadeb Sahu
Sibendu Dey
Samir Kr. Pathak
Md Badaruddoza
Zubair Ahmad
Badal Ch. Manna
Radhashyam Pandey
Supratik Sarkar
Rezaul Karim
Sk. Khoda Boksa
Phulena Prasad Singh
Gour Chandra Ghosh
Tarit K. Mukhopadhyay
Bishnupada Dutta
Sekhar Ch. Porel
Shyamal Kumar Kandar
Jyotirbikas Chowdhury
Gobinda P. Bondyopadhyay
Arun Baran Sarkar
Chandan K. Mukhopadhyay
Subhas Chandra Maity
Anath Chandra Paral
Ashok Kumar Sen
Amar Mukherjee
Ashis Kumar Jana
Joydev Kumar
Amal Kumar Das
Barun Kumar Nath
Bijoy Kumar Das
Asoke Chottopadhyya
Chandi Charan Mandal
Biman Mohanto
Gautam Chattopadhyay
Sk. Masudur Rahaman
Sarwardi Khan
Asoke Kumar Tarhdar
Gourango Bandopadhyay
Sk. Imdatul Haque
Dhiren Kumar Shannigrahi
Radha Shyam Kundu
Amal Kumar Maitra
Niharendu Karati

Dinesh Ch. Bhattacharya
Haripada Sarkar
Subrata Bhattacharya
Dipankar Roy
Nirmalya Sarkar
Tarun Ch. Karmakar
Probal Kumar Bhowmick
Prashanta Roy
Rasamoy Kundu
Ananta Kumar Bhanja
Md. Yamin Ali
Shyamal Kr. Chattopadhyay
Himanshu Sekhar Kundu
Subodh Kumar Mukherjee
Nikhilesh Mandal
Subrata Maji
Rananjoy Chattopadhay
Pranab Kumar Biswas
Ajit Kr. Maiti
Pradyumna Kumar Roy
Jagadananda Howly
Paresh Nath Bhandari
Chandan Kanti Ghosh
Dilip Kumar Kole
Abdul Kaium Zamadar
Md Hasan Ali
Gautam Kumar Khan
Pranay Kumar Karmakar
Santi Ranjan Kundu
Rita Brata Sarkar
Gopal Chandra Das

Puranjay Chattopadhyay
Pradip Kumar Nandan
Dhiren Ch. Dutta
Malay Kumar Guin
S. K. Abul Kalam
Siddheswar Ghosh
Kanai Lal Ghosh
Tapas Kumar Jana
Sicansu Kumar Sardar
Bhola Nath Roy
Dulal Chand Brahma
Bikash Ghosh
Ashit Baran Bera
Lakshmi Naryan Pal
Baranasi Kundu
Abdus Sobhan Azad
Asok Kumar Mandal
Gobinda Chandra Patra
Jiban Krishna Majumder
Arun Kumar Maiti
Abdul Aziz
Sisir Kumar Mandal
Sri Pankaj Kumar Mandal
Md. Sahi Dullah Gazi
Patit Paban Tripathy
Md. Mosier Rahaman
Tapan Kr. Paul
Satyendra Nath Maji
Tarit Kumar Banerjee
Amal Majumdar

Names of Trainees : 1981-82

Kamal Chandra Teli
Sunil Kumar Giri
Sibnath Chakraborty
Gangadhar Khan
Girja Kumar Lal
Bijoy Kumar Das
Nirodranjan Aditya
Purnendu Mondal
Pankaj Kumar Bera
Sukha Ranjan Guha
Banamali Panda
Dipak Bikash Mitra
Samir Kumar Banerjee

Smritikantha Bag
Matrikaprasad Mahato
Arup Kumar Mukhopadhyay
Sudhis Sarkar
Md. Abul Hossain Sanful
Gourhari Santra
Himangshu Sekhar Das
Rajkumar Jana
Shyamal Kumar Roy
Prosanta Kumar Dutta
Asitbaran Bhaumik
Bhaskar Chakraborty
Sunip Roy

Parimal Roy
Samir Kumar Chaki
Gouri Sankar Das
Amiya Kanti Das
Satis Chandra Majumdar
Md. Amir Hassain
Gorachand Das
Nirmal Kumar Mondal
Sk. Iqubal Hossain
Sushil Kumar Acharya
Netai Chandra Maity
Samar Singha Maity
Md. Hafiz Mondal
Sunil Kumar Ghosh
Sk. Zahiruddin
Nazrul Islam Mallick
Ramdhan Sarkar
Rabishankar Giri
Abdul Hannan Sheikh
Sabyasachi Patta Nayak
Nimai Chand Naskar
Prajapati Misra
Anukul Chandra Mondal
Subrata Kr. Roy
Paresh Nath Mondal
Himangshu Kumar Mridha
Kshirode Ranjan Mistry
Saktipada Sahoo
Jafrul Alam Khan
Pulinbehari Manna
Krishna Kanta Das
Ashraf Hossain
Md Safiqul Haque
Rabindranath Ghosh
Sujay Kumar Maity
Parthasarathi De
Md. Habibullah
Amit Kumar Mukopadhyay
Phuleswar Misra
Tapan Banerjee
Tapan Kumar Adhikary
Raj Kumar Jayaswal
Amiya Kumar Ghosh
Anandadulal Bag

Kamalesh Kumar Jana
Rabindranath Mukherjee
Arun Kumar Das
Mahbub-al-Mokerar
Janardan Halder
Debdatta Bandyopadhyay
Sukumar Samanta
Tushar Baran Pal
Subrata Kumar Sen
Abhijit Barua
Kaikobad Biswas
Amal Kumar Biswas
Sachindranath Mondal
Lakshmikanta Maity
Abhoy Kumar Pathak
Suresh Kumar
Sk. Najibar Rahman
Jatin Chandra Das
Kamal Kumar Maity
Sushanta Kumar Manna
Gopal Kumar Banerjee
Abdul Rab Ansari
Asit Kumar Parichha
Bishnupada Dutta
Subir K. Bandyopadhyay
Mrinal Kanti Pathak
Tapash K. Choudhury
Subal Kumar Barik
Niharendu Nanda
Nirmal Chandra Santra
Ramprasad Sen
Tapan Kumar Das
Jaydeb Adak
Nabakumar Paladhy
Subhash Chandra Roy
Saikh Mahamad Hanif
Pijush Kumar Singha Barma
Mirza Jalaluddin Ahmed
Mahadev Kar
Jatindranath Roy
Kabi Kanta Pathak
Arabinda Ghosh
Ranjit Kumar Hari
Kazi Abdur Rahman

Rafiquddin Ahmed
Ujjwal Kumar Das
Dibakar Ghosh
Bejoy Krishna Manna
Pradip Kumar Chandra
Pradip Kumar Chowdhury
Iswarchandra Maiti
Ashok Mandal
Alok Chowdhury
Jaganath Mitra
Satinath Chakraborty
Swapan Kumar Ghosh
Gopal Chandra Ghosh
Sankar Kumar Dutta
Shyama Pada Pan
Lakshmi Narayan Chattopadhyay
Malay Chatterjee
Sunil Kumar Mondal
Sujit Mukherjee
Sujit Kumar Sinha
Dipankar Barik
Ananda Dulal Das
Jayanta Kumar Das
Arup Kumar Ghosh
Jogesh Chandra Singha
Nitai Chattopadhyay
Rashid Ahmed
Tapan Kumar Saha
Karunasindhu Saha
Md. Abul Hasnat
Subodh Kumar Das
Bikash Kumar Roy
Dilip Kumar Ghosh
Arup Kr. Mukhopadhyaya
Swapan Kumar Mukhopadhyaya
Tapan Goswami
Tapan Kumar Atta
Sujit Kumar Patra
Sunil Kumar Bhunia
Pradip Das
Jagat Bandhu Giri Chowdhury
Kaliprasad Haldar
Sobh Nath Singh
Abdur Rahman Dhali
Arifuddin Ahmed
Tarapada Dhara
Uday Chand Adhikary
Prabir Kumar Dasgupta
Sandip Banerjee
Ranjit Kumar De
Ashok Kumar Das
Sanjoy Chatterjee
Abani Kumar Howly
Snehashis Chowdhury
Kajal Barik
Md. Abdul Kayum Laskar
Shishir Kumar Adhikari
Rampada Bhowmick
Partha Sarathi Dasgupta
Mani Kumar Paul
Mrityunjoy Naiya
Asim Kumar Chakraborty
Majiruddin Ahmed
Sukumar Ghosh
Sujauddin Middya
Gautam Chandra Mayra
Shilbhadra Sanyal
Md. Alamgir
Syed Mohammad Shabbar
Rabindranath Bandyopadhyaya
Sugata Mitra
Pradip Kumar Basu
Gouridas Ghosh
Bishnupada Roy
Asit Das
Debasish Ghosh

Names of Trainees : 1982-83

Sasadhar Jana
Parimal Kumar Chakraborty
Asit Kumar Das
Subhas Chandra Chatterjee
Biswajit Chakraborty
Kali Pada Mondal
Amiya Kanti Barui
Habibur Rahman

Md. Naimuddin
Prabhas Kumar Bhattacharya
Tapan Kumar Saha
Dhrubajyoti Dwaitari
Shwapan Kumar Ghosh
Tarun Kanti Sen
Dulal Chandra Mahapatra
Dipak Kumar Mukherjee
Shaikh Golap Nobi
Dilip Kumar Dutta
Rafique Uddin Ahmed
Khairul Islam
Utpal Kumar Samanta
Sudarshan Samanta
Jayanta Kumar Halder
Amulya Kumar Halder
Kalipada Das
Pranab Kumar Maiti
Joydeb Sardar
Sukumar Mitra
Jhantu Kumar Maiti
Biswanath Halder
Debasish Mishra
Md. Omar Ali
Ranjan Chandra Kumar
Pradip Banjerjee
Keshab Chandra Das
Shyamsundar Das
Amitava Manna
Panchanan Kumar Patra
Gunamoy Roy
Udayshankar Bhattacharya
Ramsudha Bandhopadhyay
Bipul Chandra Bag
Sankar Kumar Mukhopadhyay
Sadhan Kumar Sarkar
Kartick Chandra Pradhan
Abdul Ahad Ali
Md. Ansarul Haque
Ratikanta Samanta
Sirshendu Das
Bijoy Kumar Sen
Sisir Kumar Chai
Jagadish Chandra Sahoo

Swapan Kumar Bose
Prafulla Kumar Saha
Bhagirath Jana
Md. Barjahan Sardar Ali
Soumendra Das
Debaprasad Das
Asoke Kumar De
Dilip Kumar De
Himangshu Sekhar Nandi
Abdur Rashid Laskar
Nitaichand Manna
Sk. Aynal Haque
Samir Kumar Bandyopadhyay
Probodh Chandra Mondal
Sankar Majumdar
Sukumar Naskar
Anil Kumar Bakuli
Prabir Chakraborty
Pulak Ranjan Dutta
Md. Abdul Majid Ali Molla
Durgapada Mahato
Rathindra Nath Maiti
Ashoke Kumar Das
Sisir Kumar Kamilya
Md. Abedali Mollah
Sekhar Mondal
Braja Gopal Biswas
Nitya Ranjan Ghosh
Shankar Deb Mondal
Sk. Mustak Ahmed
Buddhadev Das
Nimai Ghosh
Gurupada Jash
Sk. Mofezer Rahman
Safiuddin Mallick
Asoke Muhuri
Bimal Kumar Roy
Syed Abdus Salam
Dwijen Pal
Pabitramoy Mukhopadhyay
Samar Kumar Gangopadhyay
Swapan Chandra Ghosal
Gouri Sankar Dey
Pinaki Sinha

Kunal Kumar Adhikary
Md. Fazloor Rahaman Mondal
Bhagyadhar Das Karmakar
Niranjan Naskar
Bratendra Nath Baitalik
Swapanendu Roy
Biman Kumar Mahata
Biswanath Gayen
Nasiruddin Ahmed
Santosh Kumar Chakraborty
Pradip Kumar Chakraborty
Hassan Shaidullah Ashrafi
Ranjan Chakraborty
Pranab Saha
Satya Ranjan Basu
Harendranath Pailan
Santanu Das Gupta
Utpal Raha
Gobinda Barman
Paritosh Kumar Kayal
Md. Abdul Khaleque Biswas
Bijoy Krishna Pradhan
Dhirendranath Bag
Jyotirmoy Majumdar
Pijush Kumar Baishya
Haridas Gharai
Shyamsundar Hajra
Kanchan Kumar Mukhopadhyay
Sanatan Shit
Pradip Kumar Ghosh
Anup Kumar Biswas
Ranjan Kumar Mondal
Prabhas Chandra Nandi
Debasis Chakraborty
Shaikh Sirajul Haque
Subhas Chandra Sasmal
Biswananjan Samanta
Pranay Chakraborty
Asoke Kumar Dey
Monomohan Mukherjee
Nand Kumar Mishra
Tapas Kumar Bhattacharya
Pranabesh Bhattacharya
Kajal Kumar Giri
Md. Asgore Hossain
Sudhir Kumar Patra
Asis Chandra
Susanta Sekhar Sardar
Arabinda Kar Mahapatra
Pankaj Kumar Bhattacharya
Dinabandhu Mandal
Asis Kumar Mondal
Bishnupada Bera
Gangadhar Mondal
Sribash Chandra Mondal
Anup Kumar Banerjee
Tapan Kumar Mishra
Lala Kumar Baidya
Tarapada Haldar
Alokenath Bag
Abu Sayeed Md. Quamarul Ahsan
Aloke Ranjan Bhattacharya
Tapas Kumar Das
Shibcharan Das
Subrata Haldar
Achyuta Bhattacharya
Treta Kumar Dubey
Bikash Chandra Samanta
S. M. Sarfuddin
Bibekananda Sen
Gopal Chandra Biswas
Md. Abbas
Pranab Kumar Bose
Hiralal Das
Debdas Basu
Prakash Chandra Roy
Harendra Nath Mandal
Swapan Kumar Chatterjee
Pulak Ranjan Dutta
Md. Ali Kadar Biswas
Nemai Ghosh

Names of Trainees : 1983-84

Ajit Kumar Maity
Anil Kumar Sahoo
Tapas Sinha Roy
Sibaprasad Ganguly
Madhusudan Samaddar
Ashini Kumar Biswas
Aniruddha Pati
Tapan Kumar Das
Gautam Banerjee
Sunirmal Das
Ajay Kumar Ghosh
Jayanta Sukul
Nemai Chandra Mondal
Tushar Kanti Bhattacharya
Sudipta Kumar Mondal
Alok Kumar Maiti
Rajendra Prasad Hazra
Pradip Kumar Dhar
Panchanan Naskar
Utpal Kr. Mandal
Ashis Kumar Chatterjee
Siddique Rahman Mallik
Srijee Kr. Khatua
Bhakta Ranjan Pathak
Gagan Chandra Patra
Sajal Kanti Chatterjee
Debashis Chakraborty
Hemanta Kr. Patra
Krishnapada Mandal
Sunil Kanti Baidya
Sati Nath Bera
Sabuj Dasgupta
Subal Ch. Giri
Abudal Mumu
Samar Kr. Mallick
Debashis Das Mahapatra
Ashis Kr. Chakraborty
Ratan Kr. Mitra
Krishnapriya Mukherjee
Subrata Kumar Ghosh
Banamali Maity
Bidhan Chandra Das

Sudasan Bhunia
Sagar Sudha Patra
Jyotirmay Bhattacharya
Bipad Bhanjan Pal
Subrata Kumar Hait
Abu Nashim Shahabuddin
Biswajit Das
Rajaul Karim
Shyamal Kumar Niyogi
Debanka Sekhar Mishra
Guruprasad Maiti
Debashis Maiti
Satyanarayan Das
Arun Bhattacherjee
Ram Krishna Tripathi
S. K. Arfan Ali
Ashok Chabraborty
Umaprasad Hazra
Sanjib Kumar Roy
Somnath Majumdar
Haripada Mukherjee
Asit Baran De
Shyamal Kumar Giri
Gautam Roy
Tapas Kumar Tripathi
Tapan Kole
Sukesh Chandra Mondal
Chandra Nath Bandopadhyay
Sekhar Debnath
Balaram Karmakar
Pijush Chatterjee
Hafiz I Haque
Jayanta Chowdhury
Sujit Gopal Maji
Bibekananda Pati
Asit Kumar Ghosh
Amitava Kundu
Tapan Kumar Das
Surendra Prasad Show
Safdar Ali Khan
Md. Abdul Kium Molla
Tushar Kanti Biswas

Pranab Mukherjee
Mohiuddin Piada
Rabindra Nath Dutta
Asok Kumar Dinda
Sadhan Kumar Saha
Sujit Kumar Chakraborty
Kalyan Sasmal
Pradip Kumar Dhar
Paresh Nath Gandhi
Uttam Chakraborty
Archan Samajdar
Md. Kased Ali
Subhas Chandra Mandal
Sukumar Chandra
Md. Nojrul Islam
Somnath Nandi
Dhirendra Chandra Chakraborty
Samar Kumar Karmakar
Alok Chatterjee
Aravinda Nayek
Santosh Kumar Paul
Pradyot Kabiraj
Gopinath Dey Chowdhury
Gopal Chandra Mallick
Sanat Kumar Paul
Pradip Mohanty
Shib Sankar Chowdhury
Asim Kumar Mukherjee
Alok Bhattacharya
Azizul Haque Munshi
Bidyut Baran Sarkar
Badal Chandra Dutta
Subhas Chandra Gayen
Lakshman Kumar Mandi
Nityananda Sikdar
Tarapada Ghosh
Basudev Banerjee
Ranjit Kumar Hazra
Prasanta Gopal Hazra
Chittya Ranjan Hazra
Munshi Jalaluddin
Ajijur Rahaman
Saktipada Bhattacharya
Md. Anowarlal Hassan

Karali Prasad Mandal
Subrata Hazra
Md. Idrish Ali
Surendra Deb Sarma
Kazi Safiar Rahaman
Asok K. Ganguly
Ashis Kr. Patra
Nurul Islam Sk.
Md. Aminuzzaman
Anup Kr. Ghosal
Jainal Abedin
Dilip Kr. Das
Kartik Ch. Das
Manabendra Seth
Chittaranjan Kha
Dilip Kr. Roy
Astaa Roychowdhury
Sunirmal Kar
Swapan Kr. Khan
Nritya Gopal Ghosh
Shibendu Mukherjee
Md. Baijid Hussain
Prabir Paul
Minik Ch. Basu
Nazrul Haque
Prodip Basak
Amal Paul
Alok Sarkar
Basuki N. Bhandari
Ramjiban Garai
Sk. Abdul Mannan
Amritlal Manna
Asis Das
Ananda Dulal Das
Amalendu Chanda
Sukumar Guria
Baburam Ghosal
Amaresh Mukherjee
Asis Kumar Pan
Prabhat Kumar Ghosh
Md. Ahasanullaha
Sukumar Pramanik
Saroj Kumar Chakraborty
Tapan Kumar Sarkar

md. Mustafa
Abdul Mannan Biswas
Amalendu Mandal
Serajul Haque
Abdul Sobhan Mondal
Abdul Hannan Munshi
Asoke Adhikari
Monoranjan Panja
Subrata Kumar Dhar
Ajay Banerjee
Hriday Ranjan Ghosh
Sujit Kumar Das
Kamal Kishore Das
Haripada Mondal
Saroj Kumar De
Rabi Roy
Paritosh Kumar Roy
Haijeene Ali Molla
Samsuzzaman Ahmed
Palit Praban Paik
Bhagirath Pandey
Bhaskar Jyoti Bose
Phani Bhusan Sen
Kalidas De
Pankaj Kumar Sarkar
Sk. Haider Ali
Anjan Kumar Sengupta
Md. Iyar Ali Molla
Debprasad Roy
Sukumar Dhara
Bibhu Ranjan Giri
Ajit Kumar Patra
Tamal Gupta
Prasanta Kr. Deb
Sukumar Maiti
Kazi Ilias Ali
Pradip Kr. Ghosh
Subrata Sinha Roy
Rupak Hom Roy
Sujit Bhattacharya
John Kr. Mandal
Arun Kr. Manna
Md. Nasir Ali Ansari
Dilip Kr. Syamal
Dilip Banerjee
Molla Badrul Hassan
Rabindra Nath Kundu
Sitansu Mukherjee
Salil Kr. Banerjee
Alok Ganguli
Chanchal Banerjee
Asoke Sarkar
Motish Banerjee
Dilip Kr. Sarkar
Harasit Kr. Mallick
Mahadeb Khan

Names of Trainees : 1984-85

Nabakanta Payta
Phatik Mandal
Akbar Ali Biswas
Bidyut Kumar Nayak
Pravas Ranjan Mandal
Kalipada Acharya
Kripasindhu Das
Gunadhar Mandal
Juran Ali Mandal
Niranjan Roychowdhury
Prabir Mazumdar
Arun Kumar Sengupta
Santosh Kumar Mandal
Sukhendu Kumar Ghosh
Gurubar Ghorai
Sachindranath Dandapat
Kartik Chandra Bhowmick
Sukhendu Bikas Das
Tamal Kumar Datta
Mukul Pal
Nikhil Kumar Kar Mahapatra
Md. Shanawaz
Haradhan Konar
Sukumar Adak
Bijan Kumar Nag
Tapan Kumar Das

Anadi Mohan Halder
Dipak Kumar Bhattacharya
Kalyan Kumar Maity
Soumendu Bikash Ruj
Goutam Sarkar
Sukumar Roy
Subrata Sinha Roy
Sudhir Kumar Roy
Arun Kumar Ghosal
Asit Kumar Roy
Alok Kumar Chandra
Prasenjit Pramanik
Md. Abdur Rab Mandal
Tapas Kumar Bani
Subal Chandra Giri
Gopal Chandra Halder
Md. Azmiul
Balai Chandra Kundu
Manoj Talukdar
Pratap Chandra Bhattacharya
Becharam Patra
Ratan Kumar Mustafa
Sushil Kumar Ghow
Mandan Mohan Gangopadhyaya
Madhu Sudan Roy
Enamul Kabir Siddiqui
Md. Reazul Islam
Mahadev Halder
Braja Gopal Das
Bimal Krishna Mondal
Nikhil Ranjan Pal
Nagendra Kumar Upadhaya
Bibekananda Chakrabarti
Chinmoy Bhattacharya
Ashutosh Bera
Shyamal Kumar Rana
Ganesh Chandra Panda
Dilip Kumar Chakrabarty
Arun Kumar Biswas
Goutam Bandyopadhya
Jagannath Pal
Tapan Kumar Das
Kantilal Nath
Asim Kumar Midya

Kanti Chandra Pal
Anup Ghosh
Partha Sen
Rabindranath Giri
Gobindadas Ganguly
Amrit Kumar Nandi
Sadhan Chandra Man
Ganesh Chandra Parui
Debendranath Kundu
Basudeb Chandra
Balaram Biswas
Prasanta Kumar Maity
Ananda Dulal Bag
Ramjiban Mahato
Anup Kumar Banerjee
Madhusudan Pramanik
Sudhinath Sarkar
Prabhat Kumar Dey
Samir Kumar Gupta
Harendranath Mandal
Md. Sayed
Uday Sankar Bhattacharya
Smriti Kumar Mitra
Rabin Bhar
Md. Abdur Rahman
Prafulla Kumar Bhatta
Gobinda Kumar Chakraborty
Sk. Safikul Alam
Sushil Kumar De
Dilip Kumar Das
Partha Sen
Malay Kumar Chattopadhyay
Somnath Manna
Deb Kumar Chakraborty
Abdul Hadi
Sunil Kumar Biswas
Surajit Gayen
Ashis Hazra
Naba Kumar Pathak
Ramanath Bhattacharya
Debabrata Dey
Nityanarayan Bhattacharya
Kamal Chandra Roy
Sk. Giyasuddin Ahummed

Sukhendu Kumar Ghosal
Ranjit Kumar Nayak
Arun Kumar Banerjee
Satyapada Dekshit
Manoranjan Roy
Santosh Kumar Mandal
Amitava Roychowdhury
Bijay Krishna Mandal
Surajit Sengupta
Sanatan Chakrabarti
Tafazzal Hossain
Tarasankar De
Panchanan Mandal
Alokananda Samanta
Pradip Kumar Ghosh
Prankrishna Bandopadhyay
Himanshu Sekhar Mandal
Kanak Kumar Kundu
Swapan Kumar Mandal
Chandan Prasad Chakrabarty
Ramkrishna Kundu
Sushil Kumar Deb Roy
Sandip Kumar Roy
Chitta Ranjan Biswas
Birendra Biswas
Ramai Chandra Panja
Hari Sankar Das

Sofikul Islam
Ashim Kumar Chattopadhya
Pijus Kumar Das
Subrata Saha
Subrata Gupta
Nimai Chandra Pandit
Asoke Kumar Taraphdar
Prakash Kumar Roy
Soumendranath Mukherjee
Raicharan Maji
Subal Chandra Ghosh
Utpal Kumar Basu
Kalipada Mandal
Asoke Kumar Saha
Uttam Mandal
Rabin Pal
Mahammed Shamim
Sukumar Jana
Nirendra Kumar Chattopadhay
Kajal Kanti Mazumder
Taraknath Adhikari
Basudev Chandra Saha
Tapodhir Kamal Pandit
Ramkrishna Maiti
Sukhendu Bikash Bandopadhyay
Swapan Kumar Chakraborty
Tarak Das Mazumder

Names of Trainees : 1985-86

Sanjib Kumar Sarkar
Dwipendra Nath Adhikary
Md. Mohbubul Haque
Nalinakshya Paul
Swapan Kumar Banerjee
Sukhendu Ruj
Manotosh Sadhukhan
Anil Chandra Paul
Prasanta Kumar Nandi
Amiya Kumar Mahanti
Ratan Kumar Sarkar
Binod Behari Bairagi
Rothindranath Kundu
Bidhubhusan Mondal

Samir Kumar Manna
Sukumar Chandra Das
Md. Mobarak Hossain
Pradip Kumar Chakraborty
Md. Farazul Islam
Shah Johur Ali
Alakesh Chaulya
Shibsankar Mitra
Baidyanath Hazra
Kaliprasad Mukherjee
Miiza Abdul Mabood
Sukhendu Bikash Mondal
Harendranath Bala
Amareshwar Ghosh

Gopinath Baur
Rabindranath Dalal
Bijan Kumar Panda
Ramanjan Lahiri
Ashoke Kumar Ghosh
Ashoke Kumar Roy
Malay Kumar Ghosal
Md. Samsuddin Mandal
Keshab Chandra Jana
Ranjit Kumar Kundu
Sukumar Paira
Manindranath Paul
Bikash Kanti Samanta
Madan Mohan Patra
Bijan Kumar Mandal
Abdul Lahil Baki
Arun Kumar Mandal
Mrinmoy Samajdar
Paritosh Kumar Gayen
Ratan Kumar Das
Sajal Kumar Biswas
Rabindranath Dutta
Subrata Banerjee
S. M. Saha Azam
Joydev Ghosh
Nagarendra Kabiraj
Sukumar Mandal
Nitai Chandra Ghosh
Pradip Kumar Paul
Monoranjan Roy
Md. Ashraf Mollah
Tanmoy Goswami
Kazi Fazlur Rahman Siddique
Bhabananda Sarkar
Prabir Paul
Goutam Kumar Mishra
Sandip Bandyopadhyay
Pradyot Sinha
Abdul Odood
Subhas Chandra Patra
Shyamal Kanti Paik
Tapan Kumar Sarkar
Badal Chandra Bera
Binay Halder

Supravat Roy
Amalava Sanyal
Manojit Manna
Madan Mohan Bandopadhyay
Prabir Kumar Chattopadhyay
Md. Rejaul Hoque
Md. Mozammel Haque
Subrata Shee
Md. Rafikul Islam
Ujjal Kumar Batabyal
Pradip Kumar Swarnakar
Gobinda Prasad Halder
Apurba Sanyal
Sujit Kumar Chakraborty
Subal Chandra Paul
Anoarul Islam
Subodh Chandra China
Uday Chand Roy
Anukul Chandra Mandal
Prabir Kumar Bhaduri
Utpal Mazumdar
Pranab Kumar Acharya
Dilip Chakraborty
Bikash Chandra Bera
Brindaban Karmakar
Tapan Kumar Saha
Paritosh Kanti Mondal
Md. Sahadullah
Ajoy Kr. Bhadra
Ajit Kr. Mondal
Pankaj Kr. Roy
Biplab Naha Biswas
Goutam Kr. Chatterjee
Joydev Maity
Monoranjan Das
Rabindranath Mallick
Soumendra Samajder
Amit Kr. Das
Gopal Das Karmakar
Ram Chandra Saren
Sujit Kumar Jana
Alok Kumar Chanak
Gadadhar Naskar
Asit Baran Dutta

Kalyan Majumdar
Asit Ranjan Ghosh
Dibas Kumar Mondal
Kamalakanta Murmu
Tarun Kumar Samaddar
Sanat Kumar Halder
Durgapada Dutta
Swapan Kumar Mukherjee
Sitangshu Sekhar Mandal
Badaruddin Ahmed
Gomiruddin Miah
Diptimoy Sengupta
Parimal Kumar Ghosh
Alok Kumar Mukhopadhyay
Naresh Chandra Mondal
Md. Ayub Ali
Mukul Kumar Chattopadhyay
Swapan Kumar Mukhopadhyay
Srinibas Mondal
Md. Abdul Rahim Mollah
Sukriti Baral
Ratan Kumar Bhattacharya
Sukumar Dutta
Sisirendra Dasgupta
Dilip Kumar Ghosh
Shyamal Dutta
Bandhu Kishore Das
Sandip Karmakar
Sanjib Kumar Mukhopadhyay
Dulal Chandra Roy
Shyam Sundar Mukherjee
Sanjoy Kundu
Md. Safiullah Mollah
Madhu Sudan Mondal
Debidas Ghosh
Narayan Ranjan Acharya
Sujit Ghosh
Bijanbandhab Das
Swadhin Kr. Rooj
Alok Kr. Mukhopadhyay
Sk. Abdul Malek
Hari Kisun Ram
Rabindranath Mandal
Hemendranath Misra
Sudhanshu Sarkar
Giridhari Sinha
Gitendranath Das
Md. Abdul Mobin
Saktipada De
Tapan Kr. Mukherjee
Shyamal Kanti Das
Satyanarayan Dhar
Sakshigopal Chakraborty
Sk. Maniruddin
Krishnendu Lodh
Sarat Kumar Mandal
Tridib Chowdhury
Bijan Kr. Sarkar
Swapan Kr. Bhattacharjee
Enamul Kabir
Arunabha Mishra
Ratnadwip Nandi
Supriya Roy
Ajoysekhar Bhattacharjee
Ananta Kr. Kundu
Pralay Majumder
Amal Chakraborty
Nikhil Kr. Neogi
Prabir Kr. Das
Nirmal Kr. Pradhan
Jitendra Singh
Ajit Kr. Sarkar
Tapan Kumar Goswami
Ahibhusan Mandal
Abdul Hamid
Pranoy Dasgupta
Parimal Kanti Mallick
Shyama Prosad Panza
Majibur Rahaman
Asit Kumar Roy
Amiya Ranjan Sanyal
Md. Nasim
Md. Din-E-Islam
Benoy Kumar Mondal
Tapan Kumar Pandit
Asim Kumar Khatua
Atindra Nath Das
Satyanarayan Santra
Nitai Pada Mondal

Names of Trainees : 1986-87

Madan Mohan Giri
Sarfarajuddin Chowdhury
Md. Jalaluddin Sarkar
Jaykanta Mondal
Pradip Kumar Pal
Santiram Santra
Pratik Chakraborty
Bikash Hore
Monoj Mohan Guha Neogy
Moloy K. Pal
Nepal Ch. Banik
Rajendra Prasad Chatterjee
Madhai Chandra Karmakar
Abdus Samad Ahamed
Anup Chowdhury
Debabrata Gangopadhyay
Sankar Prosad Nag
Mrinal Ch. Basak
Akhil Kumar Das
Affazuddin Ahamed
Biswajit Singha
Somnath Chowdhury
Krishnaratan Hazra
Sudip Kumar Ray
Santosh Kumar Kapri
Md. Faizul Mian
Shib Sankar Raoniar
Pranabendu Adhikari
Ritinkar Dutta
Sanjay Kr. Bhuinah
Ashim Kumar Bhowmik
Goutam Kr. Kanji
Nazimuddin Biswas
Ashes Kumar
Biswanath Bhandari
Probodh Kumar Banerjee
Sukamol Si
Anjan Kumar Kanjilal
Dr. Dipak Mukherjee
Abul Kalam
Chowdhary Lia Ibrahim
S. K. Nurul Islam
Ashis Kumar Maity
Swapan Kumar Saha
Parameswar Dinda
Satya Ranjan Jana
Debasish Dhang
Debabrata Roy
Sanjib Chakraborty
Kaustav Kanti Das
Snigdhendu Satpathy
Ashok Kumar Sarkar
Kushal Kumar Ghorai
Dipti Chatterjee
Shah Alam Mondal
Vivekananda Bhattacharya
Mrinal Kanti Sikdar
Ganapati Das
Debasish Mukherjee
Md. Abdus Salam Molla
Ashok Kumar Pattanayak
Prafulla Biswas
Ashok Kumar Saha
Dhruba Das
Biswanath Naskar
Abhijit Kumar Pal
Tapan Kumar Roy
Kishori Mohan Debnath
Milan Kumar Ghosh
Sukdeb Halder
Apurba Kumar Banerjee
Timir Kumar Ray
Dilip Kumar Ghosh
Ashok Kumar Das
Manash Kumar Karan
Dilip Kumar Seth
Abdul Waresh Khan
Naranath Ghosh
Jatashankar Jha
Biswanath Mukherjee
Nachiketa Maity
Shyamal Kumar Pal
Sailesh Mukhopadhyay
Snehanshuranjan Ganguli

Sk. Abdul Malik
Dipak Chatterjee
Ramanikanta Raj
Amalendu Panja
Golam Kibria
Debanshu De Sarkar
Subhra Baran Bhattacharya
Tapas Mallick
Debasish Basu
Chandan Kumar Maity
Moloy Kr. Nayak
Nabendu Sarker
Kalipada Das
Khagendra Mukhopadhya
Debasish Dhar
Nabakumar Bej
Santosh Kumar Chattopadhyay
Sanatan Ghosh
Binay Kumar Kar
Md. Abdul Latif Mondal
Prabir Kumar Ghosh
Sukanta Kumar Sen
Sk. Rahamat Ali
Amar Bahadur Singh
Badal Kr. Jana
Pronab Kr. Chatterjee
Sunil Kumar Maity
Mukul Bandhu Purkait
Krishnapada Saha Roy
Ataur Rehaman
Shyamol Kr. Chakraborty
Biswanath Mondal
Aminul Ahasan
Amitava Maity
Kamal Kr. Pradhan
Md. Afsar Ali
Dipak Sengupta
Md. bodruddoza
Arup Kumar Sinha
Afsar Ali Molla
Tapan Kumar Da
Ashok Prosad Singh
Kamales Ch. Mondal
Samiran Chattopadhyay

Probodh Kumar Dey
Mrinal Kanti Sardar
Sudhir Kumar Mondal
Kumaresh Chandra Sarkar
Dipak Kr. Raja
Mukti Charan Mondal
Bimal Krishna Mondal
Keshab Chandra Sinha
Jagat Kumar Mahata
Sankarnarayan Jana
Asutosh Mondal
Nihar Kanti Mondal
Phanibhusan Mondal
Arun Kumar Sau
Srikanto Ghosh
Dulal Chandra Saha
Lakshman Jha
Amalendu Bhattacherjee
Nasimul Haque Biswas
Bhabani Prosad Misra
Prodip Saha
Swadesh Kr. Mondal
Sukla Kr. Mukhopadhyay
Bijoy Kr. Halder
Sagor Pal
Rebanta Ghosh
Nirendu Sengupta
Gour Mohan Pandit
Shamsur Jaman Mondal
Ajijur Rehaman
Sajal Kanta Kundu
Ranjit Kr. Mondal
Shyamaprosad Chatterjee
Abhijit Dasgupta
Sanatan Koley
Ranjit Kumar Pal
Manas Roy
Prankrishna Majhi
Krishna Chandra Bhattacharya
Milan Chakraborty
Parthosarathi Dutta
Sandipan Mahapatra
Biswanath Rakshit
Lalit Mohan Mondal

Nilkanta Das
Jaydeb Rong
Debasish Mondal
Dipendu Chowdhury
Sukanto Dutta
Subhas Banerjee
Somenath Singha
Biseswar De
Sukumar Bera
Amarnath Singh
Rajat Kr. Ghosh
Monoranjan Bera
Jayanta Chaudhuri
Tushar Kanti Halder
Subhas Chandra Ray
Sailendra Nath Naiya
D.bagh Ch. Sarkar
Satyendra Nath Das
Birendra Nath Mondal
Sankar Kr. Halder
Siddhartha Sankar Ghosh
Uttam Kr. Roy
Sailendranath Kewarh
Md. Mohamad Hossain
Binod Tudu
Tarapada Santra
Md. Abdul Kader
Arun Kiran Chatterjee
Siddhartha Sankar Chattopadhyay
Anup Kumar Ghosh
Narayan Das
Krishnasish Goswami
Debananda Bagchi
Dipendra Nath Ghosh
Md. Shoeb
Sukumar Bera
Arup Nath
Swadesh Chandra Ray
Nitish Kr. Bera
Brajkishore Trivedi
Sunil Kr. Patra

Names of Trainees : 1987-88

Abdul Aziz Mandal
Kazi Nazrul Islam
Sontosh Sharma
Matilal Jalan
Golam Rosul
Kedar Prasad
Pallab Kumar Dutta
Goutam Bose
Haripada Biswas
Sajal Bhaduri
Deepak Bhattacharya
Prabodh Kumar Patra
Salitananda Halder
Samiran Laha
Amitabha Roy
Bikash Chandra
Manidhar Kamaru
Soumendra Kumar Basu
Kanchan Bose
Ramgopal Nag
Pradip Sadhu
Makhan Kundu
Anup Kumar Das
Goursaran Dasgupta
Parimal Sarkar
Nirmal Kumar Roy
Mainur Miya
Subhas Chandra Samanta
Abdus Sattar
Afsar Ali
Satyakishore Dey
Ashok Kumar Agarwal
Samarendra Kumar Roy
Janak Chandra Sarkar
Ajit Kumar Das
Sisir Kumar Bhattacharya
Nityananda Ghosh
Shyamsundar Dutta
Sachinandan Mandal
Sunil Kumar Das

Bhiguram Dey
Surendra Prasad Sau
Tara Gangaram Das
Shyamal Mandal
Joydeb Mukhopadhya
Shyamal Kumari Maiti
Mustafijur Rahaman
Deep Narayan Jana
Himansu Kumar Dey
Tuhin Mondal
Gopal Chandra Mondal
Prasun Bhattacharya
Bhupen Roy
Achintya Kumar Lahiri
Jamsed Rahaman
Debasish Nag
Biplab Kumar Saha
Asim Dutta Chowdhury
Mukunda Bihari Biswas
Paritosh Dutta
Parmeshwar Sau
Samir Kumar Pal
Apurba Kabashi
Mridul Kumar Sarkar
Ananta Kumar Adhikari
Madhusudan Gayen
Saroj Kumar Maiti
Debabrata Baidya
Debabrata Chakarborty
Apurba Roy
Sidhartha Barman
Keshtaranjan Mitra
Goutam Kumar Mahartti
Narayan Chandra Ghosh
Nandadulal Chowdhury
Ranjit Sarkar
Subrata Chakraborty
Tarun Kumar Dey
Manojit Kumar Ghosh
Subhendu Bhattacharya
Hiranmoy Mandal
Md. Saiub Rahaman
Dharamdeb Sin
Tapan Narayan Basu

Kartik Kumar Kundu
Saiyed Anoyar Hussain
Subhankar Basu Chowdhury
Mukul Bandhu
Shyamal Kumar Gayen
Khysud Ikbal
Anil Kumar Das
Md. Alauddin
Amir Hussain
Modahar Mondal
Manas Kumar Bhandari
Ambika Jana
Radhakanta Das
Umasankar Mondal
Jitendra Nath Mallick
Gopal Chandra Mallick
Ajoy Guchhait
Prabir Kumar Bal
Bomkesh Biswas
Md. Iusuk
Bidyut Jyoti Roy
Asit Kumar Sen
Parbaticharan Ghorui
Kamal Kumar Niyogi
Parimal Chandra Pal
Mityunjoy Chattopadhyaya
Ashis Roy
Subhas Chakraborty
Arabinda Kumar Ghosh
Saheb Orao
Debashis Parui
Md. Mostab Ali Molla
Gopal Chandra Roy
Pradip Kumar Das
Dipendu Kumar Chowdhury
Krishnadas Halder
Sitaram Mondal
Prabal Kanti Roy
Nirmal Chandra Baidya
Subhas Chandra Mondal
Uttam Kumar Saha
Nilon Kumar Sarkar
Taoyabur Rahaman
Suroth Chakraborty

Krishnakumar Prasad
Sakti Poddar
Amal Kumar Deori
Md. Maminsar Rahaman Biswas
Md. Roidul Haq
Rabishwar Chatterjee
Jitendranath Dey
Ganendranath Majumder
Asil Kumr Sengupta
Kamal Kumar Jana
Md. Alau Taher
Subhas Bhadra
Md. Ayub Ali
Subrata Chandra
Abdul Haq
Surendranath Roy
Biren Kumar Sengupta
Gouranga Ghosh
Amitava Sarkar
Kashinath Pal
Niranjan Majumder
Saiful Islam
Bidyut Kumar Bhuni
Kallol Kumar Kundu
Saratchandra Sarkar
Prabir Kumar Das
Debashis Hazra
Arabinda Biswas
Ramkumar Panda
Partha Chowdhury
Durdanta Kumar Khatuya
Amalendu Mondal
Apresh Rath
Milan Kumar Giri
Atanu Bandapadyaya
Md. Rasbid Ikbal
Dinabandhu Barat
Sunil Kumar Sarkar
Kanailal Das
Siromani Pandu
Swapan Kumar Biswas
Chandrashekhar
Saibal Sinha
Shyamal Kumar Mondal

Sekh Nazrul Islam
Maheshwar Roy
Manoj Kumar Patra
Paritosh Roy Sarkar
Ganesh Chandra Halder
Tarun Sankar Kundu
Prabal Ranjan Sengupta
Satyaranjan Saha
Sandip Sengupta
Gopal Chandra Nath
Kanchan Mukherjee
Paresh Chandra Sarkar
Ranjit Kumar Roy
Ramaprasad Roy
Asit Kumar Ghosh
Nabin Chandra Dey
Amulya Nafsul Hasan
Biswajit Saha
Madan Kumar Jha
Abnas Ali
Biswajit Roy
Mrinalkanti Bera
Kanai Roy
Madan
Ashutosh Saha
Apurba Kumar Saha
Bikash Chandra
Ajoy Chakraborty
Subodh Kumar Sarkar
Amulya Kumar Mondal
Sanjoy Biswas
Sanjoy Chakraborty
Nimai Chand Gayen
Sandip Kumar Naskar
Sanat Kumar Das
Jayanta Kumar Mondal
Ramesh Chandra Sarkar
Sib Kumar Dutta
Badal Chandra Roy
Santanu Bhattacharya
Subhendu Sekhar Mondal
Tapas Ranjan Chattopadhya
Madan Mohan Mondal
Md. Asoyar Lal Husain Ansari

Md. Nazrul Islal
Ranjit Pal
Manoj Kumar Dolui
Subhendu Bhowmik
Asit Kumar Mondal
Nirmal Kumar Bandhyopadhya
Sanatan Barman
S. M. Amanulla

Amit Kumar Das
Monoranjan Mondal
Ranjit Kumar Bajneyee
Sanjit Bhattachaya
Swapan Kumar Mondal
Bhabendra Kumar Mallik
Dulal Chandra Das
Prabhas Chandra Biswas
Utpal Kumar Jana

Names of Trainees : 1988-89

Debi Prasad Acharya
Tapas Kumar Ganguli
Gopinath Roy
Salil Kumar Roy
Krishna Pada Das
Pranay Sankar
Manabendra Saha
Salimuddin Ahmed
Samir Bhuniya
Bhuban Mohan Pal
Krishna Chandra Das
Samir Kumar Sengupta
Achinta Kumar Sarkar
Sudhangshu Biswas
Amar Kumar Sarkar
Samir Kumar Adhikari
Krishna Kumar Basu
Alok Majumdar
Nikhiles Kumar Mondal
Kalyan Auddy
Uday Chandra Roy
Ganesh Chandra Mullick
Dhiraj Kumar Chakravarty
Shukendu Mukherjee
Jyoti Bhusan Pathak
Wahedur Rahman
Pronay Kumar Pati
Nazrul Hak
Narayan Kumar Kar
Bikarna Kumar Laha
Mongal Chandra Ray
Chanakya Sen

Avinaba Lahiri
Bipra Das Bhattacharya
Soumitra Kumar Pramanik
Sidhartha Kumar Bandopadhya
Luthfar Rahaman Mondal
Santipada Das
Dulal Karar
Prabhat Kumar Chakravarty
Sanat Kumar Ghosh
Pradosh Kanti Mondal
Arup Kumar Saha
Sanat Kumar Sarkar
Shakti Pada Bhowmik
Nilangan Bandopodhya
Ranjit Kumar Roy
Abdul Manna
Paban Bhuina
Apurba Chakravarty
Timir Baran Gangopadhya
Swapan Kumar Pal
Gautam Kumar Mondal
Saroj Kumar Jain
Jitendra Nath Das
Sheikh Meher Ali
Abaiddur Rahman
Bhabes Chandra Roy
Samarendranath Dutta
Samir Debnath
Mridul Kumar Sarkar
Ajit Kumar Das
Madhusudan Mondal
Protyush Dutta

Partha Pratim Pandit
A. K. M. Alamin
Himadri Shekhor Halder
Indrajit Gangopadhaya
Achal Krishna Giri
Joydeep Chakrabarty
Fanibhusan Roy
Kalipada Acharya
Gopal Ch. Paul
Md. Maidul Islam
Jayanta Kr. Dutta
Sk. Abdul Kalam
Ramchandra Mukherjee
Debasis Chakraborty
Sukdev Pramanik
Md. Nuhir Uddin
Md. Anikul Hog
Md. Mahidul Islem
Ashis Kumar Bhattacharjee
Syed Nurul Alim
Debasis Debnath
Kaustab Chattapadhya
Md. Rajab Ali
Netai Das
Debrata Kamilla
Jogesh Chandra Ghosh
Ashim Kumar Prodhan
Dilip Kumar Banerjee
Arun Kumar Chakraborty
Malli Nath Bhattacharjee
Samiron Banerjee
Billo Mangal Saha
Gautam Bagchi
Gunodhor Mistri
Sambhu Nath Paul
Jiyul Hoque
Tapan Sasmal
Arijit Sengupta
Naresh Chandra Patra
Ritendra Nath Mitra
Sagar Nath Dawn
Nabin Kumar Acharya
Bikash Mondal
Naraon Mondal

Panchanon Mridha
Parimal Mondal
Haripada Baidya
Mosadteku Khan
Md. Hossen
Dilip Kumar Halder
Amit Sen
Dipak Chakraborty
Narul Amin
Durgo Sankor Chakraborty
Syed Md. Ashgarh
Amal Kumar Seal
Ashim Kumar Das
Md. Abdullah
Naresh Kumar Naskar
Niranjan Kumar Naskar
Ramnandan Pandit
Paramananda Pathak
Vivekananda Mandal
Bimal Mondal
Krishna Kumar Singh
Kalidas Naskar
Deb Prasad Jana
Alokmoy Ghosh
Alim Ali Siddikul
S. A. Rahaman Barkhati
Gourhati Mondal
Utpal Roy
Md. Rewajuddin
Tapan Kumar Samanta
Kalayan Kumar Chakraborty
Josabonto Mohapatra
Subhas Basu
Gautam Banerjee
Nemai Paul
Chandrachur Adhikari
Radhakant Das
Tapan Kr. Dey
Nagarjun Bharadwaj
Sarat Chandra Saren
Achinta Biswas
Raj Kumar Dey
Prabir Kumar Dey
Soma Lal Rajak

Maheswar Chakraborty
Md. Salil Amtar
Harso Gopal Jana
Prasanta Das
Nisit Bandu Sarogi
Sanat Kumar Mondal
Arun Kumar Chakraborty
Kashinath Adak
Gayapad Paul
Dibendu Bikas Das
Nurul Haro
Dilip Kumar Mudi
Chandadev Thakur
Arindam Banerjee
Amitav Basu
Ashis Kumar Das
Chitta Ranjan Pati
Jayanta Josh
Dibakar Maitra
Kashi Nath Paul
Asit Kumar Rath
Swapan Kumar Prodhan
Mahim Ranjan Mazumder
Rajat Roy Chowdhury
Krishnapada Roy
Janardan Das
Aloke Kumar Mondal
Ashim Dhali
Sisir Burman
Dipak Kumar
Joglon Chandra
Ramendra Prodhan
Biswajit Chatterjee
Tusar Kanti Bhattacharjee
Monoj Kumar Saha
Subhas Chandra Murmu
Sujoy Kumar Sinha
Biswanath Saha
Mohan Kumar Shyam
Prafulla Chandra Ghosh
Modon Mohon Karmakar
Tapan Kumar Hazra
Sunil Kumar Sorkar
Dilip Kumar Mukherjee
Dukhuram Roy
Mritunjoy Chakraborty
Swapan Kumar
Ashok Kumar Roy
Joydev Ghosh
Prya Nath Dutta
Devshonkor Das
Abdul Kalam Axal
Samir Kumar Halder
Produth Kumar Maity
Haridev Kar
Uttam Bhowmik
Anupam Mallik
Debasis Chakraborty
Amlan Nath
Radhyshyam Pandey
Kalipada Mondal

Names of Trainees : 1989-90

Radheshyam Bhuina
Arun Mukherjee
Nimai Chandra Mondal
Samir Ranjan Giri
Tapan Jyoti Maji
Basudev Biswas
Mir Mujffar Ahmed
S. M. Barkatur Rahman
Paritosh Biswas
Sibashis Majumdar
Paritosh Karmakar
Biswaranjan Bera
Md. Rafikul Alam
Sasanka Sekhar Bhowmik
Shyamal Sarkar
Sanjoy Kumar Dutta
Samsuddin Ahmed
Manindranath Barman
Safijuddin Ahmed
Amal Chandra Das

Bijon Bhattacharya
Gokul Sau
Somnath Mohanta
Saibal Ghosh
Swapan Kumar Majumdar
Madhusudan Nandi
Bishnupada Pal
Sujit Ghosh
Muktapada Munsi
Gobardhan Pal
Bimal Kumar Chakraborty
Hemanta Kumar Patra
Satendranath Gayen
Md. Sufiur Rahman
Gouranga Basu
Samsuddin Ahmed
Rajib Bandyopadhya
Dabirul Islam
Md. Amjad Hossain
Sajjad Hossain
Basudeb Mondal
Md. Anamel Haque
Sunil Kumar Mondal
Kasinath Karmakar
Rabindranath Sarkar
Jaharkali Bhattacharyya
Dilip Kumar Purkayet
Subrata Kumar Sarkar
Jagadish Chandra Halder
Priti Kumar Pradhan
Santibrata Moulik
Somnath Bose
Sanjoy Maitra
Indranil Ganguli
Debendranath Halder
Puspen Mondal
Parthasarathi Chatterjee
Haripada Mondal
Sukumar Pal
Sibram Khalku
Raghu Orao
Manas Kumar Sarkar
Nirmalendu Choudhury
Somnath Das

Amitava Mukherjee
Asok Kumar Das
Selim Mondal
Prasenjit Mondal
Rabindranath Pal
Titaru Orao
Priyabrata Sarkar
Manas Kumar Banerjee
Amit Chatterjee
Sukumar Ghosh
Somnath Roy
Sk. Hannan Mondal
Partha Mondal
Anirudha Bhakta
Sardindu Jana
Dilip Kumar Chhow
Nityananda Mondal
Tarun Kanti Hazra
Joydeep Mondal
Debprakash Chatterjee
Suprabhat Ghosh
Samir Kumar Layek
Nilendu Bag
Ranajit Kumar Pande
Sajal Adhikari
Abdul Hamid
Moinuddin Ahmed
Akbar Ali Biswas
Anil Kumar Mondal
Abdul Rahman
Narayan Bhattacharya
Dipak Das
Sekhar Bhattacharya
Uttam Kumar Saha
Ananta Kumar Das
Bhuban Chatterjee
Gopal Karmakar
Satyasundar Rana
Kripasindhu Sahan
Abhijit Mukhopadyaya
Gourchandra Jhantuya
Suprio Addya
Sk. Samsuddin
Ranajit Kumar Das

Prakash Chandra Naskar
Apurba Dutta
Debasish Gyan
Subrata Nandi
Subir Kumar Chattopadhyaya
Soumitra Pal
Susil Kumar Choukidar
Prabhat Dutta
Samir Ghosh
Druba Charan Barman
Goutam Sengupta
Sudipta Kumar Chatterjee
Ranajit Kumar Pal
Krishnendu Mondal
Amal Kumar Saha
Tapan Kumar Chowdhury
Sopendra Madhan Bhattacharya
Utsab Kallol Chatterjee
Sudhansu Sardar
Basudeb Chowdhury
Swapan Kumar Chattopadhyay
Abujar Hossain Mallick
Barendranath Hansda
Md. Jamilur Rahman
Pradip Bhattacharya
Shyamaprasad Chatterjee
Uday Sankar Ghosal
Tapan Kumar Samanta
Madan Mohon Das
Sanatan Senapati
Md. Asan Ali
Abdur Rahaman
Md. Iyabul Ahmed
Abdul Oyadish
Asok Kumar Panda
Uma Kinkar Chowbe
Manas Mukherjee

Pradip Kumar Dey
Saroj Kumar Roy
Tapan Kumar Dey
Sakil Ahmed
Dilip Kumar Deb
Madhab Chandra Ghosh
Anil Kumar Das
Suryakanta Iswar
Prabir Kumar
Pasupati Nath Sharma
Bipin Kumar Singh
Suman Dutta
Bhupal Chandra Mondal
Ahirban Deb
Md. Ansar Ahmed
Soumitra Bagchi
Kuldip Singh Hiu
Arun Kumar Bera
Dinedra Prasad
Haradhan Debnath
Rajnarayan Thakur
Md. Ismail Khan
Samir Dutta
Samir Kumar Das
Madan Prasad Yadab
Parthasekhar Majumdar
Arun Kumar Mondal
Swapan Kumar Koyal
Mritunjay Mondal
Santanu Ghosh
Asim Kumar Dey
Niren Pada Patra
Biswaranjan Ghosh
Mrinal Bandopadhyay
Dhananjay Das
Udayan Banerjee

Names of Trainees : 1990-91

Santiranjan Ghosh
Sahadat Ali Mondal
Murari Mohon Haldar
Subodh Kumar De

Partha Sarathi Mandal
Ramen Sarkar
Shyama Prosad Bandopadhaya
Supriya Kumar Basu

Sk. Saidul Islam
Giassuddin Mallick
Nikhil Kr. Sinha
Kartick Chandra Mandal
Santanu Parui
Utpal Bhattacharya
Goutam Bandopadhaya
Ranjan Kr. Dutta
Nihar Ranjan Ghosh
Arijit Mallick
Haradhan Hajra
Md. Faruque
Debabrata Pal
Abul Kalam
Md. Latifur Rahaman
Arup Mitra
Biswanath Bhattacharya
Somnath De
Sarat Ch. Sarker
Chittaranjan Sardar
Amiya Kr. Ghosh
Pronoy Kr. Dasgupta
Subhas Chandra Mondal
Indranarayan Kuiri
Pradip Kumar Mandal
Prabir Kr. Sur
Soumitra Bandyopadhyay
Surath Saha
Bibekananda Patra
Subrata Bagchi
Khairul Islam
Jadav Ch. Mahato
Sankar Kumar Bhattacharya
Ananda Gopal Pal
Asish Kumar Pal
Susanta Chakraborty
Sudip Sanyal
Sitaram Mandal
Anup Datta
Pradeepta Guptaroy
Gobinda Ch. Basak
Nikhil Ranjan Sarkar
Pradip Narayan Roy
Md. Abul Kashim
Md. Rumi Sardar
Sudam Chandra Adhikari
Bikash Ch. Mundari
Md. Nur Alam
Somnath Motilal
Nirode Chandra Barman
Bikash Kumar Dey
Panchu Gopal Mallick
Swapan Kr. Halder
Abhijit Chattopadhyay
Dilip Jana
Srimant Kr. Pradhan
Bhupendranath Saha
Pradip Kr. Chakraborty
Nilkantha Patra
Ashis Kr. Bhunia
Supratim Datta
Debashis Sen
Upendranath Berman
Swaminath Saw
Tapas Nath
Parimal Maity
Mukhtar Ahamed
Bhupendranath Misra
Seikh Najrul Islam
Dipak Kr. Manna
Nirmal Kr. Lal
Snehansu Manna
Debjit Basu Mallick
Madhab Ch. Hazra
Pranabesh Baitalik
Tapan Kr. Mandal
Basudev Chatterjee
Malay Kr. Dutta
Anil Kr. Mandal
Debasish Santra
Gopal Majumdar
Satyen Kr. Sardar
Tapas Roy Chowdhury
Abhijit Pal
Sanjib Kar
Kalyan Kr. Ghosh
Arindam Panda
Jadav Chandra Baidya

Dwizendranath Roy
Pijush Kanti Bera
Bibhas Mandal
Niranjan Mondal
Supriya Mishra
Niranjan Kumar Mandal
Judipati Das
Pradip Kumar Baidya
Sushanta Barir
Biswapriya Mukhopadhyay
Srikrishnakant Singh
Narayan Chandra Jana
Bijan Kumar Saha
Uday Sankar Chakraborty
Gautam Mukhopadhyay
Kailash Mallick
Suman Ghosh
Parimal Krishna Mandal
Subir Mandal
Ratnamay Saha
Tapas Nayak
Goutam Das
Bibeka Nanda Rana
Animesh Dutta
Anup Kumar Halder
Asim Kumar Mandal
Sankar Kumar Pradhan
Debasish Ghatak
Rajani Naskar
Niranjan Kumar Deyashi
Tapas Kumar Saha
Abhijit Mandal
Debashish Ghosh
Arup Kumar Mukhopadhyay
Kalyan Mandal
Anup Kumar Mandal
Sujoy Kumar Sarkar
Dipak Kumar Das

Goutam Chatterjee
Tarun Kumar Mridha
Asim Kumar Ghorai
Bipad Bhanjan Mandal
Arun Kumar Naskar
Goutam Sinha
Samir Kumar Karmakar
Mahitosh Das
Barunayan Das
Ajit Kumar Mandal
Nanigopal Kuila
Gosai Chandra Mandal
Md. Rizwan Ahmed
S. M. Reyaz Ahmed
Md. Mowla Boksh
Chandra Sekhar Giri
Nikhil Kumar Manna
Sachin Bar
Manoj Kumar Banerjee
Lakshmi Narayan Maity
Bhagyadhar Mandal
Baghbul Islam
Nirujjwal Garai
Tapan Kumar Manna
Partha Pratim Mukherjee
Fazal Md. Latif
Durga Pada Dutta
Pramod Kumar
Santosh Kumar Karmakar
Mukti Pada Sarkar
Subrata Basu
Chaitanya Maji
Amal Kumar Das
Satyen Kumar Jana
Prakash Kumar De
Arun Kiran Adak
Ayub Ali Gazi

Names of Trainees : 1991-92

Ajit Kumar Barman
Abdul Latif Mondal
Purna Chandra Dhara
Ajit Kumar Samanta

Debashis Chatterjee
Sushil Kumar Hazari
Sanjoy Sekhar Ghosal
Tushar Kanti Khan

Ranjan Kumar Das
Sujit Kumar Chowdhury
Tapan Kumar Sardar
Asit Baran Paul
Gourhari Mondal
Pijush Das
Anisul Alam Chowdhury
Arup Sengupta
Dhurjati Prasad Mondal
Bidhan Chandra Roy
Azizul Islam
Rousan Alam
Mrinmoy Podder
Bonamali Majhi
Narayan Chandra Maji
Gouranga Singha
Susanta Kumar Paul
Sushil Kumar Karani
Sudam Ghosh
Jayanta Gangopadhayay
Shyamapada Bhattacharya
Chanchal Pramanik
Joymangal Gan
Md. Javed Nihal
Mocksed Khan
Tarun Kumar Chandra
Ajoy Kumar Mondal
Premananda Chakraborty
Lakshman Murmu
Anjan Bhattacharya
Tarun Kumar Das
Debkumar Kandan
Suvendu Sekhar Bandopadhaya
Sudip Bhattacharya
Bhagirath Das
Suprakash Giri
Debkumar Patra
Biswadeb Paul
Aloke Monigram
Bhaskar Goswami
Tapas Ghosh
Subrata Sarkar
Ramshankar Pd. Sharma
Manas Kumar Roy

Ranabir Nandi
Sumit Basu
Goutam Chattapadhyay
Arindam Bhattacharya
Ajoy Kumar Paul
Subrata Kumar Dey
Emajuddin Sheikh
Ashim Mondal
Ashim Kumar Adhikary
Aliuddin Ahmed
Kamaluddin
Subranshu Chattapadyay
Sukumar Sasmal
Nilabjanayan Panda
Sanat Bhattacherjee
Satyendranath Ghosh
Pijush Kanti Sinhababu
Swamp Mistry
Jeevan Debnath
Debber Ali Sheikh
Priyabrata Nanda
Nirmal Samanta
Debanshu Giri
Santosh Mondal
Girijal Mandi
Mostur Rahaman
Pranab Sarkar
Md. Reazol Haque
Fassiuddin
Dhanesh Chandra Mahata
Pradyumna Sarkar
Subhas Mondal
Aloke Sinha
Madan Mohan Maity
Kalisankar Sen
Mridul Maity
Sudhin Sarkar
Birat Banerjee
Manjur Rahman
Abdul Jobber
Akbar Ali
Trilochan Jana
Bikash Kumar Kundu
Sukanta Bhattacharya

Dipak Roy
Susobhan Sengupta
Ramesh Mondal
Subhankar Roy
Salil Pani
Sukhendu Patra
Asit Kumar Ghosh
Arup Tribedi
Ashoke Kumar
Jitendra Das
Tapan Sankar Bhattacharya
Sudeep Roy
Murari Goswami
Uttam Mondal
Asis Kumar Kar
Nityananda Sardar
Pankaj Kumar Ghosh
Benimadhab Pandit
Bidyabhushan Rout
Asit Kumar Bera
Susanta Chakraborty
Bikash Chakraborty
Tapan Kumar Maity
Sunit Chattopadhyay
Arun Kumar Saha
Prasanta Chattapadhayay
Saikat Pramanik
Satya Ranjan Patra
Dulal Ojha
Manas Mondal
Pravat Mondal
Jitendra Jha
Munindra Nath Singh
Monaranjan Goswami
Ashish Panda
Bedanta Bihari Podder
Biswajit Chakraborti
Anupam Das
Md. Abdur Rashid
Parimal Roy
Arun Mukhopadhyaya

Dinesh Biswas
Balaram Sen
Tapan Das
Shyamal Kr. Gayen
Bikash Ch. Pramanik
Nitai Ch. Halder
Bikash Chakraborti
Pratap Ch. Pradhan
Joydip Dasgupta
Pallab Narayan Roy
Satya Suddha Banerjee
Rajib Sarkar
Tapan Kr. Mistri
Malay Kr. Pal
Haripada Mallick
Shyamal Pal
Tapan Jyoti Halder
Subir Kr. Mondal
Prasenjit Kr. Mridha
Nityalal Sen
Ganesh Ch. Senapati
Aniruddha Satpati
Sankar Mondal
Goutam Bhattacharya
Parthapratim Ray
Shirish Kr. Mandal
Swapan Kumar Sardar
Sujit Kr.Ghosh
Prakash Kanta Thander
Sirajuddoula
Goutam Bhaumik
Satyajit Hazra
Tuhin Kr. Mandal
Satyajit Gorai
Prasanta Adhikari
Prasanta Mridha
Tanmay Ray Chowdhury
Jayanta Bandyopadhyay
Subrata Narayan Majumdar
Bikash Biswas
Md. Laisul Haque

Ranjan Kumar Das
Sujit Kumar Chowdhury
Tapan Kumar Sardar
Asit Baran Paul
Gourhari Mondal
Pijush Das
Anisul Alam Chowdhury
Arup Sengupta
Dhurjati Prasad Mondal
Bidhan Chandra Roy
Azizul Islam
Rousan Alam
Mrinmoy Podder
Bonamali Majhi
Narayan Chandra Maji
Gouranga Singha
Susanta Kumar Paul
Sushil Kumar Karani
Sudam Ghosh
Jayanta Gangopadhayay
Shyamapada Bhattacharya
Chanchal Pramanik
Joymangal Gan
Md. Javed Nihal
Mocksed Khan
Tarun Kumar Chandra
Ajoy Kumar Mondal
Premananda Chakraborty
Lakshman Murmu
Anjan Bhattacharya
Tarun Kumar Das
Debkumar Kandan
Suvendu Sekhar Bandopadhaya
Sudip Bhattacharya
Bhagirath Das
Suprakash Giri
Debkumar Patra
Biswadeb Paul
Aloke Monigram
Bhaskar Goswami
Tapas Ghosh
Subrata Sarkar
Ramshankar Pd. Sharma
Manas Kumar Roy

Ranabir Nandi
Sumit Basu
Goutam Chattapadhyay
Arindam Bhattacharya
Ajoy Kumar Paul
Subrata Kumar Dey
Emajuddin Sheikh
Ashim Mondal
Ashim Kumar Adhikary
Aliuddin Ahmed
Kamaluddin
Subranshu Chattapadyay
Sukumar Sasmal
Nilabjanayan Panda
Sanat Bhattacherjee
Satyendranath Ghosh
Pijush Kanti Sinhababu
Swamp Mistry
Jeevan Debnath
Debber Ali Sheikh
Priyabrata Nanda
Nirmal Samanta
Debanshu Giri
Santosh Mondal
Girijal Mandi
Mostur Rahaman
Pranab Sarkar
Md. Reazol Haque
Fassiuddin
Dhanesh Chandra Mahata
Pradyumna Sarkar
Subhas Mondal
Aloke Sinha
Madan Mohan Maity
Kalisankar Sen
Mridul Maity
Sudhin Sarkar
Birat Banerjee
Manjur Rahman
Abdul Jobber
Akbar Ali
Trilochan Jana
Bikash Kumar Kundu
Sukanta Bhattacharya

Dipak Roy
Susobhan Sengupta
Ramesh Mondal
Subhankar Roy
Salil Pani
Sukhendu Patra
Asit Kumar Ghosh
Arup Tribedi
Ashoke Kumar
Jitendra Das
Tapan Sankar Bhattacharya
Sudeep Roy
Murari Goswami
Uttam Mondal
Asis Kumar Kar
Nityananda Sardar
Pankaj Kumar Ghosh
Benimadhab Pandit
Bidyabhushan Rout
Asit Kumar Bera
Susanta Chakraborty
Bikash Chakraborty
Tapan Kumar Maity
Sunit Chattopadhyay
Arun Kumar Saha
Prasanta Chattapadhayay
Saikat Pramanik
Satya Ranjan Patra
Dulal Ojha
Manas Mondal
Pravat Mondal
Jitendra Jha
Munindra Nath Singh
Monaranjan Goswami
Ashish Panda
Bedanta Bihari Podder
Biswajit Chakraborti
Anupam Das
Md. Abdur Rashid
Parimal Roy
Arun Mukhopadhyaya

Dinesh Biswas
Balaram Sen
Tapan Das
Shyamal Kr. Gayen
Bikash Ch. Pramanik
Nitai Ch. Halder
Bikash Chakraborti
Pratap Ch. Pradhan
Joydip Dasgupta
Pallab Narayan Roy
Satya Suddha Banerjee
Rajib Sarkar
Tapan Kr. Mistri
Malay Kr. Pal
Haripada Mallick
Shyamal Pal
Tapan Jyoti Halder
Subir Kr. Mondal
Prasenjit Kr. Mridha
Nityalal Sen
Ganesh Ch. Senapati
Aniruddha Satpati
Sankar Mondal
Goutam Bhattacharya
Parthapratim Ray
Shirish Kr. Mandal
Swapan Kumar Sardar
Sujit Kr.Ghosh
Prakash Kanta Thander
Sirajuddoula
Goutam Bhaumik
Satyajit Hazra
Tuhin Kr. Mandal
Satyajit Gorai
Prasanta Adhikari
Prasanta Mridha
Tanmay Ray Chowdhury
Jayanta Bandyopadhyay
Subrata Narayan Majumdar
Bikash Biswas
Md. Laisul Haque

Names of Trainees : 1992-93

Chilman Saha
Sankha Maitra
Mrinmoy Poddar
Goutam Das
Baidyanath Das
Kalidas Mondal
Rathindranath Mondal
Nilkanta Ghosh
Partha Sarathi Hul
Prabodh Ch. Pramanick
Md. Jajriul Islam
Jogesh Ch. Barman
Prabhupada Das
Asim Kr. Adhikari
Goutam Ghosal
Banamali Mura
Md. Sharifurramal Imdadul Ulum
Adhir Kr. Mondal
Sk Hossain Ali
Subhendu Ghosh
Anirudha Dey
Asis Nandi
Pulak Bandapadhyay
Parbatisankar Patra
Kalyan Kumar Shit
Kamal Krishna Ghosh
Abhijit Saha
Asim Kr. Jana
Pranab Kr. Pal
Sajal Sarkar
Jagat Ranjan Saha
Subhrangsu Sarkar
Utpal Mondal
Biman Kr. Charaborty
Md. Annar Ali
Md. Adiluzzaman
Tapan Kr. Dhali
Md. Shah Nawaj Ali
Haran Ch. Gayen
Gouri Sankar Sanyal
Aayandev Sinha
Tapas Panda
Nandesh Kr. Thakur
Kishore lal Ghosal
Amanur Rahaman
Abhijit Kr. Chanda
Suchit Kr. Chakrabarty
Sobhanlal Dey
Analshri Pradhan
Syamal Kr. Khanra
Dipak Mukhopadhyay
Partha Sarathi Mollah
Siddhartha Das
Parimal Kr. Bhanja
Nirmal Debnath
Arindam Bhattacharya
Goutam Mondal
Subrata Basu
Kamalesh Chakraborty
Mumtaj Ali
Saibal Kr. Ghosh
Surapratim Basuli
Sanjoy Kr. Ghosh
Dulal Ch. Saha
Subhabrata Barman
Abhijit Das
Subrata Trivedi
Md. Abdul Aziz
Swapan Kr. Das
Debasis Basu
Sukhen Maiti
Rajkumar Pradhan
Md Madal Ali
Sudipta Poddar
Md. Zarnul Abedin
Biswajit Sarkar
Milan Naskar
Nitaipada Tarafdar
Paresh Ch. Mondal
Amitava Mahapatra
Manoj Kr. Mondal
Kanak Kanti Sarkar
Debasis Bajpayee
Debasis Chattopadhyay

Jugal Prasad Kisku
Goutam Halder
Bimal Choraw
Rajit Ghosh
Partha Pratim Roy
Kusul Dawn
Md. Hafijur Rahaman
Sanjoy Chatterjee
Debasis Mondal
Sitikantha Datta
Ranjit Kr. Sinhamahapatra
Subimal Halder
Arun Kr. Nandi
Rabindranath Pal
Sanat Kr. Gayen
Bikash Kanti Middya
Krittibas Baidya
Bibekananda Poddar
Amal Krishna Adhikari
Krishna Kanta Mondal
Gokul Mondal
Debdulal Patra
Peon Ch. Majhi
Uttam Kr. Chakraborty
Susruta Bhaduri
Nirmal Kr. Bera
Subhas Bhattacharya
Gouri Sankar Malakar
Sk. Abasan Habib
Ashim Kr. Ghourj
Achinta Sinha
Pintu Acharya
Subrata Hati
Kausik Roy
Surjadev Sarkar
Manab Kanti Baidya
Haridas Sarkar
Jibitosh Roy
Dinabandhu Biswas
Arun Kr. Bandopadhyay
Goutam Kr. Singh
Nityananda Mridha
Suman Kalyan Datta
Manas Kr. Maiti
Vaskaraditya Mondal
Soumendu Joddar
Santanu Deb
Monojit Sardar
Suman Kr. Jana
Debasis Pal
Nirmal Kr. Mondal
Sd. Abid Ali
Asis Kr. Jash
Md. Khayrul Islam
Sd. Hassan Imam
Subhendu Sengupta
Priyatosh Basu
AzfarAli Mondal
Promod Kr. Prasad
Hemnath Ghosh
Parthapratim Maji
Susanta Kr. Sarkar
Tapas Kr. Adhikari
Muchiram Pradhan
Asit Kr. Bag
Amitabha Patra
Partha Roy
Malay Dutta
Baidyanath Das
Shyamal Bankra
Nansad Ali
Tapas Kr. Maiti
Pronut Kanti Ghosh
Prasanta Biswas
Prem Dorjee Bhutia
Hrishikesh Mudi

Names of Trainees : 1993-94

Tarun Kumar Maity
Md. Akhtarul Islam
Lakshmi Kanta Manna
Tapas Kumar Maiti
Netai Chand Gayen
Md. Akhtar Hossain
Chandan Kumar Mondal
Md. Rejaut Karim

Prabir Sankar Sengupta
Anupam Dey
Utpalendu Sarkar
Anath Bandhu Sahoo
Hannan Miah
Nirmalya Ray
Partha Sarathi Chakrabarti
Narayan Chandra Roy
A. T. M. Nayeemol Haque
Amal Nayak
Karuna Kanta Barman
Sisir Banerjee
Santanu Ganguli
Gautam Kumar Hajra
Sachindra Nath Mandal
Tapan Kumar Jana
Subhash Chandra Ghosh
Debasis Chattopadhya
Md. Abdul Karim
Arabinda Chatterjee
Sadhan Kumar Mahanti
Arup Pathak
Kalipada Jana
Pradip Maiti
Tapan Kumar Mandal
Sumit Das
Tarun Kumar Das
Nasiruddin Sarkar
Aswini Palot
Abdul Aziz Sardar
Priyabrata Banerjee
Priyabrata Bandyopadhyay
Sujit Kumar Jana
Amitabha Ray
Avik Chatterjee
Debasis Mallik
Asim Kumar Ghosh
Tapas Kumar Layek
Suman Das Gupta
Amitabha Kumar Pal
Saikat Kanungoe
Suman Dhar
Kajal Ghosh
Tulassi Das Bhattacharya

Tarak Nath Kolay
Asitabha Patra
Prabir Kumar Ray
Banswar Das
Debabrata Mondal
Manik Kumar Banerjee
Bidyut Kumar Mandal
Achintya Sarkar
Nisith Kumary Ray
Bhaskar Bandyopadhyay
Sujit Kumar Saha
Nasim-A-Alam
Trambak Jana
Sanjay De
Chandan Kumar Maiti
Dilip Kumar
Samar Biswas
Nabakumar Khan
Manas Pal
Sital Kumar Bijoypuri
Arvind Kumar
Braj Kishor Chowdhury
Sunil Kr. Mandal
Tapan De
Sandar Gopal Ghosh
Atanu Khatua
Krishna Chandra Karmakar
Sakti Pada Maiti
Chittaranjan Ghorai
Ansuman Sarkar
Tuhin Ganguly
Sanjay Mandal
Mr. Arun Kumar Roy
Suprakas Giri
Ranendra Nath Mondal
Kanchan Laha
Sambhu Nath Jha
Abhijit Sengupta
Biswanath Karmakar
Udaysankar Das
Kalyan Saha
Dipak Kumar Mondal
Jaynarayan Nanda
Dhananjoy Thakur

Sanjib Kumar Das
Ujjwal Kusum Sarkar
Arabind Ghosh
Prabhas Ch. Mondal
Sanat Kumar Mandal
Biswajit Adhikary
Nimai Chandra Bar
Gautam Kumar Patra
Tanmoy Barua
Bidhan Ch. Mondal
Amal Kumar Pahan
Narayan Ch. Naskar
Sakshi Gopal Das
Manoranjan Mridha
Bimal Kr. Bairagi
Anup Bhattacharya
Nibaran Ch. Saren
Debashis Mukherjee
Liakat Ali Mondal
Gopal Chandra Hauli
Iswar Chandra Purkait
Tapan Kumar Mandal
Pradip Karmakar
Amalendu Mandal
Afsar Ali Khan
Prafulla Chandra Panda
Asiruddin Ahmed
Abul Kalam Ajad
Kaushik Kahali
Anirban Basu
Atin Adhikari
Vijay Kumar Mishra
Fazlul Haque
Supriya Roy
Sabyasachi Pramanick
Narottam Das
Santanu Pandit
Malay Adhikari
Subashis Kundu
Angshuman Panja
Sk. Abu Musa
Nitish Ch. Saha
Gahar Ali Molla
Dibyendu Kumar Ghosh
Saurabh Kumar Ghosh
Pratap Bhul
Gautam Kumar Guha
Ganesh Chandra Nandi
Hara Sankar Pal
Satya Ranjan Mal
Nilanjan Ghosh
Malayendu Nath
Himadri Ray
Sahansha Mollah
Swapan Kumar Jana
Rajendranath Mandal
Ajay Kumar Sardar
Subrata Mandal
Prakash Chandra Mandal
Bhabatosh Mandal
Swapan Kumar Mandal
Sri Abhijit Das
Supada Mandal
Hemanta Kumar Mahato
Gouranga Mandal
Kamal Krishna Mandal
Samir Mandal
Gopal Nath Mandal
Mirza Murtaza Ali
Md. Mukhtar Ali
Dipankar Haldar
Partha Pratim Ray
Sujit Kumar Hazra

Names of Trainees : 1994-95

Ajoy Kumar Gupta
Uttam Kumar Mishra
Asit Kumar Ghosh
Chitta Ranjan Saha
Krishnendu Samanta
Manas Kumar Manna
Krishnapada Biswas
Ajoy Kumar Agole

Moharak Hossain
Firdous Ali
Ajimul Islam
Tapas Ranjan Patra
Abhimanyu Verma
Tapas Sarkar
Tapas Kumar Mandal
Debdulal Mondal
Prasanta Barman
Nitai Binod Paria
Md. Enamul Hoque
Towasin Ali
Dhananjoy Baidya
Dilip Jana
Subrata Dalapati
Anjan Kumar Saha
Subhendu Sekhar Bandyopadhyay
Phanindranath Biswas
Partha Pratim Sarkar
Md. Waliul Islam
Pratap Chakraborty
Soumitra Ray
Byomkesh Ghoral
Saifuddin Khan
Mohan Das
Mir Jumla Hossain
Aninda Sengupta
Anjishnu Biswas
Nandan Chowdhury
Banamali Mahata
Md. Shamsul Hassan Khan
Debprasad Das
Ranjit Maji
Ananta Hembram
Jafar Hossain
Debdulal Banerjee
Md. Imtiaz
Bedanta Das
Monoranjan Saha
Shyam Sundar Mondal
Mahabir Mandi
Nishikanta Biswas
Biman Murmu
Binod Besra

Nousad Ali
Angsuman Bhowmik
Debnath Moitra
Khodaban Mondal
Nirupam Mondal
Ananta Kumar Sardar
Rabindranath Pain
Parthasarathi Bhattacharjee
Samar Kumar Baidya
Balai Chandra Makhal
K. M. Delarul Hassan
Prasenjit Banerjee
Sushanta Kumar Pal
Kankan Panda
Saidur Rahaman
Md. Nuruddin Shah
Apurba Kumar Barman
Md. Masud Hasan
Amulya Ratan Ghosh
Benjamin Mandi
Monoranjan Halder
S. K. Nasirul Haque
Dipak Chakraborty
Rejaul Karim
Srikanta Mondal
Bhriguram Murmu
Ashim Kumar Das
Subrata Ruj
Biman Ch. Mandal
Dhirendra Nath Roy
Krishnendu Ghosh
Prabhanjan Shymal
Jitendranath Kar
Ujjwal Mondal
Diwakar Kumar
Manas Roy
Amraun Kabir
Subrata Chakraborti
Chanchal Mondal
Purnendu Sekhar Jana
Somen Chanda
Achyutananda Kundu
Debasish Banerjee
Gautam Ghatak

Palash Guha
Madan Mohan Das
Subhra Kanti Nanda
Srinibus Mondal
Sourav Bhowmik
Goutam Bhattacharyya
Md. Zamaluddin
Rezaul Karim Mirza
Dhananjoy Hembram
Kausik Sarkar
Sourav Saha
Manas Bhowmik
Shahidul Islam Molla
Bijay Bag
Debdatta Das
Mujibar Rahaman
Dibyendu Bikash Bag
Mrinal Kanti De
Khairul Abedin
Prasanta Kumar Das
Md. Makirul Islam
Subrata Bhattacharya
Tanmoy Mukherjee
Kajal Mitra
Shyamal Pal
Kasem Ali Khan
Kaushik Sikdar
Tapan Chakraborty
Ujjal Kumar Thakur
Biswajit Prasad Yadav
Amirul Islam
Naba Kumar Jana
Neel Kamal Singh
Sambhunath Sarkar
Bibhas Mondal
Shaskar Saudagar
Suman Roy Chowdhuri
Md. Rezaul Karim
M. R. V. Jha
Manabendra Nath Laha
Parameswar Saran
Prakash Mahanty
Bikash Chandra Ghosh
Syed Mohammed Ilia
Asiqul Islam
Debasish Ghosh
Bipul Kumar Jana
Nepal Chandra Biswas
Amit Kumar Das
Ujjal Majumdar
Md. Asraf Hossian
Pulak Mondal
Bipas Dhar
Samir Bhowmik
Gautam Sen
Nasir Afridi
Apurba Kar
Salibahan Bhattacharya
Dipankar Mukhopadhyay
Kaustabh Lahiri
Md. Golam Mustafa
Shahnawaz Shibli
Hemanta Das
Mani Shankar Bandyopadhyay
Joydeep Sarkar
Md. Murtaza Ali
Subhajit Dasgupta
Bibekananda Saha

Names of Trainees : 1995-96

Krishnagopal Mondal
Abdul Hai Halder
Biswa Nath Tudu
Chhatradhar Tudu
Uttam Kumar Biswas
Singrai Saren
Parimal Mahato
Sankar Chandra Dowri
Gopal Chandra Das
Debapriya Chakraborty
Samir Ranjan Bag
Krishno Murmu
Arup Dutta
Bikash Chandra Ghosh

Ramaprasad Bhattacharya
Sujit Kumar Mandal
Asok Mridha
Mridul Krishna Ghosh
Nemai Charan Das
Subhasish Guha Neogi
Kingshuk Parna Paul
Ranjan Paul
Soumen Nandy
Narayan Chandra Parai
Pradip Kr. Baidya
Pintu Halder
Goutam Mondal
Rajashi Bandyopadhyay
Arup Mukhopadhyay
Jagannath Ghosh
Bikas Chandra Halder
Subrata Ranjan Mondal
Manoj Kr. Pani
Dhirendra Nath Jana
Shyam Sundar Kisku
Dipankar Pal Chaudhuri
Asit Baran Mahato
Tapas Ray Chaudhuri
Jyotirmay Barman
Lakshmi Kanta Mandal
Diptisur Sahoo
Abhijit Roy
Swarup Goswami
Jogendranath Mandal
Sandip Kumar Mondal
Tusar Kanti Dalal
Tapas Ranjan Roy
Subrata Kumar Sarkar
Kalpataru Mahajan
Madhusudan Deshmukh
Dinesh Chandra Das
Sambhu Nath Sarkar
Gouranga Mukherjee
Sankarprasad Ghosh
Tapan Kumar Pramanik
Malay Kanti Ghosh
Asok Kumar Jana
Gopinath Bhakta

Bijan Kumar Halder
Pradip Kumar Mandal
Kshudiram Mandal
Tushar Mondal
Md. Anarul Haque
Bipul Chandra Mitra
Snehashis Chatterjee
Md. Abdul Quiyum
Md. Janab Ali Laskar
Dilip Kumar Mondal
Biswamoy Mukherjee
Chandan Kumar Saha
Chandan Kr. Pal
Sudam Chandra Roy
Sudhir Kumar Jha
Sanjeev Kumar
A. Wahid Mukhlis
Samir Kr. Sarkar
Arup Kumar Bhadra
Uday Chakraborti
Bimal Maiti
Lakshmikanta Maji
Rashbihari Nayek
Sahabuddin Molla
Debmalya Lahiri
Sujit Biswas
Krishna Chandra Pati
Gourdas Sarkar
Manas Nandan Chakraborty
Bharat Chandra Mondal
Debprasad Mandal
Debashis Mondal
Animesh Saha
Aksarul Islam
Amiya Kr. Jana
Partha Ghosh
Ashoke Chakraborty
Charles Joseph Nyss
Rajiv Mukhopadhay
Ashraf Ahmed
Parimal Krishna Mandal
Subrata Mandal
Anisur Rahman
Sabyasachi Maji

Kajal Chakraborty
Sobarok Hossain Shaikh
Jyotirmay Pande
Bipad Bhanjan Nandi
Enamul Haque
Sisir Kr. Chakraborty
Jaydeb Choudhuri
Raj Kumar Das
Jyoti Parruck
Bhagirath Yadav
Sukumar Sarkar
Rampada Mandal
Mrityunjay Haldar
Sri Abhijit Dey
Sudipta Banerjee
Md. Zakir Hossain

Names of Trainees : 1996-97

Ajoy Kumar Chakraborty
Ajoy Kr. Mandal
Aloke Debnath
Amalendu Mondal
Amit Kumar De
Anindya Kr. Sengupta
Anup Kumar Jana
Anup Kumar Mitra
Arun Kumar Hembram
Asutosh Sanphui
Asis Kumar Mondal
Asit Kumar Das
Ayan Chattopadhyay
Baidyanath Soren
Bedanta Sengupta
Bejoy Gopal Das
Bhajahari Mondal
Bhaskar Mukhopadhyay
Bishnu Seth
Biswajit Mahakur
Debrabrata Mandal
Debaprasad Mansa
Debasis Mandal
Debnarayan Das
Dibyendu Das
Dilip Kumar De
Gouranga Sau
Goutam Datta
Gautam Ghosh
Gunadhar Mridha
Halachar Ari
Haradhan Kanrar
Hemanta Kumar Khan
Jagadish Chandra Mandal
Jahangir Alam
Jayanta Ray
Jibananda Ghosh
Kadam Rosul
Kalikaprasad Upadhyay
Kalyan Bhattacharjee
Kalyan Kumar Ranjit
Kankar Bhattacharya
Keshab Biswas
Kripasindhu Bandyopadhyay
Krishna Chandra Soren
Krishna Dulal Yadav
Lab Kumar Naskar
Mahendra Narayan Sinha
Makar Chandra Majee
Md. Abdul Mohit
Md. Aziz Ahmed
Md. Gous-ul-Ajom
Md. Hasanuzzaman
Md. Nur Hasan
Moloy Saha
Munshi Samsul Alam
Murshid Alam
Mutudas Tudu
Nakul Ch. Jana
Nanda Dulal Maity
Nirmalendu Roy
Nirmal Kumar Patra
Pallab Mukhopadhyay
Partha Chakraborty
Partha Pratim Mukhopadhyay
Pinakiranjan Chattopadhyay

Prabal Sengupta
Prabir Bhattacharya
Pradip Ghosal
Prafulla Ranjit
Pranab Sikdar
Pran Krishna Mondal
Pranay Kumar Majumdar
Pribrata Chakraborty
Pulok Behari Mondal
Pushpendra Kumar Jha
Rabindra Nath Kan
Rabindra Srivastava
Raghu Kumar Jha
Rajib Roy
Rajkumar Mishra
Ritesh Purkait
Sagar Sarkar
Samit Mazumdar
Sandip Nath
Sankar Ari
Sankar Misra
Santanu Naskar
Sanyasi Naskar
Sk. Sajahan
Sribas Saha
Subol Ch. Jana
Subash Prasad
Subhagata Bandyopadhyay
Subhendu Kundu
Subhra Prakash Nandi
Subrata Saha
Sudipta Das
Sukumar Khajanchi
Sunil Chandra Das
Suplal Baskey
Swapan Kumar Biswas
Swapan Kumar Mandi
Swapan Kumar Manna
Tamal Chakraborty
Tapan Kr. Mondal
Tapan Ranjan Maity
Tapas Patra
Tofizul Hoque

Names of Trainees : 1997-98

Amalendu Bikas Mondal
Aminul Islam Khan
Alok Kumar Manna
Amal Modak
Arabinda Mondal
Abu Baker Shabbir Ahmed
Asim Kumar Mondal
Anil Kumar Mishra
Amit Kumar Lala
Ajay Kumar Patra
Abdul Rouf Molla
Apurba Kumar Mallick
Arabinda Mandal
Amitabha Dey
Abhijit Kumar Mallick
Amit Roy
Alok Kumar Mondal
Ananta Kumar Sardar
Ajay Prajapati
Bikas Sa
Bibhas Saha
Bikash Ranjan Haldar
Bikash Kumar Mandal
Bhola Nath Mandal
Bikas Das
Biswadip Mitra
Bhaskar Mondal
Biswajit Pradhan
Baul Chandra Majhi
Bhaskar Roy
Bhagyadhar Mandal
Dhirendra Nath Barman
Dipesh Ghosh
Debashis De
Dakshina Ranjan Mistri
Debashis Banerjee
Debashis Gayen
Dipankar Chottopadhaya

Dipankar Samaddar
Dhananjoy Sarkar
Debasis Ari
Dilip Kumar Ghosh
Goutam Dutta
Gautam Biswas
Goutam Bhuiya
Goutam Ghosh
Haripada Mondal
Indrajit Sengupta
Jayanta Sardar
Jyotirmay Bhattacharya
Jayanta Dutta
Jyoti Prakash Ghosh
Kalyan Kumar Mondal
Kalidas Mudi
Kamal Pal
Kanad Ganguly
Kaushik Roy
Kaushal Kumar Singh
Khagendrnath Modok
Krishna Prasad Biswas
Kutubuddin Sarkar
Kuntal Gupta
Md. Nijamuddin Shah
Md. Abdur Rafik Sardar
Manoranjan Sahu
Mushtaque Ahmed
Md. Azizur Rahaman Molla
Manish Kumar Rai
Monoranjan Panda
Mafidul Islam
Md. Ayub Ansari
Malay De
Manas Goswami
Monoj Kumar Gupta
Mahbub Laskar
Manojit Biswas
Mahadeb Das
Monigopal Bera
Nirban Pal
Nonigopal Majumdar
Nilanjan Saha
Nand Bihari Yadav
Naoshad Reza
Nurul Huda Gazi
Partha Pratim Basu
Partha Das
Partha Basu
Pradip Kr. Mondal
Partha Kumar Sen
Parimal Mondal
Pratap Kabiraj
Palash Das
Prasenjit Kumar Ghosh
Prabhas Biswas
Pawan Kishor
Parimal Kanti Mridha
Pankaj Mondal
Paban Kumar Maiti
Pasupati Barui
Pranab Kumar Gayen
Pradip Sardar
Ramesh Chandra Sardar
Rabindranath Mondal
Ranjit Garang
Rabindranath Burman
Rabindranath Maiti
Sadhan Gayen
Sandip Sarkar
Sourabh Roy
Srinibas Majhi
Sudhir Kumar Das
Satyajit Roy
Sanjit Mondal
Sanjoy Kumar Mondal
Sourabh Bhuiya
Smigdhendu Sinha
Sukti Sankar Panigrahi
Suranjan Roy Chaudhuri
Subhasish Paul
Subal Kumar Barui
Sudhirranjan Mistri
Samir Kumar Das
Sujit Kumar Das
Soumitra Ghosh
Sanjit Jotdar
Susanta Kumar Bhowmik

Subhash Sah
Sugata Ranjan Saha
Sudhanshu Sekhar Mondal
Subhas Mukhopadhayay
Sougata Chattopadhyay
Sanjay Kumar Chandra
S. M. Ashraf Ali
Supriyo Chattopadhyoy
Sandip Kumar Ghosh
Sankha Deb
Shyamji Rai
Sandip Singh
Samiran Chakraborty
Shibram Debnath
Srikanta Dalui
Soumen Bag
Sanjay Roy Choudhuri
Subrata Haldar
Soumen Mukhopadhyay
Subhash Chandra Mondal
Sukanta Das
Sriniwash Prasad
Snehasish Acharya
Santanu Chatterjee
Shyamaprasad Nanda
Surjya Kanta Sardar
Tarun Kumar Nandy
Tirtha Guha
Tarakeshwar Bera
Tapan Kumar Baidya
Tohering Tamang
Tamoghna Mahalanabis
Talib Ahmed Jamadar
Ujjwal Kundu
Uttam Kumar Patra

Names of Trainees : 1998-99

Abhijit Dutta
Abdul Rouf
Abul Farah Molla
Anirban Ch. Pal
Animesh Jana
Akhil Kumar Sarkar
Anil Kr. Gharami
Anupam Sarkar
Amit Kumar Das
Ansuman Bandyopadhyay
Ajay Kr. Naskar
Anirban Chatterjee
Asim Chattopadhyay
Amitabha Palye
Arunava Adak
Biplab Sarkar
Baburam Soren
Buddhadeb Nandy
Bijay Kr.Shaw
Biplab Sarkar
Bibek Banik
Balwant Singh
Bhagirath Das
Chandra Sekhar Jaulia
Chandan Maity
Chandan Kr. Dutta
Dushmanta Mandal
Dilip Kr. Pal
Dudh Kr. Dhara
Debasish Bandyopadhyay
Debaprasad Mudi
Debasish Pal
Dyuti Prasad Dolai
Debapriya Bhattacharya
Debasish Ghosh
Fatu Saren
Gourab Das
Goutam Das
Gagan Kr. Majhi
Goutam Kr. Mandal
Hariswami Das
Jyotindranath Konar
Jayanta Chatterjee
Javed Iqubal
Kamal Kanti Haldar
Krishan Ch. Sarkar

Kuntal Chakraborty
Kahinur Ray
Krishna Pada Joddar
Khagedranath Mahato
Kabirul Islam
Kousik Ghosh
Lakshmi Kanta Besra
L. R. Davidson
Md. Mainuddin
Monsur Ahamed Gazi
Mityunjay Mandal
Manoj Kr. Biswas
Mohit Kr. Mandal
Mustak Ahmed
Narayan Ch. Bhandari
Nilanjan Basu
Nabin Prakash Shaw
Nirmal Kr. Dhara
Naba Kumar Pal
Nirmlya Mukhopadhyay
Nirmalya Goswami
Noor Alam
Nilay Kr. Pal
Nagendra Singh
Prosenjit Roy
Pranab Giri
Prasanta Kr. Dey
Partha Bhattacharya
Partha Sen
Pijush Kanti Ray
Ramhari Pahari
Ratan Nath
Rabindranath Bagari
Rajdip Dey
Sibsankar Singh
Sukumar Rajbanshi
Sahindra Sarkar
Subhasis Bhattacharya
Sekh Golam Sahajahan
Sujit Mahato
Sukdeb Pal
Sunil Kr. Biswas
Sourab Mondal
Sabyasachi Das
Sunil Bag
Shantany Bhattacharya
Surajit Ghosh
Sarat Chandra Sardar
Sarfat Ali Molla
Sunirmal Bhunia
Suman Banejee
Suhash Kr. Pandey
Sanjoy Roy
Siddh Nath Rai
Tapan Kr. Mondal
Tapas Santra
Tapas Kr.Acharyya
Tapas Kr. Mallick
Tapas Kr. Hajra
Tapan Das
Tamal Mondal
Thakurdas Mandal
Tofajjul Hussain
Utpal Bera
Uttam Kr. Giri

Names of Trainees : 1999-2000

Abul Hassan
Abu Hena Mustafa Jamal
Sk. Abu Nasar Md. Shafiqir
Aftab Alam
Ahim Kumar Sahu
Akhil Maity
Amolendu Acharya
Amolendu Manna
Amit Barik
Amit Krishna Singh
Amit Kumar Roy
Amit Pal
Amiya Dey
Anowar Hossan Molla
Apurba Guria
Arabinda Maiti

Anil Kr. Singh
Arindam Sengupta
Ashoke Kumar Nath
Ashoke Mandal
Asit Deb
Atanu Basu
Bhagwan Baitha
Binod Kr. Das
Bhuban Mohan Mondal
Bidhan Ch. Hansda
Bidyut Kr. Ghosh
Binod Kr. Shaw
Chanchal Sengupta
Chandan De
Chandan Kr. Maiti
Chayan Halder
Debabrata Biswas
Debnath Acharya
Debasis Das
Debashis Ray
Debasish Samanta
Dilip Mand
Dipak Kumar
Dipankar Dey
Goutam Pramanik
Gosai Ghosh
Gurudas Bera
Gopal Sharan Shar
Harandra C. Chah
Ismail Miyan
Jagadish Pahari
Jishnudeb Mukherjee
Kajol Kr. Baidya
Kalyan De
Kaushik Mondal
Keshabarjun Sarkar
Kushdhaj Mahato
Loknath Sardar
Malay Kumar Ghosh
Manas Giri
Manas Mridha
Mani Sankar Pal
Manish Ranjan Bal
Manoj Kumar Rai
Mobassar Anser
Mrinmoy Samanta
Mukul Ganguly
Narendra Kumar Prusly
Niren Mitra
Palas Kumar Mandal
Palas Mondal
Palas Roy
Parag Khamaru
Paresh Mistri
Partha Paramanya
Partha Pratim Basu
Pijush Kanti Ghosh
Pinaki Chakraborti
Pinaki Ranjan Jana
Prabir Ranjan Pal
Pradip Bandopadhyay
Pranab Kr. Mondal
Prasanta Kr. Guha
Prasanta Ray
Prasanta Saha
Prasanta Sarkar
Pratap Kumar Mondal
Provash Ch, Manata
Rabindra Kr. Dubey
Rafiuddin Ahmed
Raghunath Chattopadhyay
Rajib Gangopadhyay
Rakesh Kr. Bera
Ramkrishna Banik
Reyaz Ahmed
Rajkumar Pal
Ratan Das
Sabyasachi Ghosh
Dr. Sandip Roy
Saugata Choudhury
Sajal Kumar Sinha
Sampad Kr. Das
Sandip Banerjee
Santanu Chatterjee
Santanu Sanphui
Saptarshi Bhawmik
Sariful Islam
Sasanka Sekhar Manna

Saumitra Naru
Siddhartha Das
Siddhartha Mitra
Snehasis Barman
Snehasis Das
Somen Mondal
Sourabh Haldar
Subhabrata Chowdhury
Subhamay Das
Subhasis Mandal
Subir Mandi
Subrato Chakraborty
Subrata Kr. Ghorai
Sudip Kr. Mondal
Sujit Kr. Paramanik
Sujan Kr. Samanta
Sujit Samanta
Sukchand Pradhan
Suman Banerjee
Suman Majumder
Suman Ghosal
Sunil Kr. Giri
Sunil Baran Partha
Sk. Suphian Ali
Susanta Ghosh
Susanta Haldar
Susanta Kr. Beet
Syamal Ghosh
Tapan Kr. Patra
Tarikul Islam Goldar
Towhid E. Aman
Tribhuvan
Triloki Choudhury
Uma Sankar Mallik
Umesh Chandra Ghosh
Umesh Chandra Mondal

Names of Trainees : 2000-2001

Ajoy Kr. Jana
Alakendu Adhikari
Amaresh Sardar
Amlankusum Saha
Ananda Nanda Bera
Animesh Pakhira
Anupam Mandal
Ardhendu Sekhar Roy
Arup Kr. Das
Asis De
Balaram Das
Bhakta Prahlad Ghosh
Bhaskar Chakraborty
Bholanath Mandal
Bimal Oraon
Biman Patra
Biplab Sarkar
Bipul Chakraborty
Biswajit Naskar
Chanchal Kundu
Chanchal Sarkar
Chandan Pal
Debdatta Chatterjee
Deb Prosad Halder
Debraj Biswas
Dhananjoy Das
Dhrubajyoti Mandal
Dipak Das
Dipak Kr. Chanda
Durbar Roy
Gautam Bhattacharyya
Gobinda Ballav Mandal
Gokul Chandra Sil
Harendra Kr. Yadav
Hrishikesh Kr. Singh
Indrajit Mondal
Jagat Pati Soren
Jugal Das Makal
Kalyan Kanti Sahoo
Kamalesh Mandal
Kausik Mukhopadhyay
Kenedy Roy
Kingshuk Basu
Kripa Sharkar Tiwari
Krishna Chaudhury
Kuntal Pal

Madhab Halder
Madhop Mondal
Manas Polley
Md. Asaduzzaman
Md. Aziar Rahaman
Md. Gouz Nabi Molla
Mihir Naskar
Najibul Hussain
Narayan Mandal
Nazrul Islam
Pankaj Kumar Barman
Partha Basu
Partha Dutta
Partha Kr. Manna
Partha Sarathi Kundu
Prabhat Parash Chakravarty
Prasanta Kr. Mandal
Prasanta Sarkar
Probir Mandal
Purna Chandra Manna
Rabindranath Mandal
Rajeswar Sukul
Ranjan Mukhopadhyay
Rishi Kumar Singh
Ritabrata Mukhopadhyay
Rupam Islam
Samir Das
Sanjoy Kr. Saha
Sanjib Basu
Sankar Mandal
Sankar Saha
Santanu Ghosh
Shamim Ahmed
Soumen Samanta
Srimanta Kr. Shee
Subrata Chakraborty
Subrata Mahapatra
Subrata Mandal
Suman Kundu
Sumit Sengupta
Sunil Baran Das
Sunil Kr. Jaiswal
Surjakanta Panda
Syed Tajdar Ali Meerza
Tanmoy Das
Tapan Kr. Mandal
Tapas Sarkar
Tapas Sarkar
Umesh Chand Jaiswal
Utpal Pal

Names of Trainees : 2001-2002

Biswajit Biswas
Tarak Chandra Ghosh
Gautam Biswas
Joydeb Bhattacharya
Laltu Prahma
Prakash Narayhan Santra
Nesaru Islam Khan
Dr. Asit Kumar Pal
Prasanta Dauri
Sukanta Bandyopadhyay
Jayanta Gunri
Arindam Ghosh
Bikash Mali
Om Prakash Roy
Dilip Bera
Partha Sarathi Das
Kajal Kumar Bhowmik
Sanjay Mukherjee
Sanjib Sardar
Dhiman Datta
Krishnendu Das
Rajkumar Das
Sanjay Sarkar
Bharat Roy
Debaprasad Mandal
Chinmay Karmakar
Kutubuddin Mallik
Swarup Mishra
Ramprasad Halder
Abhijit Mandal
Alok Naskar
Md. Golam Faruk

Chanchal Naskar
Bijan Sardar
Saumitra Mistri
Srikrishna Das
Som Saraswat
Ashok Sing
Pradib Kumar Dolui
Abu Salem Mandal
Subhendu Jana
Arup Kumar Choudhury
Dhrubjyoti Chandra
Pradip Pal
Santanu Basu
Parthasarathi Sen
Arijit Bhattacharya
Samir Dey
Kingsuk Mandal
Rajkumar Bhandari
Debananda Kala
Manas Mandal
Purnendu Mandal
Mrityunjay Bhattacharjee
Dipankar Halder
Sk. Rejaul Haque
Jaypal Mandal
Chiranjit Kayal
Prabhas Kumar Baidya
Chinmay Saha
Santanu Mukhopadhyay

Subhas Chandra Nyayban
Dibyendu Pal
Biswanath Bag
Aniruddha Datta
Masudur Rahman
Abhik Pan
Prasun Kanjilal
Partha Krishna Ghosh
Indranil Saha
Pradip Das
Dipankar Dinda
Tapan Mandal
Manoj Kumar Yadav
Rajkumar Srivastav
Rammohan Murmu
Prasenjit Karmakar
Uttam Mandal
Dipak Kumar Shaw
Chanchal Ray
Rajarshi Dhar
Mahadeb Halder
Habibur Rahman Mallik
Sraban Khan
Subhashis Chatterjee
Lochan Khan
Prasanta Kumar Das
Debu Mandal
Pulak Roy
Arindam Pan

Names of Trainees : 2002-2003

Tapan Kr. Halder
Adinath Chatterjee
Jayanta Kr. Sadhu
Arindam Goswami
Ambarish Ray
Atanu Maiti
Subhransu Chakraborty
Amal Munda
Dipankar Das
Soumik De
Piyal Deb
Rajib Datta

Anup Kr. Ghosh
Avijit Majumder
Sudipta Sengupta
Sk. Md. Ajijur Rahaman
Arnav Ghosh
Snehanshu Bagchi
Prakriti Ranjan Sarkar
Sanat Chatterjee
Nabendu Chakraborty
Mayukh Maity
Milan Sikdar
Chiranjib Mandal

Sitanath Pal
Suhrid Dhara
Rajesh Kr. Bhagat
Salim Mollah
Md. Sahidar Rahaman
Manoranjan Sarkar
Tapas Kr. Mondal
Nityananda Dalui
Dilip Kr. Das
Subhasish Ghosh
Kousik Ghosh
Subrata Mandal
Sujit Mondal
Supratim Roy Chowdhury
Shrikumar Jha
Prabir Kumar Das
Apurba Kr. Das
Soumitra Bhunia
Mohan Sardar
Prasanta Kr. Mistri
Kanan Tarafder
Mrinal Kanti Baidya
Bijesh Mandal
Dipak Kr. Halder
Jayanta Raptan
Tapan Kr. Mistri
Gopal Prasad
Subhasish Saha
Samit Chakraborty
Ramkrishna Ojha
Shyam Sundar Saren
Shubhendu Dhara
Balaram Murmu
Sukhendu Bose
Arnab Roy
Manish Kr. Sen
Syed Muzaffar Ahamed
Billwa Mangal Das

Mainak Bhadra
Suvendu Sarkar
Jaydev Das
Siddheswar Das
Sakti Pada Panda
Purnendu Pramanik
Shibaji Ghosh
Ranjan Tarafder
Mujibar Rahaman Zamadar
Sanjay Saha
Biplab Mandal
Sibabrata Das
Nirab Das
Hemen Biswas
Dibakar Naskar
Dhananjoy Paik
Haradhan Mondal
Sudipta Chowdhury
Prasenjit Ganguly
Sanmay Das
Debatosh Barik
Sagar Sk.
Rajesh Kr. Tripathi
Kumar Kislay
Manas Mandal
Niranjan Paswan
Snehasis Chakraborty
Sukumar Hait
Dilip Kumar
Debojyoti Dutta
Sudipta Kr. Mondal
Sasadhar Naskar
Bikash Mondal
Tapan Kr. Das
Malay Kr. Mahatma
Kausik Kr. Pal
Abhijit Chatterjee

Names of Trainees : 2003-2004

Mohiuddin Molla
Partha Pratim Dutta
Md. Firoze Anwar
Rajivalochan Sinha

Sultan Faiyazuddin
Avijit Dasgupta
Chaudhuri Ibtehajul Haque
Nirmal Kumar Mondal

Anjan Kumar Bardhan
Biswajit Mondal
Gopal Mandal
Biplab Purkait
Madhusadan Jana
Asis Maiti
Kishor Kr. Basak
Sitish Bhattacharya
Bholanath Malakar
Ashok Das
Abhijit Das
Kaustav Mitra
Somnath Karmakar
Avijit Marick
Joy Chakraborty
Debasish Dey
Tushar Paul
Rhitabrata Chatterjee
Bhulu Sk
Fatick Mandal
Ashok Keshari
Sanjiv Dubey
Anup Kumar Shaw
Satish Kumar Dubey
Kapil Muni Prasad
Md. Mustakim
Arnab Ghosh
Siladitya Sasmal
Biswanath Saha
Krishnendu Bhunia
Md. Nasiruddin
Kallol Middey
Subhasish Halder
Mrinal Kanti Malik
Sovan Sen
Sudipta Chakraborty
Amlan Ganguly
Krishnasish Goswami
Kaustuv Bhattacharya
Indrajit Singha
Kailash Haldar
Laxmikanta Baskey
Chandicharan Nanda
Abbasuddin Khan
Kamalesh Mishra
Md. Hasibur Rahaman
Sukanta Mukherjee
Chhandam Bose
Krishanu Manna
Pratul Mondal
Arijit Sarkar
Biplab Mridha
Aniruddha Nandi
Gobinda Maity
Shibpada Mandal
Sasanka Kumar Kundu
Haradhan Ghatwal
Shuvendu Roy
Sk. Md. Oyazul Haque
Sanjoy Yadav
Soumya Ray
Dipankar Das
Sujan Ghosh
Monimoy Chatterjee
Suman Mukhopadhyay
Samir Sarkar
Debasis Das
Bapan Paul
Joy Chatterjee
Sagar Biswas
Mrinal Kr. Sarkar
Mihirlal Jana
Belal Ishrat
Dhiman Basu
Sunil Kr. Saren
Amit Bose
Lakshmi Kanta Sana
Subhendu Bar
Amit Kr. Gangopadhyay
Alak Mandal
Tanay Kr. Mistri
Jayanta Kr. Mistry
Ashis Kr. Mallik
Samir Chattopadhyay
Ananda Kr. Basu
Tulanand Thakur
Nripendra Nath Mandal
Debarpashad Mukherjee

Names of Trainees : 2004-2005

Anup Kumar Baidya
Santanu Bhattacharya
Sukanta Bhattacharjee
Dulal Chandra Sanpui
Sudeepta Shekar Maity
Samik Gupta
Md. Abbas Ali Khan
Pratima Pal
Sujit Bose
Chandan Mishra
Subhranil Chakrabarti
Prasenjit Thakur
Sumit Ghosh
Sandipan Dutta
Mriganka Biswas
Mrityunjoy Das
Mir Shahnowaj
Sanjib Saha
Alokesh Mridha
Madhab Naskar
Uma Charan Das
Abhijit Ghara
Dhurjati Prosad Saha
Golam Safiun Ambia
Sujon Roy
Ravi Shankar Kumar
Kausik Das
Kushal Majumdar
Soumen Naskar
Rakesh Mondal
Manojit Das
Rabiram Kumar
Tapan Chakraborty
Bikash Ch. Mandal
Kingshuk Biswas
Biman Maity
Surolin Sarkar
Subhasis Sain
Santanu Das
Joydeb Sarkar
Ashok Kumar Singh
Ananda Srivastav
Kartik Kumar Shaw
Binay Kumar Jha
Sanjay Kumar Dubey
Sandipan Chatterjee
Dipak Kumar Nandi
Raju Sett
Sahidur Rahaman Mondal
Abhijit Bachhar
Prangobinda Karan
Tapan Kumar Mondal
Sisir Kumar Das
Md. Mur Salin
Oasim Uddin Ahammed
Debadatta Ghosh
Dharmendra Pratap Singh
Giasuddin Molla
Niranjan Kumar Mondal
Ujjwal Mukherjee
Aloke Kumar Mondal
Manoj Kumar Das
Santanu Mondal
Samim Mahammad
Dipankar Das
Kuldeep Kumar Das
Shibasis Das
Ramendra Nath Mistry
Sanjoy Saha
Tarun Kumar Das
Sujoy Chaudhuri
Sabyasachi Das
Alauddin Dafadar
Chandan Bhattacharya
Debabrata Naskar
Dipankar Jana
Md. Habibulla Sardar
Palash Kumar Mondal
Sanjan Naskar
Gopal Mondal
Shyam Sundar Mondal
Basudeb Mondal
Bibek Chandra Pramanik
Kalipada Mandal

Subrata Majumdar
Abhik Kumar Mondal
Moloy Kumar Mondal
Sudipta Chakraborty
Harun Al Rashid
S.Reham Ahmad
Basudev Sing
Alphons Murmu
Subhendu Maiti
Srimay Sarkar
Sumantra Saha
Niladri Sen
Avijit Sengupta
Abid Hossain
Subhasis Har Chowdhuri
Samsher Murshid
Haripada Majee
Partha Mukherjee
Chandrajit Haldar
Anirban Nanda
Palash Mandal
Sujit Kumar Mondal
Manipada Giri
Tuhin Gangopadhyay
Sandip Kumar Roy
Tapobrata Das

Names of B.Ed.Trainees : 2005-2006

Saikat Bhattacharya
Anshuman Bhowmick
Abhijit Sen
Biswajit Chattopadhyay
Dhurjati Prasad Khan
Ashis Acharya
Arnab Ray
Motichand Prasad
Sudarshan Barui
Pratap Narayan Sanyal
Md. Nasim Altaf
Ranendra Krishna Bhattacharya
Sanjay Kumar Singh
Sanjit Kumar Bhowmick
Debnath Saha
Ashim Pal Kundu
Rudranil Ghosh
Amarjit Pandit
Subrata Mondal
Sandeep Ganguly
Prasanta Mukhopadhyay
Sujoy Bhadra
Saikat Datta
Himanshu Chakraborty
Indranil Saha
Manojit Sinha
Rathin Gangopadhyay
Md. Ikbal Kabir
Sovan Banerjee
Sudhanya Mistry
Vinod Kumar Pathak
Ratna Kumar Keshari
Ajay Kumar Shaw
Sanjeev Kumar Gupta
Swarnendu Bhattacharya
Binod Kumar Harijan
Soumitra Kumar Das
Kousik Maity
Prasanta Chakraborty
Meghnad Ghosal
Pijush Kanti Sarkar
Bapuli Mondal
Tapan Kumar Das
Prasun Bhakta
Bodhisatya Majumdar
Safiuddin Sardar
Chanchal Kumar Sahoo
Samiran Das
Samar Kumar Man
Sudip Saha
Md. Anwarul Haque
Priyaranjan Mandal
Pulakes Samanta
Sujash Chakraborty
Ajit Biswas
Sumanta Paul

Sourav Dasgupta
Krishnedu Bagchi
Partha Ghosh
Utpal Dey
Ranjit Dhar
Sudip Mandal
Shantam Agarwala
Aktar Samim
Ashok Karar
Sukdev Murmu
Nalini Ranjan Hembram
Barun Poali
Kaushik Sen
Anirban Chakraborty
Sudharsan Maiti
Dilip Jana
Arup Kumar Ghosh
Subham Bhattacharjee
Awadhesh Bhagat
Md. Anwer Hussain
Hiralal Sarkar
Sanjay Das
Rajesh Kr. Singh
Dinesh Singh
Md. Shamsul Arifeen
Tapan Kr. Tarafdar
Sudip Kr. Roy
Soumik Goswami
Avijit Mondal
Udayan Bhattacharya
Sudip Paul
Tapas Patra
Harasit Kr. Mandal
Amit Kumar Roy
Bharat Raj Chakrabarti
Soumyadip Bandyopadhyay
Pallab Banerjee

Bablu Mondal
Bibhas Sardar
Dipak Mandal
Pranab Naskar
Tonmoy Mitra
Avijit Bhadra
Sri Mukul Chand Patra
Sanjoy Samadder
Pradip Kumar Mandal
Biswajit Mondal
Apurba Das
Subhajit Singha Roy
Aminur Molla
Amit Poddar
Sanjoy Shaw
Satya Narayan Mahato
Manoj Shaw
Sandeep Shaw
Subhasis Das
Suman Chattopadhyay
Bipattaran Praharaj
Pijush Kanti Acharjee
Rajib Mukherjee
Biplab Mondal
Goutam Mahesh
Sukhendu Maity
Biplab Midya
Biplab Lahiri
Shyamal Bhanja
Surjendu Acharya
Partha Sarathi Adak
Ramkrishna De
Susanta Mondal
Goutam Samanta
Barun Halder
Subrata Kumar Das

Names of B.Ed.Trainees : 2006-2007

Tuhin Roy
Md. Omar

Goutam Guha
Kaushan Roy

Chandan Kumar Giri
Arnab Kundu
Md. Touhid Ahmed
Sankar Paul
Debjit Mondal
Kaushal Kishore Singh
Saikat Kundu
Anish Goswami
Aniruddha Nandi
Sudipta Manna
Sanjib Acharya
Prithwas Mandal
Chinmoy Ray
Biswajit De
Anirban Halder
Atanu Mukherjee
Jamini Sarkar
Debashis Sardar
Bappa Haldar
Prabir Karmakar
Ajit Basak
Ratan Kumar Basu
Premsankar Bhakat
Palas Kumar Dan
Shiv Pujan Paswan
Bijay Krishna Soren
Biman Gangopodhyay
Pijush Paik
Sukomal Samanta
Debabrata Konar
Arghya Bose
Pijush Kanti Mondal
Bivash Chakraborty
Md. Jamal Uddin
Gouranga Biswas
Suman Sarkar
Anirban Day
Animesh Halder
Nantu Roy
Niloy Mondal
Somenath Banerjee
Subrata Ghosh
Kartick Chandra Bazani
Tapas Kanti Bagchi
Sanjoy Kumar Biswas
Sadananda Dolui
Anjan Saha
Sovan Kr. Basu
Haripada Halder
Pradipta Bhattachaya
Sovan Das
Uma Maheshwar Ojha
Raju Kumar Shaw
Tapan Panighahi
Ramkrishna Das
Surajit Banerjee
Samir Kayal
Subrata Kr. Barua
Monojit Mondal
Vishal Tiwari
Monowoar Hossain
Tapan Paria
Suraj Kanta Das
Debabrata Maity
Rajesh Choubey
Uttam Kr. Thakur
Santi Gopal Das
Rabindranath Bhar
Goutam Chandra Joddar
Pintu Halder
Subhojit Das
Rathin Gangopadhyay
Pankaj Mandal
Malay Das
Malay Biswas
Shahid Anjum
Aniruddha Biswas
Debashis Kar
Tarun Chakraborty
Sanat Dawn

Names of B.Ed.Trainees : 2007-2008

Abhik Bandyopadhyay
Jagannath Hudati
Sanjib Chandra Das
Malay Mondal
Subhankar Mistri
Samit Kumar Das
Prokash Biswas
Bidhan Chandra Roy
Anupam Ghosal
Rana Chatterjee
Sumanta Dutta
Koushik Patra
Sarbasish Dey
Ramananda Adak
Prodyumna Khan
Sandipan Banerjee
Saheed Hossain
Santosh Kumar Mishra
Tarun Kumar Das
Mayukh Das
Amir Ali Molla
Haripada Sarkar
Manoj Nayek
Satyendra Pandey
Sudip Sarkar
Rathindra Nath Mondal
Biswajit Bera
Subhradip Karmakar
Rabindra Nath Mahato
Tapas Kar
Chandar Chatterjee
Pulak Chandra Mal
Koushik Srakar
Subir Kuamr Haldar
Prasanta Kumar Mandal
Kinkar Kumar Kandar
Kartik Chakrabarty
Debasish Saha
Somnath Sarma
Swarnandu Pathak
Tapan Bhunia
Partha Das

Partha Sarathi Raygupta
Chandra Kanta Sardar
Biplab Sardar
Rajak Fakir Nemai
Satyabrata Ghosh Hazra
Sarabindu Naiya
Biswanath Sinha
Kibria Sah
Santinath Malik
Arup Paul
Anupam Mandal
Sujit Malick
Premangsu Mondal
Rana Roy
Rajat Bose
Ramkrishna Katwal
Debabrata Pramanik
Chinmay Biswas
Samir Malik
Sanatan Malik
Samir Kumar Mal
Soumen Saha
Aniruddha Baidya
Susanta Kumar Gayen
Chinmoy Biswas
Dilip Gayen
Sandip Kumar Biswas
Debasis Dey
Sunil Kumar
Chandra Kanta Chakrabarti
Krishendu Deb
Siddhartha Chakrabarti
Ardhendu Dan
Tirthankar Datta
Uttam Mondal
Mukul Ray
Md. Sersha Afghan
Debabrata Hatial
Prabhas Dey
Susanta Maity
Surja Kanta Panigrahi
Biswajit Mondal

Subhendu Jana
Promod Thakur
Anupam Pramanik
Anup Gayen
Manabendra Das
Ankush Dutta

Names of M.Ed.Trainees : 2002-2003

Indrani Ghosh
Bichitra Deb
Rajib Mukherjee
Sujan Samanta
Suniti Das
Paramita Poddar
Dr. Asish Kumar Gupta
Srijib Patra
Jasodhara Banerjee
Dr. Tuhin Kumar Samanta
Manjita Mondal
Kakoli Mukherjee
Payel Gupta
Arup Kumar Das
Sobhana Si
Subhasri Dasgupta

Names of M.Ed.Trainees : 2003-2004

Dilip Kumar Mondal
Hitasish Bhowmik
Srikanta Gayen
Lopamudra Pal (Chakraborty)
Debjani Mukhopadhyay
Chandrani Chakraborty
Sonia Chattopadhyay
Subhas Chandra Bhat
Soma Basu
Saroj Samanta
Bibhas Kanti Mandal
Keya Samanta
Anuradha Gupta

Names of M.Ed.Trainees : 2004-2005

Md. Afsar Ali
Mithu Chakraborty
Indra Kumar
Arun Kumar Mandal
Sanhita Chakrabarti
Md. Sadatullah
Saswati Mukherjee
Rinti Roy
Sekhar Roy
Debashis Mridha
Soma Mukherjee
Jagannath Baidya
Swadhin Sarkar
Arabinda Saha
Pradip Das
Prakriti Ranjan Sarkar
Tapan Samanta
Indradip Ghosh
Pradip Kumar Sengupta
Dushmanta Mandal
Hemen Biswas

Names of M.Ed.Trainees : 2005-2006

Piu Bhattacharyya
Samir Kumar Banerjee
Pratap Kabiraj
Sunanda Das
Amlan Ganguly
Sujata Maiti
Roshmi Ghosh
Arup Debnath

Aditi Panja
Srabani Acharya (Panda)
Soma Siddhanta (Banerjee)
Malini Kundu
Brojogopal Chand
Susmita Neogi
Soumi Bose (Mukherjee)
Paramita Ghosh Dastidar
Susmita Chatterjee
Shweta Goswami
Indranil Saha
Antara Mitra

Names of M.Ed.Trainees : 2006-2007

Chaitali Kundu
Paramita Das Sharma
Pijush Kanti Tripathi
Baishali Basu
Soma Dutta
Alok Bhakta
Arunava Samanta
Amal Sankar Mukherjee
Trisha Banerjee
Kaberi Barui
Swarup Kumar Maity
Papiya Sar
Debabrata Naskar
Suvrangsu Sekhar Saha
Dr. Mausumi Chatterjee
Srikanya Majumder
Lina Sarkar

Names of M.Ed.Trainees : 2007-2008

Smiriti Roy
Sujit Kr De
Pratap Kr Jana
Bira Bhattacharya
Supatra Sen
Subrata Purakait
Mili Misra
Ruma Guha
Smita Samanta
Rajasri Biswas
Mamta Jaiswal
Shampa Daw (De)
Santanu Mandal
Soumen Mandal
Dilip Mandal
Chhaya Burui
Bishnupada Bera

লেখক পরিচিতি

শ্রী নাগার্জুন ভরদ্বাজ	বর্তমান অধ্যাপক
ভবেশ মৈত্র	প্রাক্তন সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ
Kamal Krishna De	প্রাক্তন অধ্যক্ষ
Dilip Kumar Sinha	প্রাক্তন উপাচার্য, বিশ্বভারতী
হরিপদ মণ্ডল	প্রাক্তন ছাত্র
খগেন্দ্রনারায়ণ দাস	প্রাক্তন ছাত্র
সমীর চক্রবর্তী	বর্তমান গ্রন্থগারিক
মধুসূদন পাঁজা	প্রাক্তন ছাত্র
ডাঁ০ কুমার বিশ্ববন্ধু	বর্তমান অধ্যাপক
Prof. D. Mahanta	প্রাক্তন অধ্যক্ষ
Dr. Pronab Krishna Choudhury	বর্তমান অধ্যক্ষ
Dr. Dilip Kumar Chakraborty	প্রাক্তন অধ্যক্ষ
Swapan Kumar Sarkar	সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
Dr. Rathindranath De	অধিকর্তা, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ
রূপক হোমরায়	প্রাক্তন ছাত্র
R. G. Mukherjee	প্রাক্তন উপাচার্য, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Sakti Pada Bhattacharyya	প্রাক্তন অধিকর্তা, ইন্সটিটিউট অফ ইংলিশ
A. K. Bhattacharya	প্রাক্তন অধ্যাপক
Kulada Prasad Chaudhury	প্রাক্তন অধ্যক্ষ
Ramesh Chandra Das	প্রাক্তন অধ্যক্ষ
Dr. Jnanandra Chandra Das Gupta	প্রাক্তন অধ্যক্ষ
সূর্যাংশু ভট্টাচার্য	প্রাক্তন ছাত্র
জ্যোতির্ভূষণ দত্ত	প্রাক্তন অধ্যাপক
মনোতোষ দাশগুপ্ত	প্রাক্তন অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি কলেজ
সুরেশ চন্দ্র আচার্য্য	প্রাক্তন ছাত্র
ডঃ নীহাররঞ্জন রায়	প্রাক্তন বাগেশ্বরী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
Jayasri Banerjee	বর্তমান অধ্যাপিকা
Dr. Nilanjana Sanyal	অধ্যাপিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
Rhitabrata Chatterjee	বর্তমান অধ্যাপক
Prof. Amarnath Ghosh	বর্তমান অধ্যাপক

DAVID HARE TRAINING COLLEGE
CENTENARY CELEBRATION COMMITTEE

President	:	Dr. Pronab Krishna Chaudhury
Working President	:	Prof. Amarnath Ghosh
Vice Presidents	:	Sri Radhakrishna Ghosh ★ Sri Khagendranarayan Das ★ Sri Suryangshu Bhattacharya Prof. Jyotirbhusan Dutta ★ Prof. Swapan Sarkar ★ Sri Asit Das ★ Sri Smritikantha Bag
General Secretary	:	Dr. Bishnupada Bera
Joint Secretary	:	Sri Samir Kumar Chakrdbarti
Assistant Secretaries	:	Dr. Jayasri Banerjee ★ Smt. Anu Dutta ★ Sri Rupak Horn Roy ★ Sri Madhusudan Nandy ★ Smt. Madhuri Mukherjee ★ Dr. Sujata Raha ★ Dr. Gautam Kumar Das ★ Sri Manindranath Bag ★ Sri Shibendu Dey
Treasurer	:	Prof. Subhas Chandra Bhat
Joint Treasurer	:	Sri Abhijit Dasgupta
Advisory Committee	:	Prof. Madan Mohan Ghosh (Former Principal) ★ Dr. Dilip Kumar Chakraborty (Former Principal) ★ Dr. Kamal Krishna De (Former Principal) ★ Dr. Pijush Kanti Chatterjee ★ Dr. Basudeb Bandyopadhyay ★ Dr. Amal Kumar Chatterjee ★ Dr. Sanat Kumar Ghosh ★ Prof. Bimal Chandra Das ★ Prof. Satyendranath Giri ★ Prof. Kalidas Hazra ★ Sri Pradip Kumar Ghatak
Publication Committee	:	Prof. Purnendu Acharya (Convenor) ★ Prof. Rabindranath Karmakar ★ Sri Suryangshu Bhattacharya ★ Sri Rupak Horn Roy ★ Sri Mayukh Maity ★ Afsar Ali ★ Sri Probir Kumar Das ★ Sri Indradip Ghosh ★ Sri Chandan Mishira ★ Smt. Soma Mukherjee ★ Sri Ranendrakrishna Bhattacharya ★ Sri Goutam Pal.
Seminar Committee	:	Prof. Subhas Chandra Bhat (Convenor) ★ Sri Syed Abid Ali ★ Sri Amlan Ganguly ★ Sri Ajoy Kumar Naskar ★ Sri Sudip Bhattacharya ★ Sri Sukanta Bandyopadhyay ★ Sri Kunlal Pal ★ Sri Ritabrata Chatlerjee ★ Sri Kausik Ghosh ★ Sri Subhra Mukherjee
Cultural Committee	:	Prof. Partha Chattopadhyay(Convenor) ★ Prof. Anil Kumar Das ★ Sri Amiya Das ★ Sri Pranab Sikdar ★ Sri Pratap Narayan Sanyal ★ Sri Krisnnapada Biswas Sri Dipak Das ★ Sri Sankha Maitra ★ Sri Ajoy Kumar Paul ★ Sri Malay Adhikari ★ Sri Arindam Ghosh ★ Sri Arnab Roy ★ Sri Antara Mitra ★ Sri Suren Nayak
Publicity Committee	:	Prof. Jayasri Banerjee (Convenor) ★ Prof. Rabindranath Karmakar ★ Abdul Hai Halder ★ Sri DipankarDas ★ Sri Pradip Kumar Ghosal ★ Sri Gautam Kumar Das ★ Prof. Subhas Chandra Bhat ★ Sri Alok Kumar Mandal ★ Sri Soumyadip Bandyopadhyay ★ Sri Avijit Mandal ★ Sri Swarnendu Bhattacharya ★ Sri Anup Guha.
Reception Committee	:	Prof. Ahana Bera (Convenor) ★ Prof. Subhasree Dasgupla ★ Sri Nabendu Chakrafaorty ★ Sri Manoj Kumar Shaw ★ Sri Rajesh

Kumar Singh ★ Sri Samar Kumar Man ★ Sri Kaustav Bhattacharya ★ Sri Himangshu Chakraborty ★ Sri Samir Das ★ Sri Supratim Roy Choudhury ★ Sri Subrata Banerjee ★ Sri Sunil Kumar Banik

Programme Committee : President ★ Secretary ★ Treasurer and Convenor of all sub-co mittees.

Refreshment Committee: Bharati Bhatlacharya (Convenor) ★ Srikanya Majunidar ★ Soma Dutta ★ Sekhar Bhatlacharya ★ Sushil Halder ★ Jawhar Ghorui ★ Matadin Prasad Rangowa.

Data collection & Record keeping Committee : Kumar Vishwabandhu (Convenor) ★ Some President Trainees of M. ED. ★ Some Present Trainees of B. Ed. ★ Prof. Pijuskanti Tripathi Ex-M. ED. student ★ Mousumi

Executive Committee : Dr. Pronabkrishna Choudhuri ★ Prof. Amarnath Ghosh ★ Dr. Bishnupada Bera ★ Sri Samir Kumar Chakraborty ★ Sri Radhakrishna Ghosh ★ Sri Khagendranarayan Das ★ Sri Suryangshu Bhattacharya ★ Prof. Jyotirbhusan Dutta ★ Dr. Rathndranath De ★ Swapun Sarkar ★ Dr. Sujata Raha ★ Dr. Amal Kumar Chattcrjee ★ Md. Refatullah ★ Sri Asit Das ★ Sri Smritikantha Bag ★ Smt. Nina Nandy ★ Smt. Anu Dutta ★ Sri Madhusudan Nandy ★ Sri Rupak Horn Roy ★ Sri Tapas Kumar Mitra ★ Sri Sibendu Dey ★ Sri Gautam Kumar Das ★ Sri Manindranath Bag ★ Sri Chitturanjan Bandyopadhyay ★ Sri Ranjan Dutta ★ Sri Bishnupada Dutta ★ Sri Pijush Kanti Chatterjee ★ Sri Shibaprasad Dutta ★ Sri Prabhat Kumar Chattopadhyay ★ Sri Vivekananda Sen ★ Sri Ardhendu Banerjee ★ Sri Asoke Kumar Chakraborty ★ Sri Joydeb Dasgupta ★ Sri Asoke Maity ★ Sri Abihijit Dasgupta ★ Sri Nabcndu Chakraborty ★ Sri Mayukh Maity ★ Prof. Kalidas Hazra ★ Prof. Biswapriya Banerjee ★ Prof. Rabindranath Karmakar ★ Prof Nagarjun Bharadwaj ★ Prof. Ujjal Kumar Mukherjee ★ Prof. Purnendu Acharya ★ Prof. Kumar Viswabandhu ★ Prof. Subhas Bhat ★ Prof. Partha Chattopadhyay ★ Prof. Jayasri Banerjee ★ Prof. Bharati Bhattacharya ★ Prof. Ahana Bera ★ Prof. Subhasri Dasgupta ★ Sri Shibaprasad Mukhopadhyay ★ Sri Soumen Ghosh ★ Sri Ashoke Maity.



মাননীয় অধ্যক্ষ ও অশিক্ষক কর্মীবৃন্দ

বসে (বাঁদিক থেকে ডানদিকে)—শ্রী সুরেন্দ্র নায়ক, শ্রী অনুপকান্তি গুহ, শ্রী সুখরঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্রী শচীন্দ্রনাথ কুমার, অধ্যক্ষ ডঃ প্রণবকৃষ্ণ চৌধুরী, শ্রী সুব্রত ব্যানার্জী, শ্রী শেখরচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রী পীর মহম্মদ, শ্রী ধনঞ্জয় সাঁতরা।

দাঁড়িয়ে (বাঁদিক থেকে ডানদিকে)—শ্রী ধীরেন চন্দ্র জানা, শ্রী বরুণ মুখার্জী, শ্রী জহর ঘোড়ুই, শ্রী মাতাদিনপ্রসাদ রাঙ্গোয়া, শ্রী শুভ্র মুখার্জী, শ্রী তাপস দাশগুপ্ত, শ্রী সুনীল বণিক, শ্রী ভাস্কর ভুটিয়া।



শতবর্ষে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের প্রবেশদ্বার।